KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ গণিকাতন্ত্র লাইনিট, কল-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : নীরব প্রকাশন
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7 x 9.5 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৪১/৪	Year of Publication : মাঘ-চৈত্র ১৩৮৭
	Condition : Brittle Good
Editor : শিবনাথ পরিবার	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির/আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত ত্রৈমাসিক

চতুরঙ্গ

৪১ বর্ষ/৪র্থ সংখ্যা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

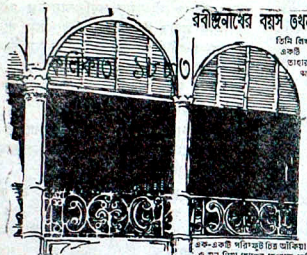

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বাইশ

তিনি লিখছেন, "চৌরঙ্গির মিক্তবন্তী সাকুর্লার রোডের একটি বাসাবাড়িতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। আমি অনেক সময়ই লোহার জালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আমোদ-আমোদ দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত—সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।

"সামান্য জিনিসকে দেখিবার যে-দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবির মতোই আলোকে ও মনের আনন্দে দিব্য চিত্রিত হইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রাঙা মিলিত হইয়া আমার চোখে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনাগঠিত-বেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে অতি ভালো লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্খা। চোখ দিয়া মনের জিনিসকে ও মন দিয়া চোখের জিনিসকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুমি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উহাদা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে-উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু, কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে দিধি নাই, তাই কেবলই রঙ হওয়ায় পড়িত। তা ছাড়া, তবু যেরেরা যখন প্রথম রঙের বাক্স উপহার পায় তখন যেমন—তেমন করিয়া নানাপ্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় অস্থির হইয়া ওঠে, আমিও সেইদিন নবাবীখানার সামান্য রঙের বাক্সটা নূতন পাইয়া আপন—মনে কেবলই রকম-বেরকম ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়া দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের বাইশবছর বয়সের সঙ্গে এই ছবিগুলোকে আজ মিলাইয়া দেখিলে হয়তো ইহাদের কাঁচা মাইন ও আজগা রঙের ভিতর দিয়াও একটা-কিছু চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।"

১৮ বছর পেরিয়ে গেছে

বাইশ বছর বয়স রবীন্দ্রনাথ বস্তী দেখেছিলেন। বস্তী এখনও আছে।

১৯৮৩ সালের বস্তী আর ১৯৮১ সালের বস্তীর মধ্যে তফাৎ বিশেষ নেই। মাটি, টিন আর খোলার ঘর। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোক অধিষ্ঠিত।

ইদানীংকালে অবশ্য কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ.) অধিকাংশ বস্তীতে কিছুটা উন্নয়ন পরিকল্প সৃষ্টি করেছে। এখন এই সব বস্তীতে পানীয় জল, স্যানিটারী পায়খানা, পাকা রাস্তা, বিজলী আর নর্দমার ব্যবস্থা হয়েছে। বস্তীবাসীদের জীবনে এসেছে কিছুটা আচ্ছন্নতা।

কিন্তু শুধু পরিবেশ নয়, বস্তীবাসীদের জন্য আরও অনেক কিছু করতে হবে। যেমন তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন।

কিছু কাজ হয়েছে সত্যি। কিন্তু আরও অনেক কিছু করা প্রয়োজন।

তখন রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে গেছেন। আজও বস্তীজীবন নিয়ে লেখা ও ছবি যে দরকার।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নবরঙ্গ

মাঘ-চৈত্র ১৩৮৭

সূচীপত্র

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। মোহনলাল, এ যে মোহনলাল ২৭৯
শান্তিকুমার ঘোষ। পাখি এইবার ২৮৯
বার্ণিক রায়। মুখ দেখা ২৯০
প্রদ্যুম্ন মিত্র। আত্মঘাত ২৯১
দাউদ হায়দার। অনন্ত অরুন্ধতী তুমি, অন্ধকারে ২৯২
রবীন সুর। বাড়ির ছবি ২৯৩
মিহির সিংহ। ছেণ্ড়াবাবুর উপাখ্যান ২৯৪
অশোক রুদ্র। তপস্যা ও বরদান ৩০৩
সুধাংশু ঘোষ। সরলরেখা বেঁকে যায় ৩১৫
সমালোচনা। নিতাপ্রিয় ঘোষ, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক ঘোষ, রাজ্যেশ্বর মিত্র, তারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা মিত্র, জীবন সরকার ৩৫৬

প্রচ্ছদ। রনেনআয়ন দত্ত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

How fast can your money grow ?
Come to us, and you'll know

1. **FAMILY BENEFIT DEPOSIT**
   Rs. 100/- only per month brings you after 10 years Rs. 20,557/-
2. **CASH CERTIFICATE**
   Rs. 5,000/- only brings you after 10 years Rs. 13,427·50 p.
3. **RECURRING DEPOSIT ACCOUNT**
   Deposit only Rs. 10/- per month to get after 7 years Rs. 1,215·70 p.

We have also many other attractive investment schemes.
For details please contact our Head Office or any of our Branches.

United Industrial Bank Limited
Head Office : 17, R. N. Mukherjee Road,
Calcutta-700 001
Regd. Office : 7, Red Cross Place, Calcutta-700 001
Chairman : Sri J. N. Biswas

বর্ষ ৪১ মাঘ-চৈত্র ১৩৮৭

মোহনলাল, এ যে মোহনলাল !

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

"ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। শীতকালের সকালে বৃষ্টি কুয়াশার মতন সকল দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। পাটনা শহর হইতে যে জীপ গাড়িটি বাহির হইয়াছিল, এক ঘণ্টার কিছু অধিক কাল পাকা রাস্তা দিয়া চলার পর এক্ষণে কাঁচা পথে চলিল। জীপগাড়ির ঝাঁকানিতে আরোহিদ্বয় বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলেন। একজন চালককে জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন যে সে ঠিক রাস্তায় যাইতেছে কিনা। চালকের সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। একটি কম্ফর্টার কানে মাথায় জড়াইয়াছে। তাহার উপর একটি চাদরে মাথা ও অঙ্গ লুপ্ত। কেবল সোয়েটার-আচ্ছাদিত দুটি হাত, কোটরাগত দুটি চক্ষু, একটি নাসিকা এবং হাওয়াই-চপ্পল-পরিহিত পদযুগল খালি দেখা যায়। এইরূপ সজ্জায় এবং গাড়ির শব্দে চালক আরোহীর প্রশ্ন শুনিতে পাইল না। কেবল হাত তুলিয়া দূরে কী দেখাইল। আরোহিদ্বয় দেখিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কেবল ধূসর বৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ইতিমধ্যে এক গর্তে পড়িয়া যানটি লাফাইয়া উঠিল। আরোহিদ্বয় কোনক্রমে পতন হইতে নিজেদের রক্ষা করিলেন। কিছু পরেই এক পত্রহীন বিরাট পাকুরবৃক্ষের তলে গাড়িটি দাঁড়াইল। চতুর্দিকে জনমানুষ নাই।

কয়েকবার গাড়ির হর্ন বাজাইবার পর মনে হইল দূরে এক আলোকবর্তিকা জ্বলিয়া উঠিল। চালক সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পরম পরিতোষে একটি বিড়ি ধরাইলেন। বিড়ির উগ্র গন্ধে গাড়ির ভিতর আরোহীদের প্রাণান্ত হইতে লাগিল। অবশেষে বৃষ্টি একটু কমিল। সেই আলোকবর্তিকাটি ক্রমে বড় হইয়া নিকটে আসিল। আরোহিদ্বয় গাড়ি হইতে নামিয়া তাঁহাদের বর্ষাতি দুইটি ভাল করিয়া পরিলেন। ছাতা খুলিয়া মাথা ঢাকিলেন। ছাতা মাথায় সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া লণ্ঠন লইয়া যে ব্যক্তি আসিতেছিল সে আর একটু নিকটে আসিবামাত্র একজন আরোহী ফিসফিস করিয়া বলিলেন, 'মোহনলাল'। লণ্ঠনহস্তে ব্যক্তি ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ইঙ্গিতে অনুসরণ করিতে বলিয়া চলিতে লাগিল। পিছনে যাইতে যাইতে আরোহিদ্বয় দেখিলেন সম্মুখের ব্যক্তি যেন তরঙ্গ তুলিয়া চলিতেছে। তাহার চলার ভঙ্গিতে মনে হয় বনহংসীর নিকট বুঝি সে হাঁটিতে শিখিয়াছে। পদযুগলের দিকে দৃষ্টি পড়িতে সন্দেহ রহিল না যে একজন স্ত্রীলোক তাঁহাদের পথপ্রদর্শক। কর্দমাক্ত সিক্ত গ্রামপথে তাহার চারু চরণযুগল আস্তে আস্তে যেন বৃক্ষচ্যুত

পুষ্পের মতো মাটিতে পড়িতেছিল। একটি ভগ্ন গৃহের ধ্বংসস্তূপের সম্মুখে তাঁহারা আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইঙ্গিতে তাঁহাদের অপেক্ষা করিতে বলিয়া পথপ্রদর্শিকা অন্তর্ধান করিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক হরলাল, পারস্যনবীশ সাবির আলিকে ইংরেজীতে কী জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উত্তরে আলি ইংরেজীতে জবাব দিলেন যে, মনে হয় বহু অনুসন্ধান ও ব্যর্থতার পর এবার তাঁহারা ঠিক জায়গায় আসিয়াছেন। এবার বৃষ্টি ধরিল বটে তবে বাতাসের জোর বিশেষ কমিল না। ধূসর শীতের সকালে দুই মধ্যবয়সী অধ্যাপক কাঁপিতে লাগিলেন।

মাটি ভেদ করিয়া যেন এক শীর্ণা বালিকা তাঁহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বয়স হইবে বার বৎসর। পরনে ঘাগরা আর কামিজ। অধরে পানের রাগ, আয়ত চক্ষু দুটিতে কাজল, কালো বেণীটি কোমরের নীচে গিয়া পড়িয়াছে। বলিল, 'আইয়ে।' আলি তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিলেন, 'কিধার।' মেয়েটি অবাক চক্ষে চাহিল। বাড়ির ভিতর ডাকিলে কেহ কি প্রশ্ন করে, কোথায়? ভাবিল, বুঝি শহরের লোক এইরূপ অবিশ্বাসী হয়। ঠোঁটের আর চোখের হাসির ঝিলিক সামলাইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, 'অন্দরমে।' এবার অধ্যাপক হরলাল সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, 'মোহনলাল!' বালিকা চলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে প্রফেসর আলি ও তাঁহার পশ্চাতে অধ্যাপক হরলাল অনুগমন করিলেন।

কোনদিন এটি বিরাট-আকার এক অট্টালিকা ছিল, এখন এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার উপর দিয়া যাইতে যাইতে হরলাল একখণ্ড ইষ্টক তুলিয়া লইলেন। কম্পিত দাঁড়াইয়া সেটিকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'এই ইট দুইশত বছরের প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে।' উত্তরে আলি বলিলেন, 'সাবধানে আসিবেন।' প্রথম দুইটি চত্বরের দ্বিতল ও একতলার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। তৃতীয় চত্বরের দ্বিতল নাই, আর কোন কোন ঘরের মাথায় বিরাট শূন্যতা। বালিকা সামনে আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'উধার ভি এইসা'। তারপর বাঁদিকে ঘুরিয়া একটি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। উপরের চওড়া কার্নিসের উপর কাপড় শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। প্রফেসর আলির মনে হইল যে তাহাদের পথপ্রদর্শিকা যে চাদর জড়াইয়া তাহাদের আনিতে গিয়াছিল সেটিও সেখানে শুকাইতেছে। কিন্তু বিপদ হইল যখন বালিকা কার্নিসের উপর দিয়া হাঁটিতে লাগিল। হরলাল স্থূল ব্যক্তি, তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, কার্নিসে হাঁটিলে সেটি ভাঙিয়া নীচে পড়িয়া যাইবে, তখন বীর মোহনলালের রোজনামচা ইহ-জীবনে আর দেখা হইবে না। আলিরও ভয় হইল কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া বালিকার অনুগমন করিলেন। বালিকা ফিরিয়া দেখিল হরলাল দাঁড়াইয়া আছেন। সে ফিরিয়া আসিয়া নির্ম্বিধায় হরলালের হাত ধরিয়া তাঁহাকে ওই সিক্ত বস্ত্রাদির উপর দিয়া কার্নিস পার করিয়া আনিল। তারপর অন্য একটি সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল। এই সিঁড়িটি পাথরে নির্মিত, খুবই প্রাচীন। ধাপগুলিও খুবই উঁচু-উঁচু। তাহার উপর ভীষণ অন্ধকার। বালিকা লাফাইয়া লাফাইয়া হরিণীর মতো নামিতে লাগিল। তাহার বেণীটি ফণিনীর মতো জীবন্ত হইয়া তাহার পৃষ্ঠে নৃত্য করিতে লাগিল। আলি দাঁড়াইয়া পড়িলেন। হরলাল পিছন হইতে টর্চবাতি জ্বালাইয়া আগাইবার নির্দেশ দিলেন। নীচের চত্বরটি পুরাতন ও জীর্ণ বটে কিন্তু অন্য অংশের তুলনায় মজবুত রহিয়াছে। উত্তর দিকের দরজার সামনে যে স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহাকে পথপ্রদর্শিকা বলিয়া চিনিতে অধ্যাপকদ্বয়ের ভুল হইল না। উভয়ে তাঁহাকে 'সালাম আলেকম' জানাইলেন, উত্তরে তিনি মধুর মৃদু কণ্ঠে 'আলেকম সালাম' জানাইলেন এবং ঘরের ভিতর বসিতে আহ্বান করিলেন। পরমুহূর্তে ধূমায়িত দুই গেলাস গরম চা তাঁহাদের সম্মুখে ধরিলেন। আলি তৎক্ষণাৎ এবং হরলাল এক মুহূর্ত চিন্তার পর গেলাস দুইটি গ্রহণ করিয়া গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

স্ত্রীলোকটি বালিকাটির বৃহৎ সংস্করণ মাত্র। বেশবাস জীর্ণ, চক্ষু গভীর ও আয়ত, পদযুগল ধূলায় মলিন। কিন্তু ঈশ্বর তাহার অবয়ব এমনই সুক্ষ্মভাবে গড়িয়াছেন যে সকল সময়েই তাহাকে সুন্দরী মনে হয়। দীঘল দেহে বয়স বুঝিবার উপায় নাই। ঠোঁটের ভাঁজ এমনভাবে স্পষ্ট যে মনে হইবে যে সর্বদা স্মিতহাস্য করিতেছে। উজ্জ্বল চক্ষু দুইটিকে খুব বৃহদাকার মনে হয়। হরলালের মনে পড়িল বাংলার পল্লীতে যে অসুরনাশিনী দুর্গার মূর্তি গড়া দেখিয়াছেন তাহার সহিত এ মুখের সাদৃশ্য আছে। চা খাইয়া শরীর একটু গরম হইল। মহিলা এবার একটি ডাবর ও জলপূর্ণ বদনা লইয়া প্রবেশ করিলেন। বালিকা তাঁহার পিছনে আসিয়া চায়ের খালি গেলাস দুইটি লইয়া গেল। উভয় অধ্যাপকের হাতে জল দিয়া মহিলা বদনা ও ডাবর লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। আলি ঘড়ি দেখিলেন—মধ্যাহ্ন সমাগত। তিনি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া নমাজ করিতে লাগিলেন। পকেট হইতে একটি কাপড়ের টুপি বাহির করিয়া পরায় তাঁহাকে অন্যরকম দেখিতে লাগিল। হরলাল এই অন্ধকার গৃহমধ্যে অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

পাশের ঘরে কে কাশিল, তার পর উচ্চস্বরে কী বলিল। মহিলার উত্তরও শোনা গেল, কিন্তু কী বলিলেন বোঝা গেল না। একটু পরেই মহিলা আবার আসিলেন। এবার একটু সাজিয়াছেন। চোখের সুর্মা নূতন করিয়া টানা হইয়াছে, চুলগুলিকে সংযত করা হইয়াছে। লণ্ঠনটি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'আইয়ে।' অধ্যাপকদ্বয় তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া, ঘরের ভিতর দিয়া অন্য অন্য ঘর অতিক্রম করিয়া চলিলেন। এইরূপ পাঁচ-ছয়টি ঘর অতিক্রম করিয়া এক রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিলেন। ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল। ভিতরে তেলের একটি বড় প্রদীপ জ্বলিতেছে। একজন প্রৌঢ় এবং দুইজন যুবক শ্বেতশ্মশ্রুসমন্বিত এক বৃদ্ধের খাটিয়া ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। অধ্যাপকদ্বয় ভিতরে আসিয়া অভিভাষণ বিনিময় করিলেন। স্ত্রীলোকটি একটি ছিন্ন মছলন্দের কার্পেট ঘরের একপাশে পাতিয়া তাঁহাদের বসিতে অনুরোধ করিলেন। অন্য ব্যক্তি ঘরে আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ এবার চোখ মেলিয়া তাকাইলেন। তারপর অসুস্থ দেহকে যথাসম্ভব বাঁকাইয়া অধ্যাপকদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিলেন। একটি যুবক তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, 'মোহনলাল।' বৃদ্ধ মাথা নাড়াইয়া শুনিয়াছেন জানাইলেন। তারপর বালিশের তল হইতে একটি বৃহৎ চাবি বাহির করিয়া প্রৌঢ়ের সামনে ধরিলেন। প্রৌঢ় চাবি লইয়া ঘরের অন্য প্রান্তে চলিয়া গেল। মহিলা লণ্ঠন লইয়া সঙ্গে গেলেন। এই ঘরটি যে দরবারগৃহের মতো বিরাট ও কারুকার্যখচিত তাহা এতক্ষণ বোঝা যায় নাই। ঘরের অন্য প্রান্তে এক সিন্দুক খুলিয়া একটি ছোট বাক্স লইয়া প্রৌঢ় ফিরিলেন। অধ্যাপকদ্বয়ের সম্মুখে বসিয়া সেই বাক্স হইতে একটি নূতন কাপড়ে বাঁধা পুঁথি বাহির করিলেন। মহিলা আসিয়া পুঁথির বাঁধন খুলিলেন, পুরুষটি কাঠের বাক্সটি অধ্যাপকদ্বয়ের সম্মুখে স্থাপন করিলেন, তাহার উপর পুঁথি রাখা হইল। হরলাল পুঁথির কাগজে অঙ্গুলি ঘষিয়া তাহার প্রাচীনত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আলি প্রথম পাতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া হরলালের টর্চটি জ্বালিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। বলিলেন, 'মোহনলালের রোজনামচা। নাস্তালেকে নহে, শিকস্তে রচিত হইয়াছে।'"

* * *

মোহনলাল সম্পর্কে যদি বঙ্কিমচন্দ্র কোন উপন্যাস লিখতেন তাহলে তার শুরু স্বচ্ছন্দে এইরকম হতে পারত। যেহেতু বঙ্কিম রীতিমত লেখাপড়া না করে কোন বিষয়ের অবতারণা করতেন না, সেজন্য পাটনার উপকণ্ঠেই এই উপন্যাসের পট-উত্তোলন স্বাভাবিক ছিল। মোহনলালের রোজ-নামচা পাওয়া গেলে তাঁর জীবনেতিহাস সম্পর্কে আলোচনা খুবই সহজ হয়ে যেত সন্দেহ নাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর কোন রোজনামচা পাওয়া যায় না। বস্তুত তাঁর কোন স্বাক্ষরও পাওয়া যায় না। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রচলিত নিয়মে তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অক্ষরজ্ঞানহীন হবার কোন বাধা নাই। কোম্পানির দরবারে তাঁর আর্জি পাওয়া যায় বটে কিন্তু সে যুগের মোগল নিয়মানুযায়ী আবেদনকারীর স্বাক্ষর ছাড়াই আবেদন নিবেদিত হতেও কোনরকম বাধা ছিল না। সুতরাং রোজনামচার সম্ভাবনা ভুলে গিয়ে মোহনলাল সম্পর্কে জ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্যাবলী আলোচনা করা যাক। বলা বাহুল্য, এইটাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভাগ্যান্বেষী মোহনলাল কাশ্মীরের অধিবাসী। যুদ্ধব্যবসায়ী হয়ে বাংলায় এলেন অপূর্ব সুন্দরী ভগিনীকে সঙ্গে করে। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবেদার নবাব আলিবর্দী খাঁ মহাবৎ জঙের পৌত্র সাহাজাদা মির্জা মহম্মদকে এই ভগ্নী বিক্রয় করে তিনি সাহাজাদার প্রিয়পাত্র হলেন। ইতিহাসের পাতায় এইটাই তাঁর প্রথম উল্লেখ। বয়স তাঁর তখন অন্যূন ২৪ বৎসর। তাঁর এই ভগিনী পরে লুৎফউন্নিসা নামে বিখ্যাত হয়েছেন। মির্জা মহম্মদ, নবাব সিরাজদ্দৌলা নামে সুপরিচিত। 'লুৎফ' মানে ভালবাসা এবং 'উন্নিসা' মানে স্ত্রীলোক, সুতরাং লুৎফউন্নিসা সিরাজদ্দৌলার ভালবাসার আধার হয়ে তাঁর চিরসহচরী হলেন।

সিরাজ-পিতা জৈনুদ্দিন আহমেদ খাঁ তখন পাটনার শাসনকর্তা। বাংলার সুবেদাররা তখন শাসনকাজের সুবিধার জন্য পাটনায় (বিহার) ও কটকে (উড়িষ্যায়) দুজন সহকারী সুবেদারের উপর নির্ভর করতেন। এই আলিবর্দীর কনিষ্ঠ জামাতা পাটনায় সহকারী সুবেদার হয়েছিলেন। পাটনায় জৈনুদ্দিন চরম অবিমৃষ্যকারিতায় ৩০০০ পাঠান অশ্বারোহীকে স্থায়ী চাকরিতে বহাল করলেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই পাঠান অশ্বারোহীরা বিদ্রোহ করল। জৈনুদ্দিন তাদের হাতে নিহত হলেন। রাজকোষের খবর পাঠাবার জন্য পাঠানরা জৈনুদ্দিনের বৃদ্ধ পিতা হাজি আহমদের ওপর এমন অত্যাচার করল যে কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হল। সিরাজ-মাতা আলিবর্দী-কন্যা আমিনা বেগম বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী হয়ে লাঞ্ছিতা হলেন। এই খবর মুর্শিদাবাদে পৌঁছলে বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা স্থগিত রেখে নবাব আলিবর্দী সসৈন্যে পাটনা যাত্রা করলেন। পাঠান-দের যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ করে নবাব শহর দখল করে কন্যাকে মুক্ত করলেন। ভ্রাতা হাজি আহমদ ও জামাতা জৈনুদ্দিনের দেহ কবরস্থ করা হল। সিরাজকে এবার পাটনায় আসার জন্য খবর পাঠানো হল।

সিরাজ তাঁর অতিপ্রিয় তুষারধবল গুজরাতী বলীবর্দচালিত শকটে সদ্যক্রীতা দাসী লুৎফউন্নিসাকে সঙ্গে করে পাটনা যাত্রা করলেন। মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে, "সিরাজদৌল্লা তাঁর সহচরী লুৎফউন্নিসাকে সঙ্গে করে গোশকটে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করেন।" এই সহচরী ক্রমে তাঁর প্রিয় সহচরী এবং পরে চিরসহচরী হয়েছেন। যদিও সিরাজ কখনও তাঁকে বিবাহ করে (নিকাহ) সম্মানের আসন প্রদান করেন নাই। বস্তুত জারিয়াকে বিবাহ করা তখনকার সমাজে খুব প্রচলিত ছিল না। সিরাজের একবার মাত্র বিবাহ হয় ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মির্জা ইরাজ খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ওমদাৎ উন্নিসার সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনই সম্প্রীতি ছিল না। এ বিবাহে কোন সন্তান নাই। নবাবমহিষীর দীর্ঘ জীবনের অবসান হয় ১০ই নভেম্বর, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, মুর্শিদাবাদ শহরে। যাঁরা ভ্রমক্রমে লুৎফউন্নিসাকে নবাব-মহিষীর সম্মান দিয়েছেন তাঁরা কেবল সিরাজ-চরিত্রের কলঙ্কভঞ্জন করতে চেয়েছেন। অনেক সময় অবশ্য অজ্ঞানতা এই ভুলের কারণ হয়েছে।

লুৎফউন্নিসা সম্ভবত সিরাজের তুলনায় বয়স্কা ছিলেন। যখন ক্রীতা হলেন তখন লুৎফউন্নিসার বয়স ১৭ থেকে ১৯-এর মধ্যে হবার সম্ভাবনা। সিরাজ তখন পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর

(জন্ম ১৭৩৩)। অপূর্ব সুন্দরী এই কাশ্মীরী মহিলা ক্রীতদাসী হলেও সিরাজকে সম্পূর্ণ বশীভূত করেছেন। মোহনলালের উন্নতি দেখলে এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না। পরবর্তী কালেও দেখা যাবে যে, আত্মমর্যাদায় এবং নবাববংশের সম্মান রক্ষার জন্য লুৎফউন্নিসা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। জীবনভোর সিরাজের প্রতি তাঁর আনুগত্য তাঁকে মহিমময়ী করেছে।

ভগিনীর এই গুণ ভ্রাতার মধ্যেও ছিল। মোহনলাল যেভাবে প্রভুভক্তি প্রকাশ করেছেন তা এই স্বার্থপরতার যুগে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু হল ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল। দিল্লীর অনুমোদন না পাওয়া সত্ত্বেও সিরাজদৌল্লা নিজেকে সুবেদার ঘোষণা করলেন। ১৫ই মের মধ্যে রাজা রাজবল্লভ হলেন কারারুদ্ধ। ঘসেটি বেগমের সম্পত্তি অপহরণ করা হল। মোহনলালকে দেওয়া হল দেওয়ান বা মন্ত্রীর মর্যাদা এবং 'রাজা' উপাধি। মীরমদন হলেন সেনাপতি। এঁদের পোষকতায় সাহসী হয়ে সিরাজ জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে দরবারে অপমান করতে দ্বিধা করলেন না। রায়দুর্লভ আর মীরজাফর পদচ্যুত হয়ে জীবনের আশঙ্কায় দিনযাপন করতে লাগলেন। ২রা জুন ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ করে সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করলেন ১৬ই জুন। ২০শে জুন কলকাতা জয় করে তার নাম আলিনগর রেখে সিরাজ প্রত্যাবর্তন করলেন। মোহনলালের ওপর মুর্শিদাবাদ রক্ষার ভার ছিল অনুমান করা যায়। কারণ কলকাতার যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন নাই। সেজন্য বিজয়শোভাযাত্রা তাঁর নির্দেশেই অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা। রায়দুর্লভের পক্ষে কলকাতার যুদ্ধ চালনা করেন মীরমদন।

মুর্শিদাবাদের বিজয়-আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হল। খবর এল সিরাজের মাতৃস্বসার পুত্র শওকত জঙকে দিল্লীর বাদশাহ সুবাদার মনোনীত করেছেন। গুজব রটল জগৎশেঠ নাকি বাদশাহকে প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দিয়ে এই সুবেদারি পরোয়ানা জারী করিয়েছেন। অগস্ট মাস থেকেই শওকত জঙের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হল। এই যুদ্ধের ভার মোহনলাল নাকি নবাবের কাছ থেকে ভিক্ষা করে নেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর মোহনলাল পূর্ণিয়া আক্রমণ করলেন। ১৬ই অক্টোবর শওকত জঙ মণিহারির যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন। আনন্দে অধীর সিরাজদৌল্লা নভেম্বর মাসে রাজা মোহনলালকে মহারাজা খেতাব এবং শওকত জঙের অধীন সব সম্পত্তি দিলেন। তদনুযায়ী মোহনলাল নবাবী জায়গীর বাহারবন্দ পরগনা লাভ করলেন। এতদিন এই জায়গীরে কেবল নবাব-বংশীয়দেরই অধিকার ছিল। তাঁকে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার পদও দেওয়া হল। মাত্র আট বছরের মধ্যে এক সাধারণ সৈনিকের এই উন্নতি অভাবনীয়। কপর্দকহীন পরিব্রাজক থেকে তিনি সাম্রাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠ অর্থবান আমীরে রূপান্তরিত হলেন।

মোহনলাল সম্পর্কে বিশদ বিবরণ কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জাঁ লা সাহেবের লেখনীতে পাওয়া যায়। লা সাহেব মোহনলালকে পছন্দ করতেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মোহন-লালকে মাতব্বর করে তিনি সিরাজদৌল্লার সঙ্গে পরিচিত হন। এই যোগাযোগের সূত্রেই তিনি দিনেমার বণিককুলকে বাংলার ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। লা সাহেব লিখেছেন, সিরাজের আনু-কূল্য ছাড়া তিনি কখনই নবাব আলিবর্দীর কাছ থেকে দিনেমার বণিকদের জন্য ব্যবসার ফরমান বা অনুমতিপত্র আদায় করতে পারতেন না। সে বছর সিরাজদৌল্লা দিনেমার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রচুর উপঢৌকন পেয়েছিলেন এবং সেজন্য লা সাহেবের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন।

লা সাহেব এইসব কারণে মোহনলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মোহনলাল দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হলে লা সাহেবের সুবিধা হয়। এই নৈকট্য যে লোকদেখানো ছিল না তা বোঝা যায় সিরাজদৌল্লার লা সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে অসুস্থ মোহন-লালকে দেখতে যাবার খবরে। লা সাহেব মোহনলাল সম্পর্কে অনেক কথা লিখে গেছেন। তার

অনুবাদ এইরকম ঃ "সিরাজদৌল্লার মন্ত্রী বা দেওয়ান মোহনলালের মতো সেরা বদমায়েশ পৃথিবীতে আর ছিল না। যেমন প্রভু তার তেমনি উপযুক্ত মন্ত্রণাদাতা। তা সত্ত্বেও মোহনলাল ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি নবাবকে সত্যি ভালবাসতেন। তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে প্রভুর পতন হলে তাঁরও সর্বনাশ হবে। দৃঢ়তা এবং প্রখর বিচারবুদ্ধি ছিল মোহনলাল চরিত্রের প্রধান গুণ। সিরাজদৌল্লার মতোই মোহনলালও জনসাধারণের চোখে ঘৃণ্য ছিলেন। শেঠদের তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান শত্রু। তাঁদের ষড়যন্ত্র এবং অপকীর্তি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। বুদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি ছিলেন শেঠেরা ষড়যন্ত্র করার আগেই বিনষ্ট হত। নবাবের জন্য মোহনলালের হাত-পা বাঁধা ছিল। তা ছাড়া, সিরাজদৌল্লার সব থেকে সংকটাপন্ন সময়ে মোনহলাল ছিলেন মরণাপন্ন অসুস্থ। এ সময় তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে বা বাড়ি থেকে বাইরে যেতে পারতেন না। আমি নবাব সিরাজদৌল্লার সঙ্গে এই সময় দুইবার তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। সে সময় তাঁর কথা বলার ক্ষমতাও ছিল না। অনেকে মনে করতেন তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা হয়েছিল। এ সম্পর্কে মোহনলাল কোন কথা বলেননি। এই দুর্ঘটনায় সিরাজদৌল্লা নিজেকে খুব অসহায় মনে করতেন।"

শওকত জঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধের পর অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মোহনলাল অসুস্থ হন এবং পরবর্তী জুন মাসে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের সময়েও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন নাই। এই সময় ইংরেজ কোম্পানি তাঁকে খোসামোদের চেষ্টা করেছে। ক্লাইভ সিরাজদৌল্লাকে এক পত্রে লেখেন যে, 'তাহাদের আর্জি সাম্রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদের দিয়া অর্থাৎ জগৎ শেঠ, মোহনলাল, মীরজাফর প্রভৃতির মধ্যস্থতায় সালিস নিষ্পত্তি করিতে চাহেন।' এর পর পলাশীর যুদ্ধ। এবারও মোহনলাল আর মীরমদন নবাবকে পরামর্শ দিলেন যে মীরজফরকে বধ করে তারপর যেন পলাশীতে সৈন্যসমাবেশ করা হয়। এবারও নবাব এই বিষম সংকটের সময় তাঁর অস্থিরমতিত্ব ও রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব প্রমাণ করলেন। তাঁর চরিত্রে অদূরদর্শিতা এবং লোকচরিত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা মারকের রূপ ধারণ করল। তিনি মীরজাফরের বাড়ি সৈন্য দিয়ে ঘিরে রেখে তাকে প্রধান শত্রুতে পরিণত করেছিলেন। এবার সমস্ত মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে সেই শত্রুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে প্রধান সেনাপতি হতে রাজী করিয়ে নিজের মৃত্যুর পরোয়ানায় স্বাক্ষর করলেন।

স্যার আয়ার কূট পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে একজন সেনাপতি ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কোম্পানির প্রধান সেনাপতি হন। সেই সময় মহারাজা নন্দকুমার ছিলেন তাঁর দেওয়ান। আয়ার কূটের রোজনামচা পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে আকরগ্রন্থগুলির অন্যতম। কূট লিখেছেন, নবাব সিরাজদৌল্লা তাঁর কোন সেনাপতিকেই বিশ্বাস করতেন না, তাই সকলকে সঙ্গে রাখতেন। একথা নবাবের কীর্তি দেখলে সত্য মনে হয়। মোহনলাল, মীরমদন এবং সাঁফ্রি থাকা সত্ত্বেও তিনি যেভাবে পদচ্যুত কর্মচারী মীরজাফর ও রায়দুর্লভের অধীনে সৈন্য রেখেছিলেন তাতে তাকে হয় বাতুল নয় মূর্খ মনে হয়।

পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল আষাঢ় মাসে। বৃষ্টি তো হবেই। ওদিকে ইংরেজ কোম্পানির বারুদ ভিজল না, এদিকে ফরাসী সাঁফ্রির বারুদ ভিজল না, কিন্তু ভারতীয়দের ভিজে গেল—এই বা কেমন কথা। পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে সব প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণই ইংরেজ পক্ষের। ভারতীয় পক্ষে মুতাক্ষরীণ পাটনায় বসে লোকমুখে মোহনলালের বীরত্ব শুনে বর্ণনা করেছেন। লোকমুখে শুনেই যুদ্ধের পর রায়দুর্লভের আজ্ঞায় মোহনলালের নৃশংস হত্যার কথা তিনি লিখেছেন এবং

তদনুযায়ী বহু ঐতিহাসিক পলাশীতে বা তারপরে বধ্যভূমিতে মোহনলালের মৃত্যুর কথা লিখে গেছেন। এ সংবাদ ভিত্তিহীন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মোহনলালের মৃত্যু হয় নাই।

কিন্তু সে কথা বলার আগে অন্য দুই-এক কথা বলা প্রয়োজন। সিরাজদৌল্লাকে ভগিনী বিক্রয় করে এবং তারপর তাঁর সাহচর্যে এবং সংসর্গে থেকে মোহনলাল কিন্তু হিন্দুসমাজ থেকে ব্রাত্য হলেন। তাঁর বিবাহের কোন খবরই ঐতিহাসিক হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন বাহাদুর আলি খাঁর সঙ্গে। এই মুসলমান বীর নিজের চেষ্টায় সিরাজদৌল্লার বাহালিয়া বন্দুকবাহিনীর প্রধান হন এবং অসমসাহসে যুদ্ধ করে পলাশীতে মৃত্যু বরণ করেন। বিকাল চারটায় সিরাজের পলায়নের পর যুদ্ধের শেষ ধকল তিনি এবং তাঁর বন্ধু কামানবাহিনীর সেনাপতি নউএ সিং হাজারী সহ্য করেন। দুই বন্ধুই বীরের শয্যা গ্রহণ করেন। পলাশীর মাঠে নবাবপক্ষে পাঁচশত জনের অধিক হয় মৃতের সংখ্যা।

এতদিন মনে করা হত পলাশীতে মোহনলালের সমাধি। কিন্তু দেখা যায় তা নয়। পলাশীর যুদ্ধ আরম্ভ ও শেষ হয় ২৩শে জুন। ওয়াটস সাহেব কর্নেল ক্লাইভের কাছে মোহনলালকে উপস্থিত করার প্রস্তাব করেছেন ২৬শে জুন অর্থাৎ যুদ্ধের পরে। সুতরাং ওয়াটস জানতেন যে মোহনলাল জীবিত এবং সুস্থ আছেন। এই সাক্ষাৎকার হয়নি। সম্ভবত গুপ্তহত্যা এবং বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় মোহনলাল পলাতক হন। তারপর খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে দীর্ঘ চোদ্দ বছর পর। এই অন্তর্বর্তী কালে তিনি কোথায় ছিলেন বা কী করেছেন জানবার উপায় নাই। ২৭শে জুন ১৭৫৭ থেকে ১১ই ডিসেম্বর ১৭৭১ তাঁর অজ্ঞাতবাসকাল।

রাজস্ব দস্তরের কাগজে মোহনলালকে আবার পাওয়া গেল। সম্ভবত তিনি দিনাজপুর হয়ে বিহারে কোথাও অজ্ঞাতবাস করেন। ১২ই ডিসেম্বর বাহারবন্দ জায়গীরের সূত্রে মুর্শিদাবাদের রাজস্ব দস্তরে তাঁর একখানি আর্জি পাওয়া গেল। তাতে তিনি লিখেছেন যে নবাব সিরাজদৌল্লার আদেশমূলে তিনি বাহারবন্দ পরগনার জায়গীরদার হয়েছিলেন এবং ওই পদে পলাশীর যুদ্ধের দিন অর্থাৎ ২৩শে জুন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে ওই পরগনা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। সুতরাং দিনাজপুরের রাজার কাছে তাঁর ২০,৪৯২ টাকা পাওনা হয়েছে। বারবার তাগিদ দিয়েও এই টাকা তাঁর পক্ষে আদায় করা সম্ভব হয় নাই। মাননীয় সরকার কোম্পানি বাহাদুর ওই টাকা আদায় করে পৌঁছে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবেন। এ তরফে কোন উত্তর না দেবার ফলে মোহনলাল ২০শে ডিসেম্বর আর-এক আর্জিতে তাঁর বক্তব্যের পুনরুক্তি করলেন। এই অর্থ তিনি আদৌ পেয়েছিলেন কিনা জানা যায় না।

এই সময় থেকেই তিনি পাটনাতে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে গবর্নর-জেনারেল হয়ে এলে মোহনলালকে পাটনায় নিয়মিত একশত টাকার মাসহারা করে দেন। এই সময় ইংরেজ কোম্পানি নবাবের পরিজনবর্গের সকলেরই মাসহারার সুবন্দোবস্ত করেন। তদনুযায়ী সিরাজপত্নী ওমদাৎ উন্নিসা, সিরাজকন্যা ও তার মাতা সিরাজের প্রিয় সহচরী লুৎফউন্নিসা, সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর্জা মেহেদী (যিনি পরবর্তী কালে মহবুল আলি খাঁ নাম গ্রহণ করেন), সিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মুরাদদৌল্লা, রাজা মোহনলাল প্রভৃতি সকলেই মাসহারা আমৃত্যু পেয়ে এসেছেন। মাসহারার ব্যবস্থায় সন্দেহ থাকে না ইনিই সিরাজের মোহনলাল। আর-এক প্রমাণ হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব, যিনি কাশিমবাজার কুঠিতে বিভিন্ন পদে একনাগাড়ে ১৭৫২ থেকে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন, লা সাহেবের মতো সিরাজের পার্শ্বচরদের তিনি ভালভাবেই চিনতেন। গবর্নর হয়ে আসার পর সিরাজদৌল্লার অন্যান্য পরিজনদের সঙ্গে মোহনলালের মাসহারার ব্যবস্থা করে দেওয়া তাঁর পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক হয়েছিল।

এরপর মোহনলালের খবর কোম্পানির অর্থনীতি ও ব্যবসা বিভাগের কাগজ থেকে পাওয়া গেল। জানা গেল যে তিনি পাটনায় স্থায়িভাবে বসবাস করেন এবং বস্ত্রব্যবসায়ী হন। এই বস্ত্র তিনি কোম্পানিকেই রপ্তানির জন্য বিক্রয় করেছেন। মুনাফা নিশ্চয় ভাল হয়েছিল কারণ দেখা যায় ব্যবসা নিয়মিত প্রসারিত হয়েছে। পরে দেখা যাচ্ছে, মোহনলাল রেশমের কাটা কাপড় এবং আফিং সরবরাহের ব্যবসাতে বেশ ভালভাবেই মগ্ন হলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দেও তাঁর শরীর সবল এবং মন ব্যবসায় মশগুল। বস্ত্র ছেড়ে তিনি আফিং সরবরাহ করাতেই মেতে উঠলেন। ভাবতে মন্দ লাগে না—কাশ্মীরের যুদ্ধব্যবসায়ী, পলাশীর বীর এবং সিরাজের প্রিয়পাত্র মোহনলাল, ইংরেজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আফিং সরবরাহ করছেন এবং তাঁরা সেই আফিং চীনে বিক্রি করছে, যার ফলে চীনেদের সঙ্গে ইংরেজদের ১৮৩৯ থেকে আফিং যুদ্ধ বেধে গেল। তবে শতাব্দীচক্রে মোহনলালের আফিংএর ব্যবসার পতন হয়েছে বলে মনে হয়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় অন্ধ মোহনলাল আর-এক ব্যক্তিকে যষ্টি করে পূর্ণিয়াতে পঞ্চাশ বছর আগেকার বাকী খাজনা আদায়ের ব্যর্থ চেষ্টা করে লাঞ্ছিত হয়েছেন। এইটাই মোহনলাল সম্পর্কে আপাতত শেষ খবর। বয়স তাঁর তখন ৮৪। মোহনলালের শেষ জীবনের ইতিহাসের চর্চা গবেষকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এবার অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

এই প্রসঙ্গ হল ভ্রাতা-ভগিনী-সংবাদ। পলাশীর যুদ্ধের পরই লুৎফউন্নিসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হন। সেখানেই তাঁর কন্যা উন্নতসায়রা বেগম বিবাহিত হন এবং একে একে চারটি কন্যার জন্ম দিয়ে অবশেষে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। লুৎফউন্নিসা সঙ্গে সঙ্গে গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসকে পত্র লেখেন এবং উন্নতসায়রা বেগমের প্রাপ্ত মাসহারা তার কন্যাদের নামে বরাদ্দ হয়। কালে লুৎফউন্নিসা একে একে এই চার দৌহিত্রীর বিবাহ দেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লুৎফউন্নিসা বেগম গবর্নরকে আর-এক বিষয়ে পত্র লেখেন। ১৪ই জুন এক আর্জিতে বেগম অভিযোগ করেন যে পাটনায় সিরাজদৌল্লার পিতা নবাব জৈনুদ্দিন আহমেদ খাঁ এবং তাঁর পিতা হাজী আমেদের কবরের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ চালাবার জন্য যে দুইটি গ্রাম দেওয়া হয়েছিল, কোম্পানির মুৎসদ্দিরা সেই দুইটি গ্রাম কেড়ে নিয়েছে, কাজেই সমাধিক্ষেত্রের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। বলা বাহুল্য, হেস্টিংস সাহেব তখনি পাটনার ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষকে এই গ্রাম দুইটি ফিরিয়ে দেবার আদেশ জারি করেন। এই ঘটনায় পাটনার মোহনলালের সঙ্গে ঢাকায় লুৎফ-উন্নিসার যে যোগাযোগ ছিল তা সহজেই প্রমাণ করা যায়। লুৎফউন্নিসা বেগম খোসবাগে ১১ই আশ্বিন ১১৯৭ সালে অর্থাৎ ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দেহরক্ষা করেন।

এই হল বীর মোহনলালের জীবনী। অথচ তাঁকে নিয়ে সেই ১৮৭৫ থেকেই নানা রচনা দেখা যায়। মনে হয়, কবি নবীনচন্দ্র সেনই তাঁর পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে প্রথম মোহনলালের বীরত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী তাঁর নবাব সেরাজুদৌল্লা নাটকে 'বীরকেশরী মোহনলাল' কথা ব্যবহার করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের ১৯০৫-এর সিরাজদৌল্লা নাটকে মোহনলাল সম্পর্কে কোন উচ্ছ্বাস নাই বলেই বোধহয় কয়েক বৎসর পরে শরৎকুমার রায়ের মোহনলাল নামে এক সুবৃহৎ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, সে কথিকার সবই কল্পনা ; কিন্তু তার ফলে উপন্যাস-নাটকে মোহনলালের পুনর্জাগরণ হল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নিশিকান্ত বসু রায়ের বঙ্গে বর্গীতে মোহনলাল এক মুখ্য চরিত্র। সেই আষাঢ়ে গল্পের জেরই দেখা গেল ১৯৩৮-এ শচীন সেনগুপ্তর সিরাজদৌল্লা নাটকে এবং তার পরবর্তী কালে ১৯৪৫-এ হীরেন্দ্র-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পলাশী ও শীতাংশু মৈত্রের ১৯৫৩-য় প্রকাশিত মোহনলাল নাটক দুটিতে।

মোহনলাল বাঙালী, সুতরাং কোন্ জেলার অধিবাসী—তাই নিয়ে রাজনৈতিক কর্মীদের বহু

হাস্যকর তর্কবিতর্ক উপভোগ করা গেছে। হয়তো দুই জেলায় মোহনলালের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করার কথাও উঠেছিল। এইসব নিতান্ত বালকোচিত আলোচনা সময়ের অপব্যবহার মাত্র। ইতিহাস সম্পর্কে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অভাব এবং ইতিহাসচর্চা বা অনুশীলনে অনীহাই এইসব প্রয়োজনহীন প্রচেষ্টায় কোন ব্যক্তি বা দলকে উদ্বুদ্ধ করে। মোহনলাল সম্পর্কে জ্ঞাত ইতিহাস আলোচনা করে যদি তার প্রকৃষ্ট রূপ প্রকাশ হয়ে থাকে তাহলে এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে।

এই রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তকাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে :

1. সৈয়দ গোলাম হোসেন, সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ
2. করম আলি, মুজাফ্ফরনামা
3. গোলাম হোসেন সালিম, রিয়াজুস সালাতিন
4. Percival Spear, Master of Bengal, Clive and His Times.
5. Jean Law, Three Frenchmen in Bengal.
6. S. C. Hill. ed., Law's Memoirs.
7. S. C. Hill. ed., Diary of Sir Eyre Coote.
8. Jadunath Sarkar ed., History of Bengal, Vol. II.
9. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সিরাজদৌল্লা
10. নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ও মুর্শিদাবাদ কাহিনী
11. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস
12. K. K. Datta, Early Career of Sirajuddowlah ; and Alivardi and His Times.
13. J. H. Little, House of Jagat Seth.
14. S. C. Hill ed., Bengal in 1756-1757.
15. Further Report of the Committee of Secrecy Appointed to Enquire into the East India Company (1773).
16. Proceedings of the Revenue Board consisting of the Whole Council of 3rd May, 1774.
17. Do of 14th June, 1774.
18. Clive's letter to Nabob Siraj-ud-dowlah of 13th June, 1757.
19. Proceedings of the Revenue Board Consisting of the Whole Council of 12th July, 1774.
20. Proceedings of the Controlling Council of Revenue at Murshidabad of 12th and 23rd December, 1771.
21. Letter of Copy book of the Resident to the Durbar, 10th and 13th June, 1773.
22. Board of Trade (Commercial) Proceedings of 1783 to 1796.
23. সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সিরাজদৌল্লা সাহিত্যে ইতিহাসে, ইতিহাস পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭৬
24. ঐ সিরাজদৌল্লার মহিষী, ইতিহাস পত্রিকা, ভাদ্র-অঘ্রান, ১৩৭৭
25. ঐ বন্দর কাশিমবাজার
26. ঐ বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা

27. Somendra Chandra Nandy, Journal de l' Institut de Chandernagor পত্রিকার ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভল্যুমে প্রকাশিত Cossimbazar—The Queen that was.
28. Do Life and Times of Cantoo Baboo, the Banian of Warren Hastings, Vol. I. and II.
29. India Office Library, Bengal Revenue Miscl. Consultations of 20 May, 1791.
30. Do. Persian Correspondence, Vol. IX-1790, Vol. X 1792-93.

পাখি এইবার

শান্তিকুমার ঘোষ

এই হচ্ছে খেজুরগাছ, এই তার ছায়া,
নীচে টলটল করছে জল।
দুই ধর্মযোদ্ধা হাঁটু মুড়ে একসঙ্গে নুয়ে আছে মাথা ঃ
পাখি এইবার গেয়ে উঠবে গান॥

সামনে সমুদ্র, আর এই হচ্ছে ভূখণ্ডের সীমা,
ঢেউয়ের ওপর দুলতে থাকে নৌকো।
মাত্র একবার নৌযাত্রী নিজের মুখোমুখি ঃ
সূর্যাস্ত ছাড়িয়ে ফুটে উঠল তারা॥

এই শেষ লোকালয়, এর পর স্রেফ খাড়াই শূন্যতা,
নেমে আসবে হিমবাহ, বিঁধবে তুষার-ঝড়।
উচ্চতা ক-জনা ভাঙি—সঙ্গে কে ও নিঃশব্দ আরোহী।
সমস্ত গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে শিখর॥

মুখ দেখা

বার্ণিক রায়

আজো বেঁচে আছো তুমি! কী চাও, কী পাবে, কোন্ আলো
তোমাকে এখনো নেশা জাগায় তোমার ভীরু মনে!
ভেবে দ্যাখো নিজে ডুবে ঃ
তোমাকে চায় না কেউ, তবু তুমি তাদের মিলনে
সহাস্যে দাঁড়াও গিয়ে, চোখ টিপে মুচকি হাসে প্রাণ,
আনন্দের উৎসবে পুষ্পমালা ভাগ করে নেয়
হৃদয়ের সঙ্গী যত বাতাসে বৃষ্টির ভেজা গন্ধে ;
শূন্য হাতে ফুল নিয়ে একা একা ভিড়ের নিঃসঙ্গে
বাসে করে ফিরে আসো তোমার উদোম বন্ধ ঘরে,
পৃথক বিচ্ছিন্ন ভয় কথা কয় তোমার নিশ্বাসে।
জীবন হারায় যদি তবু জীবনের তরী বাওয়া
আকাশ-দিগন্ত জলে ঢেউ-এর দোলায় মুখ দেখে।

আত্মঘাত

প্রদ্যুম্ন মিত্র

পলকে তোমায় দেখে আত্মঘাতী হই।
আমাকে সংবেদ দিলে হায়রে কৃপণা
নিহত পাথরে বোধ সে কতটুকুই
ফোটাবে অক্ষরে ফুল পোড়ো থামে কি শীর্ণ জ্যোৎস্না!

ফাটলে গচ্ছিত ঘাস পাথরে প্রপাত
অপেক্ষায় ছিল তুমি কখন তোমার
স্পর্ধিত ইচ্ছার বেগে এই অধঃপাত
মিথ্যা করে ফেরাবে চিকন নীল ঘাড়,
তবু সেই অগোচর-লালিত স্বপ্নের
অস্পৃশ্য ওষ্ঠের লোভে বন্দী সিসিফাস
নীলাভ শিখর থেকে নেমে এসে ফের
ঘৃণার মুঠোয় ধরে উদ্যমের ত্রাস,
তেমনই তোমায় দেখে আসঙ্গ-শোণিতে
শিশ্নের উত্তেজ ফেলে নেমে যাই মরণের শীতে॥

অনন্ত অরুন্ধতী তুমি, অন্ধকারে

দাউদ হায়দার

পৃথিবীর সর্বত্র সেই একই অন্ধকার, যে অন্ধকারে তোমাকে দেখি না
অনন্ত অরুন্ধতী তুমি, অন্ধকারে
বহুদিন পড়ে আছি বেদনাহত।

মানুষের মনে এক অন্তহীন অন্ধকার, অন্ধকারের ব্যথা ও বেদনায়
সমস্ত আকাশ যখন নীল হয়ে ওঠে, সূর্যাস্তের পর আরো বেশি ঘন হয়
অনন্ত অরুন্ধতী তুমি, অন্ধকারে জেগে ওঠো।
সমস্ত দুঃখের মধ্যে, সমস্ত শিল্পের মধ্যে পুনরায় যখন পল্লবিত হও
বৈতরণী পার হয়ে চলে যাও অনন্তের দিকে ; সমস্ত নীলিমা জুড়ে
সমস্ত পৃথিবী ও বনাঞ্চল জুড়ে
তোমার শুভ্রতা, তোমার শিল্প, তোমার বিন্যাস।

অনন্ত অরুন্ধতী, বহুদিন পড়ে আছি অন্ধকারে ; বেদনাহত।

বাড়ির ছবি

রবীন সুর

অবিরাম হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠোকার শব্দে
একটা পাখি ;
নর্দমার মাছধোয়া জলের আমিষ গন্ধে
রান্নাঘরের ছাদে ছটফটাচ্ছে কাক।

উঠোনে দাঁড়িয়ে-ওঠা একদঙ্গল সুপুরির সবুজ মাথা
দাউ দাউ করে উঠছে আকাশছোঁয়া অভিপ্রায়ে।

গনগনে উনুনের কড়াই তোলপাড় খুন্তির তাড়সে
বাতাসে মাছভাজার গন্ধ—
টগবগ করে ফুটছে সাঁতলানো ঝোল।

আজ ঠিকে ঝি আসেনি—
পাতকোতলায় ডাঁই হয়ে পড়ে আছে এঁটো বাসন,
ঘরময় নৈনেত্তর ছত্রাকার বাটনা বঁটি হাতা খুন্তি পাশে সরিয়ে
কুলোয় চালের কাঁকর বাছতে বাছতে
বিনবিনে কপালের ঘাম মুছে
গজগজ করছে অগোছালো চুলের গেরস্ত রমণী।

সকাল নটার সাইরেন ককিয়ে উঠতেই
উনুনের পাশে আর-একটা স্টোভ জ্বলে উঠল—
সাড়ে নটার লোকাল ধরার ফটোফিনিশ ঘোড়দৌড়ের
শেষ গ্যালপে...

ছেঁড়াবাবুর উপাখ্যান

মিহির সিংহ

গল্পের নায়ক সম্ভবত শেষকালে মরে গিয়েছিল। অবশ্য সেটা একটু অবান্তর হলেও হতে পারে। কারণ শেষকালে সকলকেই কাল শেষ করে। গল্পেরও যে সেইসঙ্গে শেষ এমন কোনো কথা নেই। গল্প তার আগেই ফুরোতে পারে। আদৌ না ফুরোতেও পারে।

১

এসব বড় সাদামাঠা কথা তবু না বললেও চলে না কারণ সোজা কথাগুলোই আজকাল আমার বেশি গুলিয়ে যায় শক্ত কথা বরং খানিকদূর বেশ গড়গড় করে ভাবতে পারি। যেমন এই গল্প কথাটা লিখতে গিয়ে সরল মনে হল যে গল্পের প্রধান জাত দুটো ঃ ছেলে গল্প মেয়ে গল্প। কোনো গল্প লোকে লেখে কোনো গল্প লোকের ঘাড়ে চাপে সিন্ধবাদ নাবিয়ে বাঁচে। এক সিন্ধবাদকে চিনি এমন জব্বর গল্প চেপেছে অথচ নাবাতে পারছে না তার ঘাড় মটকাচ্ছেই অথচ বেচারার বন্ধুদের ঘাড় খালি থলে ভর্তি খুব চালাক খুব পরিতৃপ্ত। ইচ্ছে ক'রে যা লেখে টাকার জন্যে নামের জন্যে শটকে শেখানোর জন্যে লেখে। লেখে—যন্ত্র করেই হোক আর এলেবেলে করেই হোক। অভ্যেসেও লেখে। মেয়ে গল্পগুলো প্রাকৃতিক, দারুণ রহস্যপূর্ণ। ছেলে গল্প উতরে গেলে স্যাডিজমটা খুব বেঁধে। মেয়ে গল্পে কিন্তু সব সময়েই নিজেকে খোঁচানো। আর মাঝামাঝি বিজবিজ করে নপুংসক গল্পগুলো অসম্পূর্ণ সৃষ্টি হেঁড়ে গলায় মেয়েলী গানে তালি ফাটিয়ে নিজের গর্দানে ঝোলানো বেধড়ক ঢোল পিটিয়ে পয়সা বা তৃপ্তি। পয়সা বুঝি। তৃপ্তি কাঁসের কে জানে? তবে ওরা বেশ দল বেঁধে থাকে দেখি সোহাগে এ ওর চুল বাঁধে পালে পার্বণে না হলেও অনেকের চলে না বাচ্চাদের আর বৌঝিদের চির কৌতূহল। গল্প জন্মানোও তো মানুষ জন্মানোর মতনই জটিল স্বাভাবিক—জানি না কেন পালে পালে এই তিন নম্বরের বাচ্চাই এত।

২

গল্পের নায়কের নাম ভুলে গিয়েছি নিজের নাম বাবার নাম অব্দি বার বার মনে পড়ে আবার ভুলে যাই। তাতেও কিছু যাচ্ছে আসছে না কারণ অ—বাবু আ—বাবু ক—বাবু খ—বাবু লিখবার রেওয়াজ ছিল। আসল নামটাও করা যাবে না। তা ছাড়া এ বাড়িতে যে মেয়েটি গত ছয়-সাত বছর কখনো ঠিকে কখনো দিনরাত্তিরের কাজ করে আসছে সে যে তার আর-এক মনিবের নাম দিয়েছিল ছেঁড়াবাবু কিছুদিন হল জেনেছি এ গল্পের নায়ক। তাও বছর তিনেক হল। ওদের রসিকতাজ্ঞান সর্বদা আমাদের মাথায় ঢোকে না কাজেই নামকরণের ব্যাখ্যাটাও ওর কাছে শুনে নিতে হয়েছিল ঃ বড় ছেঁড়া জামা ময়লা কাপড় পরেন। যদিও ওর ধারণা যে আলমারিতে ভাল জামা কাপড় যথেষ্ট। মেয়েটার মনটা ভাল তাই বোধকরি বিরক্ত মমতায় ঐ নাম ঃ ছেঁড়াবাবু। আমি তখন দীর্ঘ রোগযন্ত্রণার মধ্যে মমতা আর বিরক্তি ছানা-কেটে-যাওয়া মনের মধ্যে পরস্পর আলাদা ভাসছে। আমিও তখন বাধ্যতামূলক ছেঁড়া ধুতির লুঙ্গি বানিয়ে কোমর থেকে গোড়ালি

খাপে রাখি। পায়েই ভীষণ অসুখ। ছেঁড়া বাবু ১-এর পরে ছেঁড়া বাবু-২ বলে ঠাট্টাটুকু গায়ে মেখে চটেও উঠতে পারতাম। কিন্তু নির্ঘাত এক ফোঁটা জাদু পড়ল—সব জাদুই আসলে এক কেমিকলে তৈরি—কেউ বলে করুণা, প্রেস, ভালবাসা। উলটে তাই ভাবলাম কোনো না কোনো ভাবে সে মানুষটাও নিশ্চয়ই দুঃখী। তবে যা ভাবে তা লোকে বলে না ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা তাই এখন চাইলেও বলতে পারি না। বলি একটা অন্য কিছু শুনেই কেউ যদি সত্যি ভাবনা একটুও বোঝে তো বলি আমাকে ভালবাসে যদিও সেটা ঠিক একেবারে ঠিক নয়। বুঝলে ভাল নাও বাসা যায়, বাসলে ভাল না বোঝাও যায়। বললাম ঃ গরিব লোক ছেঁড়া পরবেই রে এই দ্যাখ এসব একদম ছেঁড়া। আমি এক ছেঁড়াখোঁড়া, ঠ্যাঙে ক্যান্সারের ফোড়া। দুমাসের জন্যে চারখানা লুঙ্গি কিনব জীবনে কখনো লুঙ্গি পরি না। অত পয়সা নষ্ট করার মতন আমার নেই রে যে এই কদিনের জন্যে নতুন কিনে আনব। মেয়েটা বড্ড ভাল। ফুলঝাটা এক জায়গায় বোলানো হাতের ভর দিয়ে ঝাঁটা চেপে বন্ধ করে কিছু একটা ভাববার মুদ্রা দেখাল। ওটাও আমাদের ভাষার মতন দরকচা। যে মুদ্রা যে ভঙ্গি করি সাধারণত সেইটুকুই শুধু করি মানে সেই ভঙ্গিটাই শুধু। মেয়েরা একটা বয়েসে যেমন চোখ পাকিয়ে তাকাল মানে রাগের অভিনয় মানে আরেকবার চান্স নাও ভালই লাগছে বা হাত সরিয়ে দেওয়া মানে আরেকটু নিয়মরক্ষা বা ওখানে কী এই-খানে তো, ফলে কোনো মেয়ে যখন সরল রীতিতে হাতটাকে ছানি দিয়ে ডেকে নেয় বন্ধুর পুরুষের বন্ধুকে জাপটানোর মতন ব্যর্থহীন তখন কিন্তু বাছারা ঘাবড়ে নেতিয়ে যান। কারণ ভাষা। কথা ব'লে কথা বোঝানো খুব মুশকিল। কথা না বলা আয়ত্ত না করলে সমস্ত চেতনাকে সবাক না করলে প্রায় কোনো কথাই আর বলা যাচ্ছে না। ঐ ভিতরে ভিতরে না বলা না বলে ফেলা অর্থপূর্ণতা ম্মাগল করে দেওয়া ছাড়া। কাঁদা কি আর যায়? কাঁদা কি আরো যায়? না কেঁদে অনেকে হেসে পর্যন্ত তবে না একটুখানি সেই চাহনি, গলায় সেই এক পলকের কাঁপন। তবে ও মেয়েটা চিরজন্ম ঐ লেকের পারের শহুরে হলেও আসলে ওদের বস্তিটা বস্তি নয় শহরের মধ্যে গ্রামের ছেঁড়া টুকরো, বেজায় বদমাইশ অনেকে তবে দখনে ভাষায়, হরদম ছুতোয় নাতায় সোনারপুরে আর জয়নগর না গুন্টির পিণ্ডি এত দেশে যাওয়া কাঁসের রে বাপু, যাবে আর রোগা কেলে হয়ে ফিরবে, একটা বর্দলিও পাওয়া অসম্ভব এক মাসের কম, তবু, যদিও বা নেমকহারাম হয়ও বেশ লোকগুলো। এখনো এই দুঃসময়েও কোনো মতলব ছাড়াই সরল থাকতে পারে। না শিখে-টিখেও এমনিতেই অকৃত্রিম। সবাই নয় সর্বদাই নয় দুটো চারটে বেশ ভাল লোক। হয়তো মেয়েটা একটু সান্ত্বনাই দিতে চাইল আমার সম্বন্ধেই উঁচু ধারণার অভিনয় ক'রে, উঁচু ধারণার একমাত্র মাপকাঠি এখন কে কত বিত্তবান বা বড়জোর প্রতিপত্তির জোর আছে, সেই অভিনয় ক'রে জোর গলায় বলল ঃ ও আমি জানি। আমাদের কিছু নেই বলে কিছু পেলেই দেইখে বেড়াই। আর তোমাদের ঝার অনেক সে তত ছেঁড়া প্যানা পরবে ঃ ব'লে জোর-জার করে ঝাঁট দিতে দিতে চৌকাঠহীন দরজা পেরিয়ে গেল। আমি অসুস্থ অধৈর্যেও শিক্ষা-দীক্ষাহীন মমতার প্রতি মমতায় স্থির রইলাম। ছেঁড়াবাবু! বাঃ!

৩

আমার খাওয়া-দাওয়া বিছানার উপরে খবরের কাগজের উপরে। মঞ্জরী বলল ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ ওরা যেটাকে ভূতে বাড়ি বলে, লেকের দিকে মোড় ঘোরবার আগে যে খালি জমিটা আছে তার আগের বাড়িটা। লেকের দিকে কোন্ রাস্তার মোড় কোন্ খালি জমি তার আগেকার বাড়ির

কোনো ছবিই চোখে পড়ল না, স্মৃতির কোনো যন্ত্রই করি না ধুলোয় ধূসর ড্যাম্প লেগে ঝাপসা কে খুঁজবে এই অন্তত চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে পাঁজা-করা আজে বাজে দামী অমূল্য টুকরো আস্ত—ওঃ কী না জড় হয়! চাই না, তবুও। মাত্র এই দশটা বছর আছি এই পাড়ায় এর মধ্যেই পাহাড়প্রমাণ। ওগুলো রবীন্দ্রনাথের মতন লাইব্রেরির মতন থরে থরে পুরনো পাঁজির মতন সাজানো থাকলে হত, কার্ড ইনডেক্স এবার আধাখেঁচড়া হয়েই গেল এই চারটে ডায়ারিতে। আমি ফেলতে চেয়েছি ভুলতে চেয়েছি ভোর রাত্রের দুঃসহ প্রহরে চাপা দিতে চেয়েছি ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলতে চেয়েছি ও কি কাগজ সাক্ষাৎ বিধাতার পার্চমেন্ট ক্রমাগত আরো এলো-মেলো লক্ষ্মীছাড়া ডাই থেকে নচ্ছার পাজিগুলো সবচাইতে জ্যান্ত দুরভিসন্ধিপূর্ণতায় স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে এসে ছোবল মেরে আনাচে কানাচে তার মধ্যে হাতড়াতে যাবার সাহস নেই। যেটুকু ছিল সেটুকু দিয়ে কোনোমতে সাহস দেখাচ্ছি কেবল তাতেই ফুরিয়ে যাচ্ছে, লজ্জানিবারণ তো পুরুষের কর্তব্য বটেই, এখন হঠাৎ কিছু মহত্ত্ব চাগিয়ে উঠলে দেখানোর জন্যে সাহস আর হাতে থাকবে না। তাছাড়া বেশি সততার বেগ এসেছে অতীতে দেখেছি জীবনটা বেমালুম কাঠ-ঘুঁটে-কয়লার গাদা সব আসছে চাকরি থেকে বা আড্ডায় নতুন কিন্তু অবিকল পুরনো মাল আরো পাচ্ছি বস্তা উপুড় ক'রে হুড়মুড় শব্দে ঢালছি প্রতিদিন খেপে খেপে খরচ হচ্ছে। ছিল আমার জীবন হয়ে যাচ্ছে চা টোস্ট ভাত ডাল সবাই মিলে খাচ্ছে খাচ্ছি অমোঘভাবে পরদিন ত্যাগ করে যাচ্ছি চক্রাকারে জীবন জ্বলছে মলে পরিণত হচ্ছে আমারই জীবন ইক্যোয়াল টু গোটা পরিবারের মল, খাসা কল! আবার বল! হরিহরি বল হরিহরি বল! গোরুর আবার মলটাও জ্বলে মলটাই। আমি হিন্দু বলে আগাপাস্তলা মলবৎ আলবত জ্বলব। কিন্তু আদত কথাটা এই যে সেই কয়লা-ঘুঁটে গাদার তলায় যে সনাতন প্যাকিং বাক্সের পচা তক্তাগুলো বা ইঁটের ঠোকাঠুঁকি অর্থাৎ আমার একান্ত সত্য স্বরূপ কয়লার গুঁড়োয় চাপা সামাজিকত্ব মনুষ্যত্ব ইত্যাদি শাশ্বত সত্য চিরন্তন তত্ত্বকে রাবিশ সরিয়ে দেখতে গোছাতে গেলেই বিছে বেরোবে নানা প্রকার। বড় অসুস্থ। ঘোলাটে চিন্তা। ঐ যে আগে যেখানে স্পষ্ট বলবার চেষ্টা করলাম যে কর্পূরি বলে সৎ মেয়েটা শহরে থেকেও গ্রামে থাকে কারণ ওদের বস্তিটা খুব গ্রাম্য আর ওরা খুব দেশে পালায় আর কলকাতায় জন্মিয়েও কলকাতায় ম'রেও দখ্নে ভাষার দাক্ষিণ্য জিভে জড়িয়ে থাকে—স্পষ্ট হল কি? হবে কেন? মাঝখানে মঞ্জরীর প্রবল বাঁধাধরা প্রতিক্রিয়া অনিবার্য আমার কথায় জুড়ে বসল। পাগল বা ঘুমের ঘোরে বা অ্যানিস্থেশিয়ার মধ্যে ভাবা যায় ভাবতে পারে ভাবে সব হুবহু যুক্তিযুক্ত করছে বলছে, কিন্তু বলছে কি? মঞ্জরীর জনসমর্থিত, তায় রু ব্লাডের দাপট। আমি? ডক্টর ইয়ুং প্রেসক্রাইবস ধামাচপা রিপিট অ্যান্ড নো একসাইমেন্ট। কী বলছিলাম? দুঃখী মানুষ। ছেঁড়াবাবুর বাড়ি ভূতে বাড়ি? ভূতে বাড়িটা মঞ্জরী ঠিকই বলেছে খুব সুন্দর সেকেলে চমৎকার মস্ত সুডৌল বাড়ি। জানলা কোনোটা বন্ধ কোনোটা কেন যে খোলা। কে যেন কী করে যেন লিখেছিলেন বুকের মতন ধড়াস করে জানলাটা প'ড়ে বুকটা ধড়াস করেছিল জানলার মতন। কী ক'রে লেখে অমন কথা? মানুষেরই হাত মানুষের আঙুলেই লেখে আবার কাঁসবও লেখে আমিও না লিখে পারছি না। ভূতে বাড়িটা কিন্তু ভূত তাড়িয়ে গেঞ্জিকল হয়েছে। যাঃ সেসব কোন্ কালের কথা তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের সব গুলিয়ে যাচ্ছে। এ ভূতে বাড়ি এখানকার এখনকার এখানে এখন। না বুঝতে পারলাম না। ঠিক আছে যেদিন ডকটর সেনগুপ্তর কাছে যাব সেদিন ওদিক দিয়ে ঘুরে যাব। বাইরে থেকে দেখা যায় জানলা খোলা থাকলে বেশ ভাল ফার্নিচার দেয়ালে বড় বড় ছবি। এ বাড়িটাও খুব সুন্দরী ছিল তাহলে বাঁধানো দাঁত নেই বলে তোবড়া গাল।

৪

রঞ্জন ভয়ানক বকতিয়ার ছিল এখন একটু কম কথা বলে মা বাপের সঙ্গে কম কথার মেজাজে। ভগবানের বাচ্চাগুলো ভগবানেরই বাচ্চা থাকবে তবে বাচ্চা আর থাকছে না ধাঁ ধাঁ করে বড় হচ্ছে, বলল ঃ ঐ তো। তোমার বন্ধু। আমাদের নিয়ে ক্লাব করেছিলেন। খালি হাতে সেলফ-ডিফেন্স শেখাতেন। আমরা বলতাম পাগলা স্যার? ওঃ হো কী যেন নাম কী যেন নাম নরেশ নরেন্দ্র নরনাথ আমরা বলতাম নাড়ু না না নরুবাবু। দেখি না অনেকদিন অবশ্য আমি তো এইখানে —চিত পটাং পৃথিবী হটাং—দেখছি আর কাকে? কেমন আছে রে? জানি না। আমার সঙ্গেও দেখা হয় না। কিন্তু কী আশ্চর্য নরুবাবু ঐ দিকে থাকেন নাকি? আমার ধারণা ছিল লেক মার্কেটের দিকে। তোরা ঠাট্টা করিস বটে তবে পাগল হলেও মজার পাগল রে। জানি না ঠিক তবে মনে হয় বাংলায় প্রথম খেলাধুলোর কাগজ ঐধরনের উনিই প্রথম। খোলা হাওয়ায় যা কিছু গা ঘামানোর খেলা ব্রতচারী রায়বেঁশে প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতিকে নষ্ট না করে বাস করা, এখন তোরা একোলজি জানিস এনভায়রনমেন্ট পলিউশান সব উনি বিশ পঁচিশ বছর আগেই শুরু করেছেন নাম দিয়েছিলেন মুক্ত জীবন। সে কি আজকের কথা। তখন আমি আসতাম একেবারে উত্তর থেকে। সুনীলবাবুর আড্ডা জমজমাট। বলতেন কইতেন সব অধ্যাপক লেখক সাংবাদিক শিল্পী বড় বড় পণ্ডিত এসে গিয়েছেন সেই আড্ডায় নরুবাবুই হতেন অপণ্ডিতদের চ্যাম্পিয়ান তর্কে না পারলে চেঁচাও তেমন বুঝলে আস্তিন গোটাও। চা বিস্কিট এসে পৌঁছলো ঠাণ্ডা। সেই নরুবাবু ছেঁড়া বাবু হয়ে গেল? কেন ছেঁড়াবাবু? কখন ছেঁড়াবাবু? হ্যাঁ ওদের সব পৈতৃক জমিজমা বাড়িটাড়ি ছিলই। আমাদের কজনকে জামার খুঁট ধরে খুব ষড়যন্ত্রী ফিস-ফিসাশ্বাসে বলেছিল ঃ মুক্ত জীবনের সম্পূর্ণ জীবনের ছোঁয়াচ মারাত্মক। পোষা বাঘের ছানাদের নিষিদ্ধ মাংসের স্বাদ একবার ছুঁইয়ে দিতে পারলে এখনকার এই ক্যান্সার সিটির ট্যাপসা চিপিটাকে ছাতু করে দেবে। কুংফু জানেন? কুংফু আর জুডো আর ক্যারাটের একটা সহজ বর্ণপরিচয় ধরিয়ে দেব ঐ হাজার হাজার লাখ লাখ জেদী তেজী ছেলেমেয়ে দেখবেন দুর্বার। দুর্বার। কিন্তু ভয়টা কোথায় জানেন? এই ডক্টর গুপ্ত যেদিন চোখটি বুজবেন, কোথাকার কোন্ দুর্বল স্বার্থপর লোক এসে মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসবে সেদিনই ওরা আমাকে খতম করতে লাগবে উঠেপড়ে। লাগবেই। আমি তো, ওদের পথের কাঁটা। ধরুন যদি পাঁচটা দশটা লোক সারা দেশে ভাবে। এই একই ভাবনা। সে ধাক্কা সামলাবে কোন্ মিয়াঁ? এ দেশের কোনো মিয়াঁরই সে কলজের জোর নেই। ঐ মিয়াঁ ওদের ডেকে আনবে। মীরজাফরের দপ্পল। ধাড়ি ধাড়ি কানছেঁড়া হুলো দেশের এপারে ওপারে পাঁচিলের ওপরে ওতটি পেতে বসে রয়েছে বোঝেন না? সেও কি আমাদের কিশোর পল্টন সহজে কাঁপাতে দেবে? আর এই আমি মক্কেল যদি তাদের বুদ্ধি জোগাতে রয়ে যাই। আমাকে বসিয়ে দেবার কি সরিয়ে দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেই দেশের বিদেশের হুমুদোরা। ও দেখে নেবেন ডক্টর গুপ্তর একটা ভাল মন্দ কিছু হওয়া মাত্র এস্পার ওস্পার হয়েও যেতে পারে।—আমারও মনে হয়েছিল ছিটম্থ। তবে খুব মজার খুব ভাল। তবে আর দেখাসাক্ষাৎ কৈ? কয়েক বছর আমিও উঠেপড়ে লাগলাম সংসারের আরো মল আরো দামী মল বানানোর জন্যে জীবনটাকে পুলকে খরচ করতে। খরচ মজাসে করলাম, আরে, আমার সংসারের এত মল! অবস্থা ফিরেছে মানে কারুর জীবন হু হু করে খরচ হচ্ছে, এত্তার মলে ঝলমলে। ফ্রিজ ইকোয়াল টু একমাসের জীবন, মঞ্জরীর শাড়ি মানে এক সপ্তাহের, এক সন্ধ্যের ওঁ শান্তি

ইকোয়াল টু একটা অমূল্য দিনব্যাপী জীবন। ব্যাস। সবই তো আমার সৃজনশীলতা। সৃষ্টি করে হেঁদিয়ে গেলে ক্যান্সার। বা আর কিছু। ব্যাস।

৫

ক্যান্সার ক্যান্সার খেলা চলল অনেকদিন হাসপাতালেও দুই দফায় দুই বছরে। ক্যান্সার আদপেই নয় নয় মধুর খেলাও নানারকম খেললাম কত দেখলাম গোল হল শুনলাম গোলহলি হলিগোল সকালে বিকেলে রাত্রে ভিজিটিং আওয়ার্সেও চেনাজানারা এলেন গেলেন ওখানেও তিনতলার বেডে ডক্টর সেনগুপ্তর সঙ্গে খেলছি কাটাকুটি ওদিকে দোতলায় টকাটক কয়েক দান ছক্কা ফেলে হোমে পৌঁছে গেলেন হিরণবাবু আমাকে একবারও না বলেই। কতজনে বেশ ম্বিরা-গমনের ছাঁদে বৌটির হাতে হাত ধরে ফেরত গেলেন। আমিও মিরাক্‌লের দুই অরিজিনল পায়ে চেপেই এলাম যদিও ওঁরাও ভাবেননি ঐ পা টলমল করেও চলবে আর। মিরাক্‌ল তো এই রকমই সাদাসিধে ব্যক্তিগত? কিন্তু তার ফল-আউটে ভেঙেচুরে ছিঁড়েখুঁড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব। মোটা বাঁধন নোঙর কিচ্ছু আর চেনা যায় না ভূমিকম্পের পরের দৃশ্যের মতন হাঁটি হাঁটি পা পা থেকে একদম শিশুসুলভ সিঁড়ি ভাঙলাম। সিঁড়িটাই কেন ভাঙে? ভোরে হাঁটলাম। দোকান থেকে বাজার থেকে স্বাবলম্বী ট্র্যামে বাসে উত্তরণ। অবতরণও। উনপঞ্চাশের ইসিজি যাবে কোথায়, আপাদ হৃদয় সামলাতেই দম ফুরোলে ছোঁড়াবাবুই বা কোথায়? অতর্কিতে বড় রাস্তায় আগে দেখিনি প্রকাণ্ড ডাকঘরের সামনে দেখি পরনে পাজামার মতো ঢোল্লা প্যান্ট আর যথার্থ যাকে বুশ কোট বলতাম যুদ্ধের আমলে। ভদ্রলোকের অনেক সেকেন্ড হ্যান্ড প্লাস্টিকের ঠোঙা বড় পেটপকেট দুটো ঠেসে। কেন? অবশ্য স্বাবর অস্থাবর সবই, কেন? সামান্য দাড়ি-গোঁফের উপরে ভাসছে এখনো দুটো অসামান্য চোখে কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালের তন্ময় কৌতুক পুরো এক রাশ পাকা কাঁচা সিরুরাস মেঘের তলায়। কুয়াশা কাটা মাত্র নির্ভুল হেসে নিঃশব্দে ধাঁধিয়ে দেবে। এখন উজ্জ্বলতা ভিতরে প্রতিফলিত হবার প্রশান্তি। সে উদ্ভাস চারিপাশের বাস্তবতাকে আমার অনুভবের জন্যে স্তব্ধ করে দিল। কিন্তু ম্যানার্স! জীবনে দ্বিতীয়বার শেখা ভব্যতায় দু-চারটে হুঁশিয়ার পা চলে এসেছি, মনেও করিনি পূর্বপরিচিত গলায় ডাকলেন ঃ তিমিরবাবু না? ছোঁড়াবাবু! নরুবাবু! এক নামগোত্রের গোটা নতুন মানুষ একরাশ হয় জানি কিন্তু অকাট্য দেখলাম এইই। অনেকদূর মরে গিয়ে ফের অনেক কচি পাতা না মেলতে পারলে বোধহয় অতটাই নতুন অমন সহজ বিশ্বাসে হতেই পারে না। নরুবাবু আমার সম্বন্ধে ওয়াকি-বহাল। আমিই জানতাম না যে আমার যেমন পা ওঁর তেমন চোখ। আমার পা ফেরত পেয়েছি, ওঁর প্রায় সওয়া এক দেড়টা চোখ পাননি বলে সন্দেহ সেই প্রাচীন ষড়যন্ত্র এখনো ওঁকে একটুও টলাতে পারেনি যদিও মনে হল ওঁর আদি ধ্যান সরাসরি কিশোর পল্টন থেকে রিটায়ার করে এসে বসেছে দ্রুত বিলীয়মান ঘাসজমি গাছপালায়। পুরোনো ষড়যন্ত্র পালটা প্রতিরোধ তেমনই তীব্র ওঠে নামে তাঁর গলায় যদিও এখন কুয়াশা-নামা চোখে স্মিত প্রশান্তিতে ক্ষদ্রতম টোলটিও পড়ে না। বললেন ঃ জীবন থেকে রিজাইন করে জীবনযাপন। বুঝলেন তিমিরবাবু এইবার আমার এস্পার ওস্পার খেলা। আগে অনেক ছিল অনেক উড়িয়েছি—সময় স্বাস্থ্য টাকা মায় নিজের ভবিষ্যৎ। কিন্তু এখন সে কিশোর পল্টনও নেই শরীরও নেই সময়ই বা আর কই। অথচ আমার সে তেত্রিশ বছরের ভোগান্তি কপালে আছে বলেছিল তাও কাটবার সময় হয়ে এল। এতদিন লড়ে। আধখানা মোটে চোখ বাঁচাতেই কী ফাইট সে আপনি ভাবতে পারবেন না। ফাইট করতেই

জন্মেছি কাজেই কোনো দুঃখ নেই। ওরা অতজনে চতুর্দিক থেকে আর মাঝখানে একা আমি ধেড়ে অভিমন্যু। তবে এ যাত্রা অত সহজে অভিমন্যুবধ হতে দিচ্ছি না। পল্টন থাকলে সবশুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়তাম। নেই কোই বাৎ নহি হ্যায়। আমি আছি। এখন একটা ঘাঁটি গেড়ে ঘাপটি মেরে থাকি। গতিক বুঝে তখন ছিমছাম গেরিলা ফাইট। ডেরা করে নিয়েছি একটা। বাপ-ঠাকুর্দার বাড়ি, ওরা বলল ভাগাভাগি করবে। তা করো। আমাকে কী দিবি? ওরা মহা ফাঁপরে পড়ল। ন্যায্য অংশ দিতে হয়। আমার কাছে যখন প্ল্যান আনল আমি বললাম বাদ দে ওসব, একতলার পেছন দিকে বারান্দার লাগোয়া ঘরটা দে, শোবো। যেখানে চাস আমার বইটই কাগজ-পত্তরের জায়গাটুকু দে, তারপর তোরা যে যা নিবি সব নে, নিয়ে ভাল থাক, আমাকে জ্বালাস না। আমি তোদের ঠাটবাটের মধ্যে নেই। ওরা তো মহা বেকুব। তখন বললাম তোরা চাস এই পেল্লায় বাড়িখানা? নিয়ে নে। এমন বাড়ি এ তল্লাটে কম আছে। বুড়োরা তোদের চাইতে বাড়ি বানাতো অনেক ভাল। তোরা তার বদলে পেছনের ঐ খালি জমিটা আমার জন্যে রাখ। তাতেও ওদের ক্যাঁও ক্যাঁও, ওটা নিয়ে তোমার কী লাভ হবে, ও তো একেবারে জঙ্গল বনে গিয়েছে, বিক্রি করতে অবশ্য পার কিন্তু নতুন বাড়ি করার চাইতে তুমি তো নিজেই বলছো এই পুরোনো বাড়িটা এখনো খুব ভালই রয়েছে। ওদের ঐ নিরেট মাথায় কী ঢোকাবো বলুন? কেবল বললাম যে মোটেই বেচবো না ; নতুন বাড়ি ওঠানোর পাগলামিও কিছু মাথায় চাপেনি। আমি জমিটাকে অমনিই ফেলে রেখে দেব। এক টুকরো পুরনো আকাশ থাকুক মাটির নাগালের মধ্যে।

৬

তখন আমি নতুন করে জীবনে, চিন্তায়, কথায় ফিরে আসছি। জুরো তীক্ষ্ণতা হারিয়ে যাচ্ছে, অনুভূতিগুলো ক্রমেই জলো হচ্ছে, মানে স্বাভাবিক হচ্ছি। তবু সেই মাস কয়েক কি এক দেড় বছরে নতুন ঝালানো বন্ধুত্বের পাঁচটা সাতটা আড্ডায় নরুবাবুর অজস্র প্রলাপের মধ্যে এক-একটা কথা ঠং করে লাগত, কনুইতে অসাবধানে ধাক্কা খাওয়ার মতন। এখন আমি প্রায় পুরো সুস্থ। পুরোদস্তুর ভূতে না পেলে সেসব লেখার বড় কষ্ট। একটা অসহায় মানুষ ঐসব যন্ত্রণা ঐসব বিশাল আনন্দের বোঝা বয়ে বেড়াবে কেন? সমাজসংস্কারকরা আছেন, কবি তো অসংখ্য। রেস্তও তাদের আছে। নরুবাবু নিঃসন্দেহে পাগল। নইলে কেউ হাটেবাজারে গাঁক গাঁক করে চেঁচায়? অনাসক্ত হাসিতে মুখ মুছে আবার চেঁচায়?—যে, আকাশ চিরকেলে হলেও আসলে মাত্র মানুষের সমবয়িসি। আকাশ চিরকাল যেমন ছিল, যেমন থাকবে তা হল মহাশূন্যযাত্রীরা তাকে যে চেহারায় দেখে। ঘোরতম অমাবস্যা। মেঘ নেই, রামধনু নেই, উদয়-অস্তের বালাই নেই, ঝড় বয় না, বৃষ্টি-ফুষ্টি কিচ্ছু নেই। চন্দ্র সূর্য আছে কিন্তু একেবারে ন্যাড়া আলোর ভাঁটা বই নয়। উল্কার আঁচড়ও নেই, আছে কেবল অলক্ষুনে ধূমকেতুর ইয়া ইয়া ল্যাজ। আকাশ আকাশের চেহারায় আছে কেবল পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে। একদিন বলতে গিয়েছিলাম যে বাড়ির ছাদ থেকেই নাহয় আকাশ দেখলাম। ওঁর অতল প্রসন্নতাতেও চিড় খেয়ে গেল। ঝাঁঝিয়ে বললেন ঃ দূর মশাই, শিশির মানে কি কেবল হিম? গাছের পাতা থেকে পড়বে, ঘাস ভিজিয়ে পা ধুইয়ে দেবে, তবে না? ছাদের আকাশ আপনাদের সোনার পাথরবাটি। মারাত্মক যুক্তি। আশপাশের লোক সচকিত তাকাচ্ছে দেখে মানে মানে নরুবাবুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। একদিন ঐরকম কোনো পরিস্থিতিতে একটু লম্বা পায়ে ওঁর জমিতে পৌঁছিয়ে হুঁশ হল যে ভদ্রলোকের চোখ গিয়েছে, এভাবে দৌড় করানোটা উচিত হয়নি। উনি হা হা করে হেসে বললেন ঃ লোকসান

বটেই তবে যতটা বলছেন ততটা নয়, ও আপনার ভদ্রতা। আমার বয়েস একান্ন। এর মধ্যে না হোক বিশটা বছর ঘুমিয়েছি? চোখ তখন বন্ধ? আরো বিশটা বছর গেল দাঁত মাজতে, দাড়ি কামাতে, চুল ছাঁটতে, চান করতে, খেতে। আড্ডা দিতে? হাতে রইল মাত্র বছর এগারো। এর মধ্যেও কত সময় আমরা রেডিও শুনি, চোখ বুঁজে গানের জলসায় বসে থাকি, আকাশ পাতাল ভাবি, কত কিছুই করি যাতে চোখের কোনো কাজ নেই। পাঁচটা বছরও কি সত্যিই যাকে দেখা বলে তেমন তেমন দেখেছি? আমি আধ্যাত্মিক লোক নই দাদা, আপনাদের মতন অত বইএর পোকাও নই, আমি ঐ দেখা বলতে বড় কবি বা আর্টিস্টের মতন দেখাটেখার কথা মোটেই বলছি না। এমনিই একটু চোখ মেলে মন দিয়ে দেখি, দেখে আনন্দ বা দুঃখ পাই বা কুন্দ হই কজন? কতক্ষণ? সারা জীবনে কতটুকু সময়? আমি বরং একটা সময় ছিল খুব দেখে নিয়েছি। এখন এই আধখানা চোখেই বাকি দিনগুলো কেটে যাবে। আসলে যেটাকে আমরা হামেশাই দেখা বলি সেটা ঠিক দেখা নয়, আগেকার দেখার ছাপটা মাত্র। কি অন্যের কাছ থেকে ধারকরা ছবি। বোকা লোক দাদা, রাগ করবেন না, একটা কথা বলি, বৌদিকে কি রোজ দেখেন? দেখেন না। আগে যা দেখে নিয়েছেন, আজকাল হঠাৎ হঠাৎ এক-একদিন যেটুকু দেখেন, সেইটাই মনের মধ্যে রয়ে যায়, একনজর তাকালেন কি তাকালেন না, ভাবলেন দেখলেন, তাই না? তাছাড়া আমার আর খুব স্পষ্ট করে সব কিছু দেখতেও ইচ্ছে করে না। কীভাবে সব দানব-দানব বাড়ি উঠছে, চলন্ত রাক্ষসগুলো পেট ঠেসে মানুষ খেয়ে হ্যাঃ হ্যাঃ করতে করতে রাস্তা দাপিয়ে ছুটছে। শত শত বছরের নির্বিরোধ গাছগুলোকে খুন ক'রে, পাঁচটনী দশটনী নোখে খামচিয়ে অসুরের মতন মাটি চিরে কী হচ্ছে? না কলকাতা শহরের বাড়বাড়ন্ত। আগে ভাবতাম এই ভুঁড়োপেট লোভী শহরটাই যত নষ্টের গোড়া। এখন আর তা ঠিক ভাবি না। শহর চিরকালই হয়তো ছিল, তার রকমফের ছিল। কিন্তু পাহাড় জঙ্গল মাঠ পোড়ো জমি গ্রাম—সবই যে যার জায়গায় থাকবে তো? ডাইনোসরদের যুগের মতন যদি শুধু ডাইনোসররাই হুড়োহুড়ি করে বেড়ায় আর ক্রমাগত বড় হয় ক্রমাগত বড় হয় তাহলে ঐ বড় হতে হতে হতে হতে হঠাৎ একদিন সারা পৃথিবী জুড়ে ডাইনোসরের বংশ নিপাত হবে। আমি বলে দিচ্ছি দাদা, এই কলকাতার জাতের ডাইনোসরের আয়ু ফুরিয়ে আসছে। বছরে একবার শহর বাঁচাও পদযাত্রা আর বৃক্ষরোপণ মহা উৎসব? যাত্রা কি মচ্ছব দিয়ে কিছু হবে না। জমি কিছু খালি রাখুন ফেলে রাখুন, পৃথিবীর চামড়াটা তেমন মোটা নয়, তাকে তার নিজের মনে গজাতে দিন থাকতে দিন, নেহাত ঘা-টা হলে সারিয়ে-সুরিয়ে ছেড়ে দিন। খোদার ওপর খোদকারি বেশি ভাল নয়, প্রকৃতির পরিশোধ বলে একটা কথা আছে জানেন তো?

৭

চলছিল। চলতেই পারত এই ধারায়। ছেঁড়াবাবু আরো ছেঁড়াখোঁড়া হচ্ছিলেন। চোখ দুটোর দিকে দৈবাৎ তাকালে আমার আচম্বিতে এক সমাহিত সমুদ্রদর্শন হত। দৃষ্টি যে কোন্ অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল! আর সেই অপার্থিব হাসির ইঙ্গিত। পরিবেশের একটুখানি এদিক ওদিক হলে হয় ওঁকে পীর বানিয়ে ধূপ জ্বালাত, নয় কিছুতে ভর করেছে বলে পুড়িয়ে মারত। কিন্তু সে মধ্যযুগীয় বর্বরতা আমরা কাটিয়ে এসেছি। এখন এখানে একান্ত বিজ্ঞানসম্মত গণতান্ত্রিক প্রগতির রাজত্ব। ওঁর একচিলতে বিয়ের-বয়েস-পেরোনো জমিটার দিকে কত সভ্য হাত নিশপিশ করল। গুণ্ডা গুণ্ডা বাড়ি থাবা থাবা মাসল ফুলিয়ে কনুইএর গোঁত্তা মারল। মারতে মারতে

দুপাশ থেকে চেপে ধরল যেমন রাস্তাঘাটে হরদম ধরে। উনি ক্রমেই সতেরো তলা আঠারো তলা কুয়োর সুদূর তলায় বায়োলজির স্পেসিমেনের মতন পড়ে রইলেন। একদিন ওঁর পক্ষে একটু বেশি রাত করে এসেছিলেন। বললেন ঃ কী করা যায় বলুন তো, পাশের ঐ ডাকাতমার্কা বাড়িগুলো থেকে যা-তা জঞ্জাল ওরা ফেলেই, সে ওদের অভ্যেস। কিন্তু আজ দুপুর থেকেই দেখছি ছোঁড়াগুলো বোতল টোতল ফেলে মজা পাচ্ছে। এখন একটা ভাঙা বেঞ্চি ফেলেছে। গাছগুলো যে একেবারে মরে যাবে? আমি আর বলব কী? বললাম ভিতরে আসুন, কিছু খান একটু, রাতটা এখানেই থেকে যান। শুনলেন না, উনি না থাকলে সব গাছ শেষ করে দেবে। তার পরদিন দেখলাম দূর থেকে, কতকগুলো বাঁশটাশ নিয়ে যাচ্ছেন, আমি তখন বাসে উঠে পড়েছি। বিকেলে খবর নিতে গিয়ে দেখতে পেলাম না। পরের দিনও না। তার পরের দিনও না। খোঁজই বা কোথায় নেব? ভাইরা পৈতৃক বাড়ির দরাজ মেজাজী বাইরের মহল আর সামনের জমিটুকু বিক্রি করে গোছানো-গাছানো ফ্ল্যাট কিনেছেন কোথাও, চাকরবাকর ছাড়াই দিব্যি ম্যানেজ করা যায়, আজকাল আর সেরকম লোকজন পাওয়া যাবে না। এখানে এখন ময়দানবের পর্ব। নরুবাবুদের তিন পুরুষের শিকড় তস্য শিকড় উপড়ে ফেলে মাটির নিচে তিন আর উপরে মেজোনাইন বাদ দিয়ে চোদ্দ তলার উপরে মায় সুইমিং পুল সমেত খাড়া একটা আস্ত পাড়া দাঁড়াচ্ছে, তার নাম দিচ্ছে ঃ শ্যামলী। নরুবাবুদের সাবেককালের অন্দরমহলে বেলফুলের চল বহুকালই খতম, এখন সেখানে অসূর্যম্পশ্যা হরেক বস্তার বাস—বালি, সিমেন্ট, স্টোন চিপ্‌স্। দিনক্ষণ দেখে তাঁদের ডুলি বোঝাই করে ঢালা হবে কংক্রিট মিকসারের মধ্যে, গজাজল এই শহরে বরাবরই সহজলভ্য। কিন্তু এই জয়যাত্রার হট্টগোলে অবান্তর মানুষটাকে খুঁজব কোথায়? অগত্যা খুঁজিনি। দু-দশ দিন পরে কোনো সময়ে আবার এই এক মহা অসুবিধাজনক স্মৃতিকে অন্যমনে চাপা দেবার চেষ্টায় আছি, একজন এসে বললেন কদিন আগে ও বাড়ির ভদ্রলোক কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গিয়েছেন। সেদিনই বিকেলে দেখা এক বৃদ্ধের সঙ্গে, বহুদিনের বাসিন্দা, বললেন ঃ না ভাই, নরু অসুস্থ কিংবা জখম হয়েছে, ওকে কোনো হাসপাতালেই নিয়ে গেল বোধহয়? হাসপাতাল শব্দটাতে আমার মনের তলায় নিঃশব্দ ভারি ঘন্টাটা বাজবেই, তার গুরুগুরু কাঁপন আমার ভাল লাগে না। সর্বশেষে এল দিলীপ ভোরা। ও-ও পাগল, ক্যামেরা নিয়ে। বলল খুব ভোরে লেকের ধার দিয়ে যাচ্ছে, দেখল এক ছেঁড়াছুটো মানুষ ব্যস্তভাবে কি লিখছে, একট চাদর পাট করে ডালে ঝুলিয়েছে। ফিরবার পথে দেখে মানুষটি মাটির উপরে সর্বস্বত্ব ইতিমধ্যে ত্যাগ করে মোটা ডাল থেকে ঝুলছে। এমন তো কতই হয়, নামহীন খবর খবরের কাগজে বেরোয়, কিন্তু এই লোকটি এই ছিল এই নেই, তার মুখে এসে পড়েছে সদ্যফোটা গোলাপী পাঁপড়ির স্বর্গীয় একটা টুকরো আর ব্যাকগ্রাউন্ডে শাই শাই করে এসে পড়েছে শীতের অতিথির দল যারা কলকাতায় নিরাপদ ছুটি কাটিয়ে ফিরে যায় মানস সরোবরে তাদের গেরস্তালির কাজে-কর্মে। দিলীপ সবকিছুই বড্ড ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে দেখে, সত্যি মিথ্যে বুঝি না সব সময়ে। কিন্তু ঐ যে আলোর আঙুলটা বলল জড়বৎ মুখটাকে আস্তে ফিরিয়ে আনল সূর্যের দিকে, ঐটাতেই মনে হল এ আমার ছেঁড়াবাবু। আজ ভোরে তাই আন্দাজে আন্দাজে গিয়েছিলাম লেকের ঐধারে। বলিষ্ঠ দুটো চারটে গাছ পেলাম, আশ্রয়হীনকে আশ্বাস দেবার মতন শান্ত ক্ষমতা তাদের ডালে আছে। কিন্তু সব নির্জন। কেবল শীতের পাখিদের বাদ দিলে। ওরা তো মানুষ না, পাগলও না। বিশাল উঁচু স্থাপত্যের কিনারা বেয়ে আবার সূর্য উঠছে। কেবল একটি শ্যামল শিশু মন দিয়ে কিছু করছে। নরম সমীহায় এগিয়ে গিয়ে দেখলাম মানস সরোবরের পালক পেয়েছে একটা। গম্ভীর পুলকে কী ভেরে বাড়িয়ে ধরল। অগুনতি খেলনা ঢেউএ ছিটকে

আলোর কণা খেলা করছে কোমল দৃঢ় বর্ণাঢ্য নির্মাণকৌশলের মসৃণ জটিলতার মধ্যে। পাখিদের আটপৌরে ব্যবহারের জিনিস, আবার কী নিখুঁত নিরাড়ম্বর সুন্দর। মনে হল যে না, কালও জন্দ হতে পারে, পলকের কাছে। পুলকের কাছে। যা নিয়ে দেবব্রত বিশ্বাস গেয়ে গেলেন। আর এক-একটা জটিল চিক্কণ বিশ্বকর্মার তন্ময় সৃষ্টি পালকের কাছে। ছেঁড়াবাবু সারা আকাশ ভ'রে তাকালেন।

তপস্যা ও বরদান

অশোক রুদ্র

বরকে বলা যেতে পারে শাপের উলটো পিঠ। শাপ দিয়ে করা হত কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি। আর বর দিয়ে করা হত কাউকে লাভবান। শাপ এবং বর, দুই ক্ষেত্রেই প্রায়শই ব্যবহার হত অলৌকিক ক্ষমতার। শাপ দিয়ে যে ক্ষতি করা হত, তা যেমন অনেক সময় হত এত বড় ধরনের যা অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবহার ছাড়া করা সম্ভব হত না, তেমনি বরদানের দ্বারা যে-পরিমাণ লাভ আর-একজনের করে দেওয়া সম্ভব হত, তা প্রায়শই লৌকিক উপায়ে করা সম্ভব হত না। শাপ দেওয়ার ঘটনার মধ্যে শাপদাতার যে অবিবেচনা, হঠকারিতা আর নীতিহীনতা প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রকাশ পেত, বরদানের ক্ষেত্রেও নীতির দিক থেকে কোন উন্নততর মান লক্ষ করা যেত না। শাপদাতারা যেমন ছিলেন এক ধরনের অতিমানব—যাঁরা কারও কাছে কোন নৈতিক জবাবদিহির তোয়াক্কা রাখতেন না—বরদাতারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তা-ই। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জমিদাররা মাতাল অবস্থায় যেমন মুহূর্তের উত্তেজনায় কারও সর্বনাশ করতেন, আবার কাউকে রাজাবাদশা বানিয়ে দিতেন, বরদান এবং শাপদানের ব্যাপারে ঐ অতিমানবদের ব্যবহার ছিল একই রকমে আতিশয্যদোষে দুষ্ট।

বর কারা দিতে পারতেন? দেবতারা তো বটেনই। বলাই বাহুল্য, অন্য-সব ক্ষমতার মতো বরদানের ক্ষমতাও সব দেবতার সমান পরিমাণে থাকত না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আর বিভিন্ন-নামধারিণী শক্তিরূপিণী দেবীর যে ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতা নিশ্চয় অন্যান্য কম-ওজনের দেব-দেবীদের ছিল না। এই প্রভেদটা অবশ্য দেবদেবীদের মানুষ এবং অন্যান্য নিম্নতর যোনির জীবদের বরদানের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেত না। এইসব ক্ষেত্রে বিষ্ণুই হোন আর ইন্দ্রই হোন, দুর্গাই হোন আর লক্ষ্মীই হোন—সকলেই ছিলেন সমপরিমাণে মুক্তহস্ত, দিলদরিয়া। কিন্তু নিম্নবর্গের কোন দেবতা উচ্চবর্গের কোন দেবতাকে কখনও বর দিয়েছেন বলে নজির পাওয়া যায় না। কিন্তু যেসব দেবতাদের নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসকদের মধ্যে রেশারেশি ছিল—যেমন শিব, বিষ্ণু ও দেবী—তাঁদের মধ্যে কখনও একজন আরেক জনের কাছ থেকে বর প্রার্থনা করছেন, আবার অন্যত্র কোথাও তাঁকেই বরদান করছেন—এমনটা দেখা যায় স্বাভাবিকভাবেই। দেবীপুরাণে ব্রহ্মা আর বিষ্ণু বর গ্রহণ করেন মহাকালীর কাছ থেকে[১]। শিবপুরাণে ঐ দুইজনই বর গ্রহণ করেন শিবের কাছ থেকে[২], যদিও মহাভারতের শান্তিপর্বে শিবকে ব্রহ্মার পুত্র বলে বর্ণনা করা হয় এবং বিষ্ণুর তুলনায় ব্রহ্মা আর শিবের লঘিমাকে ব্রহ্মার মুখ দিয়ে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 'আমি প্রজাগণের আদি ঈশ্বর ব্রহ্মা সেই পরমপুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি এবং আমা হইতেই তাহার তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। আমা হইতেই এই চরাচর জগৎ ও রহস্যসহ সম্পূর্ণ বেদ উদ্ভূত হইয়াছে। বাসুদেবাদি চার ব্যূহে বিভক্ত সেই পুরুষই যেরূপে ইচ্ছা হয়, সেইরূপে ক্রীড়া করেন।'[৩]

দেবতারা ছাড়া আর যাঁরা বর দিতে পারতেন তাঁরা হলেন বাঘাবাঘা মুনিঋষি। কিন্তু দেবতাও নয়, মুনিঋষিও নয়, এমন সাধারণ ব্যক্তিরাও যেমন কখনও কখনও শাপ দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন, তেমনি তাঁদের কখনও কখনও বরও দিতে দেখা যায়। এইরকম অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য বরদানের মধ্যে কোন অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায় না। সেইসব ক্ষেত্রে বরদানটা পুরস্কার-

প্রদান বা উপহার দেওয়ার নামান্তর মাত্র। এই ধরনের পুরস্কারের উদাহরণ দশরথ কৈকেয়ীকে যে দুটি বর দিয়েছিলেন সেইটি।

কিন্তু অলৌকিক শাপ এবং বরও সাধারণ ব্যক্তিরা কখনও কখনও দিতেন। এইরকম বরের একটি উদাহরণ ভীষ্মকে দেওয়া শান্তনুর বর। আরেকটি উদাহরণ—যযাতির পুত্রদের দেওয়া বর। যযাতি তাঁর পুত্র পুরুকে যে বর দান করেন তা নিতান্তই লৌকিক, অন্য পুত্রদের বঞ্চিত করে তিনি তাঁর রাজত্ব পুরুকে দেন, তাঁর জরা গ্রহণ করে যৌবন প্রদান করার পুরস্কার হিসাবে। কিন্তু যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু আর অনু—এই পুত্রচতুষ্টয়কে যে শাপ তিনি প্রদান করেন তার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ ছিল, যদিও সেই ক্ষমতার উৎস কী, সেই বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। কারণ, সেই সময়ে যযাতি ছিলেন নিতান্তই ভোগে অতৃপ্ত ভোগী ব্যক্তিবিশেষ[৭]। একই কথা প্রযোজ্য শান্তনু সম্পর্কে। আস্তিককে জনমেজয় যে বরদান করেন, সেটাও ছিল নিতান্তই লৌকিক ; আস্তিকের সত্যবক্তায় তুষ্ট হয়ে জনমেজয় তাঁর সর্পযজ্ঞ বন্ধ করে দেন।[৮] কশ্যপ যে তাঁর দুই পত্নী বিনতা আর কদ্রুকে বর দান করেন, তার মধ্যে অলৌকিকতার স্পর্শটুকুই আছে মাত্র। তিনি পত্নীদের তাঁদের ইচ্ছানুরূপ সন্তান পাওয়ার বাঞ্ছা পূরণ করেন। কশ্যপ অবশ্য ছিলেন খুব বড়দরের ঋষি। কিন্তু তিনি ছিলেন ঐ দুই রমণীর পতি। তাঁদের গর্ভে তাঁর পক্ষে ইচ্ছানুযায়ী সন্তান উৎপাদন করা তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে খুব একটা কিছু অলৌকিক ব্যাপার ছিল না।[৯] কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বরদান করতে পারতেন তাঁরাই যাঁরা ছিলেন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী।

বরদানের ক্ষমতার বিষয়ে যেমন অধিকারভেদ ছিল, বরলাভের ব্যাপারেও তা ছিল। অবশ্য ব্যতিক্রম হিসাবে কেউ কেউ বিশেষ কোন চেষ্টা বা যোগ্যতা ব্যতিরেকেই বরলাভ করেছেন। উদাহরণ হিসাবে নল-দময়ন্তীর বিবাহ-সংক্রান্ত এই বিবরণটি নেওয়া যাক ঃ 'দময়ন্তী নিষধরাজ নলকে বরণ করিলে, মহাতেজস্বী দিক্‌পালগণ সকলে হৃষ্টচিত্তে নলকে আটটি বর দান করিলেন। শচীপতি ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া নলকে বর দিলেন যে, "আপনি যজ্ঞের সময়ে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবেন এবং অন্তিমে শুভকর উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভ করিবেন।" হুতাশন অগ্নি নলকে এই দুইটি বর দিলেন যে, নল যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেইখানেই অগ্নির আবির্ভাব হইবে ; আর তিনি অন্তিমকালে অগ্নিপ্রভায় স্বর্গলোক লাভ করিবেন। যম নলকে এই দুইটি বর দান করিলেন যে, নল যাহা পাক করিলেন, সেই বস্তুই সুস্বাদু হইবে এবং তিনি চিরকাল ধর্মপথে থাকিবেন। আর জলপতি বরুণ এই বর দিলেন যে, নল যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেইখানেই জলের আবির্ভাব হইবে। তারপর দেবতারা সকলেই এই বর দিলেন যে, আপনাদের একটি কন্যা ও একটি পুত্র হইবে। তাঁহারা পুনরায় নল ও দময়ন্তীকে উত্তমসৌরভযুক্ত এক-এক ছড়া মালা উপহার দিলেন।'[১০] এই বরদান বিবাহের উপলক্ষে যৌতুকপ্রদানের থেকে ভিন্ন আর কিছু নয়। এর আগে যে কয়টি বরদানের উদাহরণ দিয়েছি তাদের প্রত্যেকটিই একই রকম ভাবে বরদাতার স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রকাশ করে।

কিন্তু আরেক ধরনের বর আছে যা কিনা প্রায় বরদাতার কাছ থেকে জোর করে আদায় করে নেওয়া। জোর বলতে জবরদস্তি বোঝাচ্ছি না। বোঝাচ্ছি এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হওয়া, যে অবস্থায় বরদাতা বর না দিয়েই পারেন না। এ অবস্থাটার সৃষ্টি কিভাবে হত তার মধ্যে খুব বৈচিত্র্য বা অস্পষ্টতা নেই—করা হত তপস্যার মারফত, কৃচ্ছ্রের দ্বারা।

দুই

বরের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এখন এমন একটি প্রসঙ্গে উপনীত হলাম যা প্রাচীন ভারতীয় ধ্যানধারণার মধ্যে এক কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে। বরদানের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকেও কৃচ্ছ্র এবং তপস্যার ধারণার অন্য কয়েকটি দিকের আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তা করার আগে বরদানের সঙ্গে তপস্যার সম্পর্কটাকে আলোচনা করে নিতে হয়।

তপস্যা ছিল বর আদায় করার একটা যান্ত্রিক উপায়। পুরাণপ্রসিদ্ধ অধিকাংশ বরপ্রাপ্তির উপাখ্যানই উগ্র তপস্যার উপাখ্যান। অংশুমান কপিলমুনির কাছ থেকে বর পেয়েছিলেন বিনা তপস্যায়। কিন্তু গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করার জন্য ভগীরথকে প্রথমে তপস্যা করতে হয় গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। তারপর তপস্যা করতে হয় মহাদেবকে তাঁর জটায় গঙ্গাকে ধারণ করতে রাজী করানোর জন্য। সগররাজা যে এক পত্নীতে অংশুমান ও অপর পত্নীতে ষাট সহস্র পুত্রের উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাও মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে।

কৃচ্ছ্র বা আত্মনিগ্রহ যত বেশি পরিমাণে করা হবে, ফলপ্রাপ্তিও ঘটবে তত বেশি পরিমাণে। এই নিয়মটা ছিল প্রায় অমোঘ। ফলে, তপস্যার অঙ্গ হিসাবে আত্মনিগ্রহের মাত্রা এবং তার বৈচিত্র্যের মধ্যে যে কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যিই আশ্চর্য। তার কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। বালখিল্য ঋষিগণ তপস্যা করতেন 'শাখায় অধোমুখে লম্বমান' ও 'সূর্য-রশ্মিমাত্র পানকারী' অবস্থায় থেকে[১]। যযাতি 'বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া শুধুমাত্র জলপান করিয়া ত্রিশ বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তারপর তিনি বায়ু ভক্ষণ করিয়া এক বৎসর এবং পঞ্চাগ্নির মধ্যে অবস্থান করত এক বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। অনন্তর এক পায়ে দাঁড়াইয়া বায়ু ভক্ষণে ছয়মাস তপস্যা করিয়াছিলেন।'[২] 'তারকাসুর প্রদীপ্ত সূর্যমণ্ডলের উপর দৃষ্টি অর্পিত করিয়া ঊর্ধ্ববাহু ও একপদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিয়াছিল এবং কেবল পাদাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর করিয়া একশত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিল। সে একশত বৎসর কেবল জলপান করিয়া ও একশত বৎসর কেবল বায়ুপান করিয়া তপস্যা করিয়াছিল। সেই অসুর একশত বৎসর জলে দণ্ডায়মান হইয়া, একশত বৎসর স্থণ্ডিলে অবস্থান করিয়া, একশত বৎসর অগ্নিমধ্যে স্থিতি-পূর্বক, শতবৎসর অধোমুখ হইয়া এবং একশত বৎসর হাতের তলার দ্বারা মাটি স্পর্শ করিয়া তপস্যা করিয়াছিল। তাহার পর সে একশত বৎসর বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিয়া তপস্যা করে। পরে অধোমুখ হইয়া তপস্যা করত একশত বৎসর অতীত করে'[৩]। বিদ্যুৎমালী ও তারক নামক দুই দানব 'হেমন্তে জলশয্যায় থাকিয়া—গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হইয়া—বর্ষায় আকাশতলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের প্রিয় কলেবর ক্ষয় করিতে লাগিল। ফল, মূল, জল, পুষ্প এইসকল মাত্র তাহাদের ব্যবহার্য হইল।...তাহাদের কলেবর নির্মাংস কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত হইল।'[৪]। 'জরা-শব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু-শব্দের অর্থ দারুণ। 'সেই মহর্ষির শরীর সাতিশয় দারুণ ছিল, তিনি কঠোর তপস্যার দ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই দারুণ শরীরকে ক্ষীণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম জারৎকারু হইল'[৫]। 'মহামুনি মাণ্ডকর্ণি পঞ্চাসর সরোবর নির্মাণ করিয়া...জলাশয়ে থাকিয়া বায়ু ভক্ষণ করত দশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করেন'[৬]। 'অর্জুন কুশময় কৌপীন পরিধান করিয়া দণ্ড ও মৃগচর্ম ধারণপূর্বক প্রথমে ভূতলে পতিত শুষ্ক পত্রমাত্র ভোজন করিতেন। পরে তিন তিন দিনের পর এক-একটি ফল ভক্ষণ করিয়া একমাস অতিক্রম করিলেন ; তাহার পরে আবার ছয়-ছয় দিনের পর এক-একটি ফল ভোজন করিয়া দ্বিতীয় মাস অতিবাহিত করিলেন। তৃতীয় মাসে পনর-পনর দিনের পর এক-একটি ফল ভোজন করিলেন। তাহার পর যখন চতুর্থ মাস উপস্থিত

হইল, তখন ভরতশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জুন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া রহিলেন। ঐ সময়ে অর্জুন কোন সাহায্য না লইয়াই কেবল চরণাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ভূতলে দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্ববাহু হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।[১৪]

অগ্নির মধ্যে বা জলের মধ্যে, বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে, দীর্ঘকাল এক পায়ে বা এক অঙ্গুষ্ঠের উপর দাঁড়িয়ে থাকার দ্বারাও যখন অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, তখন জোর করে বর আদায় করার জন্য কী ধরনের উপায় অবলম্বন করা হত তার উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যায় সুন্দ-উপসুন্দের কীর্তিকে। 'তাহারা মলিন শরীরে বায়ু ভক্ষণ করিয়া নিজ মাংস অগ্নিতে আহুতি দিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া এবং ঊর্ধ্ববাহু হইয়া একদৃষ্টিতে দীর্ঘকাল তপস্যা করিল'[১৫]। তপস্যাকে জোরদার করার জন্য নিজ শরীরের উক্ত প্রকারের ব্যবহারের আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, 'ভগবান্ ব্রহ্মা একসময় শতমুখ নামে এক অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই অসুর এক বর্ষের অধিক কাল পর্যন্ত অগ্নিতে নিজেরই মাংস আহুতি দিয়াছিল'[১৬]। বৃকাসুরও নিজের শরীরের মাংস আহুতি দিয়ে শিবের তপস্যা করেন। তাতেও ফল না পেয়ে তিনি শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত হন। তখন আর শিব আবির্ভূত না হইয়া পারেন না, বর না দিয়েই পারেন না[১৭]। এই-জাতীয় আত্মনিগ্রহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় শ্রুতাবতী উপাখ্যানে। 'বরদ-প্রাচন-নামক শ্রেষ্ঠ তীর্থে এই ভামিনী বহু নিয়ম ধারণ করত সেখানে অত্যন্ত উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি নিজের সেই তপস্যার এই উদ্দেশ্য নিশ্চিত করিয়াছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র আমার পতি হউন!...তাঁহার এই আচরণ, তপস্যা ও পরাভক্তিতে ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। এই শক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করত তাঁহার আশ্রমে আসিলেন' এবং তাঁকে পাঁচটি বদর ফল পাক করতে দিলেন। 'তারপর সেই মহাব্রতা কুমারী শ্রুতাবতী অতিশয় তৎপরতার সহিত সেই ফলসকল পাক করিতে লাগিলেন। এই ফল-সকল পাক করিতে করিতে তাঁহার বহু সময় অতিব্যাহিত হইল, কিন্তু উহাদের পাক করিতে পারিলেন না। ইহার মধ্যেই সেইদিন সমাপ্ত হইয়া যাইল। তিনি যে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, তৎসমস্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইল। তখন অগ্নিকে কাষ্ঠহীন হইতে দেখিয়া তিনি নিজের দেহকেই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে মনোহরা সেই কন্যা প্রথমে নিজের দুই পদ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই পদ দুইটি যখন দগ্ধ হইয়া যাইল, তখন তিনি পরপর নিজেকেই আরও অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। তিনি নিজের দেহকে জ্বালাইয়া এরূপ প্রসন্ন হইলে যে, যেন তিনি জলের মধ্যে রহিয়াছেন'[১৮]।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পূর্বে তাঁর পিতা দিলীপও একই চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন। 'তিনি পিতৃগণের নিধনের কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাদের সদ্গতির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং গঙ্গাদেবীর অবতরণের জন্য সুমহৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও গঙ্গার অবতরণ হইল না'[১৯]। তপস্যা করে বিফল হওয়ার এই ঘটনা নিতান্তই ব্যতিক্রম। তপস্যাকে ব্যর্থ করানোর জন্য অপ্সরাদের পাঠিয়ে মুনি-ঋষিদের তপস্যা ভঙ্গ করানো—সে অন্য কথা। তপস্যা ভঙ্গ করানোর জন্য যে এ-জাতীয় উপায় অবলম্বন করতে হত, তাতেই প্রমাণ, তপস্যা সম্পূর্ণ করতে পারলে তা হত ফলপ্রদানে অব্যর্থ। যে দেবতার উদ্দেশে তপস্যা করা হচ্ছে, তিনি অবশ্য এসে বলতেন যে তিনি প্রীত হয়ে নিজেই বর দিতে চান। কিন্তু বস্তুত বর না দেওয়ার কোন উপায়ই তাঁর থাকত না। আগেই বলা হয়েছে, তপস্যাটা ছিল যেন এক যন্ত্রবিশেষ। প্রাচীন মনের প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে যে ধরনের ধারণা ছিল, সেই নিয়মের রাজত্বে তপস্যার ফল ফলত প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করে নয়, নিয়ম অনুসরণ

করেই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর অনবদ্য প্রবন্ধ "নিয়মের রাজত্বে" দেখিয়েছিলেন যে হাত থেকে ফেলে-দেওয়া প্রস্তরখণ্ড যদি ভূতলে পতিত হয় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করে, তো গ্যাসভরা বেলুন যে আকাশের দিকে উড়ে যায়, তা প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করে নয়—সেই নিয়ম অনুসরণ করেই। এও সেই রকমই। এই ধরনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আধুনিক যুগের মানুষের যে ধরনের আস্থা আছে, ঠিক সেই ধরনেরই আস্থা ছিল প্রাচীন কালের ভারতবাসীর তপস্যার যান্ত্রিক ক্ষমতায়। নিম্নলিখিত উক্তিটিতে এই বিশ্বাসটিকে বেশ খোলসা করে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ 'মনুষ্য যাহা কিছু অসৎকার্যের অনুষ্ঠান করে, তপস্যার দ্বারা তৎসমুদয়ই নিরাকৃত হইয়া থাকে। যে কোন অভিসন্ধিতে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পূর্ণ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। এই জীবলোকে যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য ও দুরতিক্রমণীয় আছে, শাস্ত্রজ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে তৎসমুদয়ই উপলব্ধ ও অতিক্রমণীয় হয়, সন্দেহ নাই। তপস্যার বল অতি আশ্চর্য। মদ্যপায়ী, চৌর্যনিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরাও তপঃপ্রভাবে পাপবিমুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে'[২০]। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকাশ পায় যে নীতিহীনতা, তার আলোচনা পরে করব। আপাতত আমাদের লক্ষ্য তপস্যার প্রাকৃতিক নিয়মের তুল্য অমোঘতা।

শুধু যে ফলপ্রদানেই তপস্যা প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অব্যর্থ হত তাই নয়, তপস্যার দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতি কিভাবে যে প্রভাবিত হত তারও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তারকাসুর তপস্যা করতে গিয়ে কী ধরনের কৃচ্ছ্র পালন করেছিল তা আগে বলা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, 'তপস্যা অনুষ্ঠান করিতে করিতে তাহার মস্তক হইতে মহৎ তেজ নিঃসৃত হইয়াছিল। ঐ তেজোদ্বারা দেবগণ দগ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন'[২১]। বিদ্যুন্মালী ও তারকের তপস্যার বর্ণনাকালে লেখা হয়েছে, 'তাহাদের সেই দারুণ তপঃপ্রভাবে এ জগৎ নিষ্প্রভ ও চঞ্চল হইয়া মন্দশ্রী ধারণ করিল। সেই তিন তপোনিমগ্ন দানবাগ্নিকর্তৃক এই ত্রিলোক দগ্ধ হইতে থাকিল'[২২]। সুন্দ ও উপসুন্দের তপস্যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'বিন্ধ্যাচল তাহাদের অত্যুগ্র তপঃপ্রভাবে তাপিত হইয়া ধূম মোচন করিতে লাগিল'[২৩]।

বরদানের প্রসঙ্গে তপস্যার দ্বারা সৃষ্ট তেজ বা শক্তির দুই প্রকারের প্রকাশ দেখা যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাপিত করে উদ্দিষ্ট দেবতাকে বিচলিত করে তাঁকে দিয়ে বরদান করানোতে এক ধরনের শক্তির প্রকাশ। আর বরদান করানোর জন্য যে অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োজন, তারও উৎস ছিল বরদাতার তপস্যা। কোন ব্যক্তির কোন কাম্য উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য তপস্যা করা এক জিনিস। কিন্তু সর্বশক্তিমান দেবতারা অথবা সর্বোচ্চ স্তরের মুনিঋষিরা, যাঁদের কামনা করার কিছুই নেই বরং যাঁরা অন্যদের বরদান করার ক্ষমতা রাখেন, তাঁদেরও অনেক সময়ই ঘোর-তপস্যায় রত অবস্থায় দেখা যায়। মহাদেবও ঘোর তপস্যায় রত হতেন। বিষ্ণুও হতেন। ব্রহ্মা—যাঁর স্থান হরিহরের চেয়ে বেশ খানিকটা নীচে ছিল—তিনি তো হতেনই। এঁরাই তো দেবাদিদেব। এঁরাই তো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। এঁরা কী উদ্দেশ্যে তপস্যা করতেন? "মুনিশ্রেষ্ঠ" বিশ্বামিত্রের চরিত্রে লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতি শাস্ত্রনিন্দিত সব দোষই খুব বেশি মাত্রায় ছিল। তিনি যে ইন্দ্রত্বলাভের লোভে ঘোর তপস্যায় রত হবেন, তা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। আর মেনকাকে নগ্নাবস্থায় দেখামাত্রই যে তাঁর তপস্যা ভগ্ন হবে, তাও তাঁর চরিত্রের সঙ্গে ভাল ভাবেই সংগতিপূর্ণ। কিন্তু অন্যান্য অনেক মুনিঋষিকেই ইন্দ্রত্বলাভ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই তপস্যা করতে দেখা যায়। আপাত দৃষ্টিতে এই যে রহস্য, তার সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় পত্নী লোপামুদ্রার কোন অনুরোধে বিব্রত অগস্ত্যের নিম্নলিখিত উক্তিতে ঃ 'উহাতে আমার সঞ্চিত তপস্যার অনেক অংশ ব্যয় করিতে হইবে ; যাহাতে আমার কষ্টোপার্জিত তপস্যা ব্যয় না করিতে

হয়, এইরূপ উপায় বলিয়া উৎসাহিত কর'[২৬]। তপস্যার দ্বারা এমন শক্তির সৃষ্টি করা সম্ভব হত যাকে সঞ্চয় করে রাখা যেত! এবং যার থেকে আবার প্রয়োজনমত কোন অংশকে ব্যয় করাও যেত! ঠিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মতো। তপস্যা-অর্জিত ফলকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মতো ব্যবহার করার অন্য উদাহরণ পাওয়া যায়। কুনিগর্গনামক মহর্ষির পরম রূপবতী কন্যা পরিণয়ে অসম্মতি প্রকাশ করে কঠোর তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি পরলোকগমনে মনস্থির করলে নারদ তাঁহাকে বলেন, 'তোমার তো এখনও বিবাহসংস্কার হয় নাই, তুমি এখনও কন্যা ; সুতরাং তুমি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে কিরূপে ?...তুমি অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছ ; কিন্তু পুণ্য-লোকের উপর অধিকার তোমার হয় নাই!...নারদের এই কথা শ্রবণ করত তিনি ঋষিগণের সভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে সাধুস্তম! আপনাদের মধ্যে যে কেহ আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাকে আমার তপস্যার অর্ধভাগ প্রদান করিব'। গালবকুমার মহর্ষি শৃঙ্গয়ান 'বিবাহের পর তোমাকে আমার সহিত একরাত্রি বাস করিতে হইবে'—এই শর্তে বৃদ্ধ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। 'রাত্রিতে তিনি দিব্যবস্ত্রাভরণে বিভূষিতা ও দিব্যগন্ধযুক্ত অঙ্গরাগে অলঙ্কৃতা পরমাসুন্দরী তরুণী হইয়া যাইলেন', এবং দুইজনে একরাত্রি বাস করার পর 'সাধ্বী তপস্বিনী দেহত্যাগ করত স্বর্গ-লোকে গমন করিলেন'[২৭]। শৃঙ্গবানও তাঁর তপস্যার অর্ধাংশ প্রতিগ্রহণ করে তাঁর পত্নীর অনুগমন করলেন। এই যে দেওয়া-নেওয়ার কারবারটা ঘটল, তা যদি তপস্যার ফলের না হয়ে সঞ্চিত অর্থের অর্ধভাগের বিনিময়ে ঘটত তো তা নিশ্চয় খুব অন্যরকম শোনাত না।

বস্তুত, বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে শক্তি কাজ করছে তাও তপস্যা-অর্জিত শক্তিই। শুধু যে 'আদিত্য, বসু, রুদ্র, অগ্নি, বিশ্বদেব, সাধ্য, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও অশ্বিনী-কুমার প্রভৃতি স্বর্গবাসী দেবগণ একমাত্র তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছেন' তাই নয়, 'ভগবান প্রজাপতি বিবিধ ব্রত অবলম্বন পূর্বক তপোনুষ্ঠান করিয়াই প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন'[২৮]। প্রজাসৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিই যখন ব্রহ্মার মতো পরম দেবতা তপস্যার দ্বারা অর্জন করেছিলেন, তখন ইতরস্তরের মানুষ আর দেবতারা যে তপস্যার ফল হিসেবে অনেক নিম্নস্তরের ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন যা প্রায় জাদুবিদ্যার প্রকারান্তর মাত্র, তা সহজবোধ্য। মহাত্মা বেদব্যাস যে 'তপঃপ্রভাবে' কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত কুরুপাণ্ডবদের একবার তাঁদের জীবিত আত্মীয়দের দৃষ্টিগোচর করিয়েছিলেন তা নিশ্চয় হিপ্‌নোটিজম্‌ জাতীয় বিদ্যার কেরামতি।

তিন

তপস্যা এবং বরের ধারণার সঙ্গে কোন প্রকার নৈতিকতার সম্পর্ক হয় একেবারেই অনুপস্থিত, নয়তো সে সম্পর্কে বৈপরীত্যের। অর্থাৎ তপস্যা করার মধ্যে, বর কামনা করার মধ্যে এবং বর প্রদান করার মধ্যে হয় কোন হিতাহিতচিন্তা একেবারেই নেই, নয়তো তার পিছনে যে মানসিকতাকে পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে লোভ, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি, যেসব বৃত্তিকে আমাদের শাস্ত্রে বর্জনীয় বলে প্রচার করা হয়েছে। বিশ্বামিত্র যখন ইন্দ্রত্বলাভের জন্য তপস্যা করেন তখনও তাঁর কৃচ্ছ্রের পিছনে রয়েছে নিছকই লোভ। সেই একই নিছক লোভ কাজ করে যখন তিনি তপস্যা করেন ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য। বশিষ্ঠের তপস্যাজনিত তেজের প্রমাণ পেয়ে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের জন্য এইভাবে উঠেপড়ে লেগে পড়েন ঃ 'মহারাজ বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজঃসম্ভূত এই সুমহৎ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষত্রিয়ভাবের প্রতি নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শন-পূর্বক কহিতে লাগিলেন, 'ক্ষত্রিয়বলে ধিক, ব্রহ্মতেজই যথার্থ বল। বলাবল নির্ণয়স্থলে তপো-

বলকেই পরমবল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়।" এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্য, অসামান্য রাজলক্ষ্মী ও কমনীয় বস্তুর ভোগাভিলাষ এককালে পরিত্যাগপূর্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন'[২৯]।

ব্রাহ্মণেরা তাঁদের ব্রাহ্মণত্বকে স্বাভাবিকভাবেই আর সকলের নাগালের বাইরে রাখতে বদ্ধ-পরিকর ছিলেন। সুতরাং ঘোরতর তপস্যা করে ইন্দ্রত্বলাভ যদি বা সম্ভব ছিল, ব্রাহ্মণত্বলাভ ঐ বিশ্বামিত্রের ব্যতিক্রমটা বাদ দিলে প্রায় কখনই কারও আয়ত্তের সীমানায় পড়ত না। এই প্রসঙ্গে মতঙ্গের উপাখ্যান স্মরণ করা যেতে পারে। মতঙ্গ ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মলাভ করলেও চণ্ডাল বলে পরিচিত ছিলেন, কারণ তাঁর 'যৌবনে মদমত্তা এক ব্রাহ্মণীর উদর হইতে শূদ্রজাতীয় কোন এক নাপিতের দ্বারা জন্মলাভ'। ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য মতঙ্গ 'তপস্যায় নিরত থাকিয়া দেবগণকে সন্তাপিত করিয়া দিলেন'। কিন্তু ইন্দ্র তাঁকে এসে বললেন, 'তুমি যে ব্রাহ্মণত্ব প্রার্থনা করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে দুর্লভ।...দুর্বুদ্ধে! তুমি ব্রাহ্মণত্ব প্রার্থনা করিতে করিতে মরিয়া যাইবে, তথাপি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না'[৩০]।

উমার কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল খোদ মহাদেবকে পতি হিসাবে লাভ করা। সমর্থও তিনি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঐ কঠোর প্রচেষ্টার মধ্যে কোন পরার্থপরতা নিশ্চয়ই ছিল না। শুধু যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তপস্যার উদ্দেশ্য কোন স্বার্থসিদ্ধি ছিল তাই নয়, অনেক সময়ই অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করার জন্যও তপস্যা করা হত। যেমন অম্বা তপস্যা করেছিলেন ভীষ্মের বিনাশের জন্য। 'সে ভোজন ত্যাগ করায় অত্যন্ত ক্ষীণ ও রুক্ষ হইয়া পড়িল এবং তাহার মস্তকে জটা দেখা যাইল এবং দেহে মল ও পঙ্ক জন্মিল। সেই তপোধনা কন্যা ছয়মাস কেবল বায়ুপান করত শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর এক বৎসর যমুনার জলে প্রবেশ করিয়া ভোজন পরিত্যাগ করত সেই ভাবিনী রাজকন্যা জলেই বাস করিয়া তপস্যা করিতে লাগিল। তদনন্তর তীব্র কোপাবিষ্টা হইয়া অম্বা পদের অঙ্গুষ্ঠাগ্রুলির সাহায্যে দাঁড়াইয়া স্বতঃই পতিত শুষ্কপত্র ভক্ষণ করত এক বর্ষ অতিবাহিত করিল। এইরূপে বার বৎসর কঠোর তপস্যায় সংলগ্ন থাকিয়া অম্বা পৃথিবী ও আকাশকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল'[৩১]।

আরেকটি উদাহরণ দলভ্‌পুত্র বকঋষির তপস্যার দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয় ঘটানো। বকঋষি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে কিছু পশু যাচ্ঞা করেন। ধৃতরাষ্ট্র খামকা অত্য কুপিত হয়ে এইপ্রকার বাক্য বলেন ঃ 'অরে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ! তুমি যদি পশু প্রার্থনা কর, তবে এই নিহত পশুদিগকে শীঘ্র লইয়া যাও'। তারপর 'রোষাবিষ্ট হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দাল্‌ভ্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশের জন্য মনঃস্থির করিলেন। সরস্বতী 'অবাকীর্ণ' তীর্থে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মহাতপস্বী দলভ্‌পুত্র বক উত্তম নিয়ম অবলম্বন করত সেই মৃত পশুগণের মাংসের দ্বারা তাঁহার রাষ্ট্রের হোম করিতে থাকিলেন। এই ভয়ঙ্কর যজ্ঞ যখন হইতে বিধি অনুসারে আরম্ভ হইল, তখন হইতেই ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্র ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল'[৩২]।

স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত না হয়ে তপস্যা করার উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে প্রায় পাওয়া যায় না বললেই চলে। একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম—অরুন্ধতী। সব বিষয়েই তাবৎ দেবদেবী, ঋষি আর ঋষিপত্নীদের তুলনায় এই মহীয়সী নারীকে আশ্চর্য রকমের দৃঢ় এবং নির্মল চরিত্রের অধি-কারিণীরূপে দেখানো হয়েছে। তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত দুটি নিঃস্বার্থ তপস্যার কথা প্রচারিত আছে। 'পূর্বে' ব্রহ্মা নিজ তনয়া সন্ধ্যাকে দেখিয়া সকামচিত্ত হন। পরে কন্যা বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাত্মা ঋষিগণের সমক্ষে সন্ধ্যারও স্মর-শর-বিলোড়িত চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল। সন্ধ্যা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে চিন্তা করিলেন। এবং চন্দ্রভাগা নদীর উৎপাদক

চন্দ্রভাগ নামক গিরিবরে গমন করিলেন[৩১]। সেখানে বশিষ্ঠমুনি সন্ধ্যাকে ন্যায্যমত তপশ্চর্যা শিক্ষা দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে নারায়ণগত চিত্তে তাঁহার চারিযুগ কাটিয়া গেল। জগৎপতি বিষ্ণু সন্ধ্যা যেরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, অন্তরে বাহিরে এবং জীবাত্মাকে সেইরূপ দেখাইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন'। বিষ্ণুর কাছ থেকে সন্ধ্যা নিম্নলিখিত বর দুইটি চেয়ে নেন। এক, 'পৃথিবীতলে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যেন সকাম না হয়, কিন্তু কালক্রমে যেন সকাম হয়।' আর 'আমি যেন ব্রিজগতে পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাত হই'[৩২]।

অরুন্ধতীর তপস্যা সম্পর্কে দ্বিতীয় উপাখ্যানটি এইরকম ঃ 'এক সময় সপ্তর্ষিগণ এই মঙ্গলময় শ্রেষ্ঠতীর্থে অরুন্ধতীকে পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্বতে গিয়াছিলেন। জীবিকার ইচ্ছায় তাঁহারা যখন হিমালয়ের বনে বাস করিতেছিলেন, তখন বার বর্ষকাল এই দেশে বৃষ্টি হয় নাই। সেই তপস্বী মুনিগণ সেখানে আশ্রম নির্মাণ করত বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় কল্যাণী অরুন্ধতীও প্রতিদিন তপস্যায় নিরতা ছিলেন। তারপর মহাযশস্বী মহাদেব ব্রাহ্মণের রূপধারণ করত তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলেন—শুভে! আমি ভিক্ষা চাইতেছি। তুমি এই বদরসকল পাক করিয়া দাও। তিনি এইরূপ আদেশ দান করিলে পর যশস্বিনী অরুন্ধতী ব্রাহ্মণের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেই বদরফলসকল প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্থাপিত করিয়া পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার মধ্যেই সেই বার বৎসরের ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি শেষ হইয়া যাইল। ইহার পর ভগবান্ শঙ্কর পুনরায় অরুন্ধতীকে বলিলেন,—'কল্যাণি! তোমার মনে যে অভিলাষ রহিয়াছে, তদনুসারে বর প্রার্থনা কর।' তখন বিশাল ও অরুণ-নেত্রযুক্তা অরুন্ধতী সপ্তর্ষিগণের সভায় মহাদেবকে বলিলেন—"ভগবন্। যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই স্থান 'বদরপাচন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের প্রিয় এবং অদ্ভুত এক তীর্থে পরিণত হউক"[৩৩]।

এই অরুন্ধতীর ব্যতিক্রম বাদ দিলে তপশ্চর্যার সঙ্গে স্বার্থান্বেষণের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এই ঘনিষ্ঠতা যদি তপস্যাসম্পর্কিত নীতিহীনতার একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তো ঐ নীতিহীনতার অপর একদিকে প্রকাশ লাভ করে বরদাতাদের মনোভাবে। তপস্যার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষমতাকে যদি অনপনেয় বলে মনে করা হয় তো বরদাতাদের মধ্যে আপাত দর্শনে যাকে চাটুপ্রিয়তা বলে মনে হতে পারে সেই দোষের মাত্রা কমে যায়। কিন্তু তপস্যাকারীকে বর দিতেই হবে—এইকথা মেনে নিলেও, বর দেওয়ার সময় দেবতা বা ঋষিগণ যে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দেন তাকে কোনভাবেই ক্ষমার চোখে দেখা যায় না। তাঁদের বরদানের মধ্যে প্রায়শই প্রকাশ পেত যে মনোভাব তা যুক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, উন্মাদসদৃশ, অপরিচ্ছন্ন, কিম্ভূতকিমাকার। উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক সগর রাজার বরপ্রাপ্তির উপাখ্যানটি। 'সেই রাজা পুত্রকামনায় পত্নীদ্বয়ের সহিত হিমালয় পর্বতকে আশ্রয় করিয়া তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। যোগ অবলম্বন করিয়া দুশ্চর তপস্যার দ্বারা ত্রিলোচন পিণাকপাণি ত্রিপুরারিকে সন্তুষ্ট করিলে তিনি তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তিনি ভার্যাদ্বয়ের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুত্রলাভের জন্য বর প্রার্থনা করিলেন। তখন উমাপতি ভার্যার সহিত রাজাকে বলিলেন, "তোমার ষাট হাজার পুত্র একই পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে।" তাঁহার দুই পত্নী বৈদর্ভী ও শৈব্যাই যথাকালে গর্ভধারণ করিলেন ; কিন্তু বৈদর্ভী যথাসময়ে অলাবু (লাউ) প্রসব করিলেন। তখন আকাশ হইতে মেঘগম্ভীর স্বরে কথিতা বাণী শুনিতে পাইলেন। 'ঐ অলাবু হইতে বীজগুলি বাহির করিয়া ঘৃতপূর্ণ পাত্রে রক্ষা করত সযত্নে উহাদের পাহারা দাও' ইত্যাদি[৩৪]।

এই-জাতীয় অদ্ভুত রস বরদানের উপাখ্যানে যথেষ্ট পাওয়া গেলেও যা অনেক বেশি প্রাধান্য

লাভ করে তা হল ভয়ঙ্কর রস। যে বরলাভের ফলে কোন দুষ্কৃতিকারী অসুর বা দানব সমস্ত সংসারকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়, সমস্ত শান্তিপ্রিয় জীবেদের চূড়ান্ত নিগ্রহ ঘটায়, সেইরকম বরকে নিশ্চয় ভয়ঙ্কর বলা যায়। এই ধরনের বরদানের উপাখ্যান পৌরাণিক সাহিত্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কাহিনীগুলির সবকটিই একেবারে একই ছাঁচে ঢালা। ছাঁচটি এই-প্রকার। কোন দুষ্কৃতিকারী অসুর বা দানব কোন ক্ষমতাশালী দেবতাকে স্মরণ করে আত্মনিগ্রহ করতে শুরু করে। জলকে ১০০ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে জল যেমন বাষ্প হয়ে যাবে ঠিক তেমনি অমোঘ নিয়মে আত্মনিগ্রহ কোন একটা মাত্রা অর্জন করার পর সেই দেবতা আবির্ভূত হয়ে বলেন, 'বৎস, প্রীত হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।' দুষ্কৃতকারী অসুর বা দানব এমন বর প্রার্থনা করে যার দ্বারা তারা সাধারণ যে-কোন প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে অজেয় হতে পারে। বিন্দুমাত্র অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সেই দেবতা 'তথাস্তু' বলে বর দিয়ে দেন। তারপর শুরু হয়ে যায় তুলতামাল। অত্যাচারে অনাচারে বিশ্বসংসারের অন্তিমদশা উপস্থিত হয়। তারপর শান্তির পুনঃস্থাপনের জন্য সেই দেবতাকেই তাঁরই দেওয়া বরের মধ্যে নিহিত কোন ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সেই অসুর বা দানবের বিনাশের উপায় করে দিতে হয়। এইখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশ্বসংসারের অধিবাসী জীবসকলকে কোন কারণে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ায় যে তাদের এই নিগ্রহ পেতে হয় তা নয়। তাদের নিগৃহীত হতে হয় বরদাতা দেবতার হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য খামখেয়ালের দরুন। রাবণের বরপ্রাপ্তি, সুন্দ-উপসুন্দের দ্বারা বিশ্বসংসার ছারখার হওয়া, তারকাসুরের অত্যাচারে সংসারের বিপর্যস্ত হওয়া—এসবই ঐ একই ছাঁচের উপাখ্যান।

দেবতাদের নীতিহীনতাকে যে কত সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিয়ে তাদের কীর্তি-কলাপ প্রচার করা হত তার উদাহরণ হিসাবে সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী থেকে সামান্য খানিকটা উদ্ধৃত করা যাক ঃ 'ত্রৈলোক্যকে জয় করিবার জন্য উভয়ে একমত হইয়া তপস্যায় দীক্ষা গ্রহণ করত বিন্ধ্যাচলে উগ্র তপস্যা করিতে গেল। অনন্তর দেবগণ তাহাদের উগ্র তপস্যা দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া তপোবিঘ্ন সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিলেন। স্ত্রীও রত্নসমূহ প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মহাব্রতধারী তাহারা দুইজনে মোটেই বিচলিত হইল না। সকল লোকের হিতকারী পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং তাহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়া বর দিতে চাহিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ বলিল,—'হে পিতামহ! এই তিনলোকে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যত প্রাণী আছে, আমরা উভয়ে যেন তাহাদের কাহারও দ্বারা বধ্য না হই ; কেবল আমাদের উভয়ের মধ্যে কলহ হইলেই যেন আমরা বধ্য হই।" অনন্তর পিতামহ তাহাদিগকে বরপ্রদান করত তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বধাম ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বর লাভ করিয়া দৈত্যরাজ ভ্রাতৃদ্বয় সকল প্রাণীর অবধ্য হইয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। তখন তাহারা জটা পরিত্যাগ করত মস্তকে মুকুট, সর্বাঙ্গে আভরণ এবং পরিধানে পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ধারণ করত সর্বদা সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া আনন্দোৎসবে মত্ত হইল। উৎসব নিবৃত্ত হইলে সুন্দ ও উপসুন্দ উভয়ে ত্রৈলোক্য বিজয়ের আকাঙ্ক্ষায় মন্ত্রণাপূর্বক সেনাবাহিনীকে সজ্জিত হইতে আজ্ঞা করিল। চারণগণ বিজয়-সূচক মঙ্গলময় স্তুতি করিতে লাগিল। এইরূপে স্তুতিগান শুনিতে শুনিতে তাহারা উভয়ে আনন্দে ত্রৈলোক্য বিজয়ে বাহির হইল। তীব্র পরাক্রমী তাহারা উভয়ে ইন্দ্রলোক জয় করিয়া যক্ষ, রাক্ষস ও খেচর প্রাণিগণের দিকে ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। যে-সকল দ্বিজ যজ্ঞ করেন এবং অন্যের দ্বারা যজ্ঞ করান, তাহাদিগকে বলপূর্বক হত্যা করিয়া মহাবলী দুইজনে অগ্রসর হইতে লাগিল। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শুদ্ধাত্মা মুনিগণের অগ্নিহোত্রের উপ-করণসমূহ সৈনিকগণ নির্ভয়ে জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল। রাজা ও ব্রাহ্মণগণ বিনষ্ট হওয়াতে

সমস্ত পৃথিবীতে যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন লুপ্ত হইল এবং জনসমুদায়মধ্যে যজ্ঞাদি উৎসব বন্ধ হইল। ভূতলে মনুষ্যগণ ভয়ার্ত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল, হাটে বাজারে কেনাবেচা বন্ধ হইল, দেব-কার্য নিবৃত্ত হইল এবং পুণ্য বিবাহ-উৎসব বর্জিত হইল। কৃষি ও গোপালন বন্ধ হইল, নগর ও আশ্রমসমূহ বিধ্বস্ত হইল, অস্থি ও কঙ্কালসমূহে পৃথিবী ছাইয়া গেল ; ফলে পৃথিবী দেখিতে অতি ভয়ানক হইল। অনন্তর দেবর্ষি, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ জগতের এইরূপ ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। সেই-সকল জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ও জিতাত্মা মহর্ষিগণ জগজ্জনের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ যাহা যাহা করিয়াছে, তৎসমুদায় আনুপূর্বিক যথাবৎ বর্ণনা করিলেন। তাহাদের কথা শুনিয়া পিতামহ ক্ষণকাল চিন্তা করত যথাকর্তব্য নিশ্চয় করিয়া তাহাদের বধের জন্য বিশ্বকর্মাকে ডাকিলেন[৩৬]। বিশ্বকর্মার দ্বারা তিলোত্তমার সৃষ্টি এবং ব্রহ্মার আদেশে তিলোত্তমার দ্বারা ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কামের উদ্রেক ঘটিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করা এবং পরস্পরের হাতে তাদের নিহত হওয়ার উপাখ্যান সকলেরই বিদিত। উপাখ্যানটি মনোহর সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে প্রশ্ন না উঠেই পারে না। সুন্দ-উপসুন্দকে না হয় শেষ পর্যন্ত বিনাশ করে ব্রহ্মা বিশ্বসংসারের পুনরুদ্ধার ঘটালেন। কিন্তু তার আগে বিশ্বসংসারের অধিবাসীদের যে চরম দুর্গতি হল তার কারণও তো সেই ব্রহ্মা নিজেই। আমাদের উদ্ধৃত অংশের কোন এক জায়গায় ব্রহ্মাকে 'সকল লোকের হিতকারী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্ণনাটি কি সঠিক? হিতাহিত সম্বন্ধে কোন প্রকার সচেতনতার চিহ্নই তো তাঁর ব্যবহারে পাওয়া যায় না। একবার দুষ্কৃতিকারীর স্তাবকতায় প্রীত হয়ে তার দুষ্কর্ম করার ক্ষমতাকে সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে তুললেন। তারপর আবার দেবতাদের স্তাবকতায় তুষ্ট হয়ে সেই দুষ্কৃতিকারীর নিধনের ব্যবস্থা করে দিলেন। এর মধ্যে নিতান্তই আত্মচরিত ছাড়া আর কোনো গুণের প্রকাশ পায় কি?

ঐ একই স্তাবকতাপ্রীতির প্রকাশ রাবণের বরপ্রাপ্তির মধ্যে। 'দশানন রাবণ দশহাজার বৎসর উপবাসী থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিল। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলেই নিজ এক-একটি মস্তক কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দিত। এইরূপে নয় হাজার বৎসর রাবণের গত হইল। এবং অগ্নিতে নয়টি মস্তক আহুতি দেওয়া হইয়া গেল। তারপর পুনরায় একহাজার বৎসর পূর্ণ হইলে দশগ্রীব যখন নিজ দশম মস্তক কাটিতে উদ্যত হইল তখন পিতামহ ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে দেবতাগণের সহিত রাবণসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'হে দশগ্রীব! আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার মনে যে বরলাভের ইচ্ছা আছে, উহা শীঘ্র প্রার্থনা কর'[৩৭]। ব্রহ্মার বরে ক্ষমতাশালী হয়ে রাবণ কিভাবে ত্রিভুবনকে অত্যাচারের দ্বারা সন্তাপিত করে তোলে, যে অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য বিষ্ণুকে নররূপে অবতীর্ণ হতে হয়, সে কাহিনী সুপরিচিত। কিন্তু বিশ্বসংসারকে সন্তাপিত হতে হত না, সীতাকে নির্যাতিত হতে হত না, রাম-রাবণের যুদ্ধও ঘটত না যদি না ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করার যান্ত্রিক উপায় সকলের জানা থাকত এবং যদি না প্রসন্ন হওয়ার মানেই হত একেবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়া।

চূড়ান্ত রকমের গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত সামান্য-সংখ্যক মূল কয়েকটি নীতিকে বাদ দিলে আর সবকিছুর ব্যাপারেই স্ববিরোধিতা আর অসংগতি আমাদের শাস্ত্রীয় বিচারের একটি প্রধান লক্ষণ। যে কোন কথাই শাস্ত্রে এক জায়গায় বলা হয়েছে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত কোন কথাকে শাস্ত্রে কোথাও না কোথাও আবিষ্কার করা যাবেই। তপস্যা সম্পর্কে যে মনোভাবের কথা এযাবৎ আলোচনা করলাম, ঠিক তার বিপরীত মনোভাব দু-এক জায়গায় না পাওয়া গেলে ব্যাপারটা আশ্চর্যের হত। এবং দুই-একটি জায়গায় যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা যায় তা বেশ উচ্চমার্গের।

উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক নিম্নলিখিত বক্তব্যটিকে : "যাহারা প্রকৃত ভক্ত, তাহাদের বনে গিয়া তপস্যা করিবার প্রয়োজন নাই। সকাম হইয়া দেবীর আরাধনা করিলেও যখন সিদ্ধিলাভ হয়, তখন নিষ্কাম হইয়া কার্য করিলে আর তাহাকে স্বতন্ত্র বনে গিয়া তপস্যা করিতে হইবে কেন?[৩৭]। আরও উচ্চতর মার্গের চিন্তার পরিচয় পাই নিম্নলিখিত উক্তিতে : 'অহিংসা, সত্যকথন, কোমলতা, সংযম ও সর্বভূতে দয়া,—জ্ঞানীরা এইগুলিকেই তপস্যা বলিয়া মনে করেন, কেবলমাত্র শরীর-শোষণকে তপস্যা বলেন না'[৩৮]। কিন্তু এ নিতান্তই ব্যতিক্রম।

অপর একটি উল্লেখযোগ্য চিন্তা এই প্রকার : 'তপস্যা সর্বসাধারণের ধর্ম। দয়াদাক্ষিণ্য-বিহীন শূদ্রাদি হীনবর্ণের উহাতে অধিকার আছে'[৩৯]। উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমপরিমাণ অধিকারের উদাহরণ আমাদের শাস্ত্রে বিরল।

চার

আধুনিক ভারতীয় মনে কৃচ্ছ্রের সঙ্গে মহত্ত্বের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় তার উৎসে আছে তপস্যাসম্পর্কিত প্রাচীন মনের ধারণা একথা মনে করা যুক্তিসংগত। আজকের দিনের ভারতবর্ষেও যেসব সাধক ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা আর ভক্তি নিবেদন করা হয়, তাঁদের অধিকাংশেরই গৌরবের ভিত্তি সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে তাঁদের কোন হিতকারী কার্যকলাপ বা মনোভাব নয়। সেই ভিত্তিতে রয়েছে তাঁদের সাধনার কঠোরতা। শুধু কঠোরতা নয়, সাধনার মধ্যে যত বেশি বীভৎসতা সাধনার স্তরকেও মনে করা হয় তত বেশি উচ্চ। শবদেহ নিয়ে নাড়াচাড়া করা, মড়ার খুলিতে কারণ পান করা—এসব তো নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার। যাঁরা সত্যিকারের মহাসাধক, তাঁদের কেউ শীতগ্রীষ্ম এবং সাধারণ মানুষের শালীনতাবোধকে কাঁচকলা দেখিয়ে দিগম্বর অবস্থায় থাকেন, কেউ বা নিজের বিষ্ঠা ভক্ষণ করেন, ইত্যাদি।

কিন্তু এইসব সনাতনপন্থী সাধক-সন্ন্যাসীদের চেয়ে দেশ আর কালের উপর অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন যিনি, সেই গান্ধীর ভাবনাতে কৃচ্ছ্রের প্রতি মূল্য আরোপ খুবই স্পষ্ট। তাঁর চরকা, কুটির ও গ্রামশিল্প প্রভৃতি সংক্রান্ত গোঁড়া মতবাদের সপক্ষে জোড়াতালি-দেওয়া সামাজিক এবং অর্থনৈতিক যত ধরনের যুক্তিই উপস্থাপিত করা হয়ে থাকুক না কেন, শরীরকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যেই একটা মহৎ কিছু আছে—এই ধারণা তাঁর মনস্তত্ত্বে খবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত, একথা অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কিছু কিছু বিচিত্র উপায় তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন, তাদের সঙ্গে তপস্যার দ্বারা জবরদস্তি করে বর আদায় করার সাদৃশ্য চমকপ্রদ। যেমন ভাবা যাক, তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত অনশন ধর্মঘটের পদ্ধতি। দাবিটা কী, তার যৌক্তিকতা বা নৈতিকতা কতটা, দাবির সমর্থনে জনমত কতটা আছে, দাবি মেটালে সমাজের উপকারই বা কতটা হবে আর অপকারই বা কতটা হবে—এসব কিছুই ধর্তব্যের মধ্যে নয়। উপবাস করে মহাত্মাজীর শরীর ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, তাঁর ওজন কমছে, তাঁর নাড়ীর গতি শ্লথ হয়ে আসছে, সুতরাং আগে হোক পরে হোক, ব্রিটিশ সরকারের আসনকে টলতে হবেই যেমন টলত ব্রহ্মার আসন, বিষ্ণুর আসন, অন্য দেবদেবীদের আসন। গান্ধীর এই পদ্ধতি-অবলম্বনকে যে আধুনিক ভারতবর্ষীয় জনগণ বিপুল শ্রদ্ধা আর সমর্থন জানিয়েছিল তাতেই প্রমাণ, তপস্যার উপর আধুনিক ভারতীয় মনের কতখানি আস্থা রয়েছে। আর জনগণ যে শুধু গান্ধীর উপবাসব্রতকে সমর্থন জানিয়েছে, তাই নয়। জনগণও এই পদ্ধতিটির মধ্যে বেশ এক সুবিধাজনক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে। কথায় কথায় অনশন ধর্মঘট করে দাবি আদায় করে নেওয়ার

সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক যে রেওয়াজ ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে, তার মধ্যেও দেখি ঐ একই তপস্যার প্রতি আস্থা।

বরদান এবং তপস্যার আলোচনা থেকে প্রাচীন ভারতীয় ধ্যানধারণা, যা আধুনিক যুগের ভারতবাসীদের মনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে, তাদের সম্বন্ধে আমরা যা জানলাম সূত্রাকারে তা এইভাবে রাখা যায়। এক, মানুষের সমাজে কিছু-সংখ্যক অতিমানবদের উপস্থিতি, যে অতি-মানবেরা সম্পূর্ণ নীতিচেতনাহীন। দুই, ঐ অতিমানবেরা তাঁদের অতিমানবিক ক্ষমতাকে অর্জন করেন এক যান্ত্রিক উপায়ে,—কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা। তিন, অতিমানবত্ব অর্জন না করেও বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা বা সুবিধা যে কোন ব্যক্তিই বরের আকারে আদায় করে নিতে পারতেন ঐ একই যান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা।

কৃচ্ছ্রের উপর এই-জাতীয় আস্থা ও নীতিহীন অতিমানবদের অস্তিত্ব এবং অধিকার স্বীকার করে নেওয়া এই উভয়ের মধ্যে যে মনোভাবের প্রকাশ তা মানবিকতাবিরোধী।

উদ্ধৃতিনির্দেশক

[২] দেবীপুরাণ, অধ্যায় ৬।
[২] শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, অধ্যায় ৫০।
[৩] শান্তিপর্ব, অধ্যায় ৩৫১।
[৪] আদিপর্ব, অধ্যায় ৮৪।
[৫] আদিপর্ব, অধ্যায় ৫৬।
[৬] আদিপর্ব, অধ্যায় ১৬।
[৭] বনপর্ব, অধ্যায় ৫৭।
[৮] আদিপর্ব, অধ্যায় ৩০।
[৯] আদিপর্ব, অধ্যায় ৮৬।
[১০] শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, অধ্যায় ৯।
[১১] মৎস্যপুরাণ, অধ্যায় ১২৯।
[১২] আদিপর্ব, অধ্যায় ৪০।
[১৩] আদিপর্ব, অধ্যায় ১১।
[১৪] বনপর্ব, অধ্যায় ৩৮।
[১৫] আদিপর্ব, অধ্যায় ২০৮।
[১৬] অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৪।
[১৭] শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, অধ্যায় ৮৮।
[১৮] শল্যপর্ব, অধ্যায় ৪৮।
[১৯] বনপর্ব, অধ্যায় ১০৭।
[২০] অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১১২।
[২১] শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, অধ্যায় ৯।
[২২] মৎস্যপুরাণ, অধ্যায় ১২৯।
[২৩] আদিপর্ব, অধ্যায় ২০৯।
[২৪] বনপর্ব, অধ্যায় ১৭।
[২৫] শল্যপর্ব, অধ্যায় ৫২।
[২৬] শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ২৯৬।
[২৭] আদিপর্ব, অধ্যায় ১৭৫।
[২৮] অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ২৭।
[২৯] উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ১৮৬।
[৩০] শল্যপর্ব, অধ্যায় ৪১।
[৩১] কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ১৯।
[৩২] কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ২২।
[৩৩] শল্যপর্ব, অধ্যায় ৪৮।
[৩৪] বনপর্ব, অধ্যায় ১০৬।
[৩৫] আদিপর্ব, অধ্যায় ২০৮, ২০৯, ২১০।
[৩৬] রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, অধ্যায় ১৬।
[৩৭] দেবীপুরাণ, অধ্যায় ৮০।
[৩৮] শান্তিপর্ব, অধ্যায় ৭৯।
[৩৯] শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ২৯৬।

মহাভারতের উদ্ধৃতিগুলিতে শুধু পর্বের উল্লেখ করা হয়েছে, মহাভারত কথাটি উল্লেখ করা হয়নি। কোন কোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে উদ্ধৃত অংশের সব কয়টি বাক্য উদ্ধৃত করা হয়নি, অবান্তর বিবেচনায় কিছু কিছু বাক্য বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন বাক্য বা শব্দ সংযোজন করা হয়নি।

সরলরেখা বেঁকে যায়

সুধাংশু ঘোষ

অতনুর কথা

রঙবদল অনেক দেখেছে অতনু। দেখে-দেখে চোখে সয়ে গেছে। আজকাল আর আশ্চর্য লাগে না। টকটকে লালরঙ ম্লান হলুদ হয়ে যায়, আবার সাদাটে ছাইরঙ গাঢ় সবুজ। কাছের চেনামহলে রঙবদল দেখেছে, দূরেও দেখেছে, যখন দূরে কোথাও গিয়েছে বেড়াতে-টেড়াতে। চোখ খোলা থাকলে না দেখে উপায় নেই। অতনু একাই এসব দেখে না, অন্যরাও নিশ্চয়ই দেখতে পায়। বিরল অভিজ্ঞতা তো নয়। কম বয়েসে চমক লাগত, এখন আর বিস্ময় জাগে না।

শান্তনু, তার চার বছরের বড় দাদা, কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে গিয়েছিল উলুবেড়িয়ায়। সেখানে গঙ্গার ধারে নাকি একটা চমৎকার বাংলো আছে। ফিরবার সময় শান্তনু স্টেশনের কাছ থেকে পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে একটা ফুল কিনে এনেছিল। তাজা সবুজ খেজুরপাতা দিয়ে বানানো মস্ত কাল্পনিক ফুল। শান্তনু তার নিজের ঘরে বইয়ের টেবিলের খানিক ওপরে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিল ফুলটা। দিনকয়েকের মধ্যে তার সবুজ ফুরিয়ে যায়, কেমন রুগ্ন হলদেটে হয়ে যায়। খেজুরপাতা শুকিয়ে গিয়ে ঠাসবুনুনি আলগা হয়, ধুলো জমে খাঁজে-খাঁজে। কোনো কাজে মাঝখানের বড়ঘরে গিয়ে অতনু দেখেছিল, মা শান্তনুর ঘর একটু গোছগাছ করছেন। দেয়ালে টাঙানো ফুলটা দেখিয়ে মা শান্তনুকে বলছিলেন, ওটাকে ফেলে দিই। ভালো দেখাচ্ছে না। কেবল ধুলোময়লা জমছে।

বেরোবার জন্য জামা পরছিল শান্তনু। জামাটা মাথা দিয়ে গলিয়ে বলল, না মা, থাক। ফেলে দিও না। যেদিন ওটা আনলাম, সবুজ রঙটা ময়লা দেয়ালে ক্যাটকেটে লাগছিল। এখন রঙ জ্বলে যাওয়ায় এবাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে বেশ মানাচ্ছে।

জামা পরা হয়ে গিয়েছিল। মার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে শান্তনু আরো বলছিল, তুমি সব সময় এমন বিষণ্ণ থাক কেন? তোমার মুখে কখনো হাসি দেখি না কেন মা?

মার বড়ঘরে অতনু আর দাঁড়ায় নি। চলে এসেছিল নিজের ঘরে। মা এবং দাদার এই জাতের সংলাপের দৃশ্যে অতনুর কোনো ভূমিকা নেই।

বাবা নাকি বিদ্যের জাহাজ ছিলেন। কত বড় জাহাজ বুঝবার সুযোগ পায় নি অতনু। তার বুঝবার বয়েস হওয়ার আগেই তো তিনি অকালে চোখ বুজলেন। বিদ্যের জাহাজ কথাটা নানাজনের মুখে হাজারবার শুনেছে। শুনতে-শুনতে কান পচে গেছে। শুনতে-শুনতে বিদ্যে কী, জাহাজ কী, আর ঠিক মালুম হয় না। এমন অসামান্য ছিলেন তিনি, অথচ চোখ বুজবার আগে বউ এবং দুই ছেলের জন্য কিছুই করে রেখে যান নি। একটিমাত্র কাজ অবশ্য তিনি করেছিলেন। সেই কতকাল আগে তিনি একটা তিনঘরের ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন। তখনকার বাজারদর অনুসারেই ভাড়া ঠিক হয়েছিল। এখনকার হিসেবে সেটা খুবই কম। এই একটি বৈষয়িক বুদ্ধির নজির রেখে গেছেন বাবা। যার সুফল তারা আজো পাচ্ছে। তিনি তো অন্যরকম করতে পারতেন। পয়সা বাঁচাবার জন্য ছোট ঘুপচিঘরের বাসিন্দা হতে পারতেন। তাহলে আজ বড় মুশকিল হত।

এতদিন ধরে ফ্ল্যাটের ভাড়া খানিকটা বেড়েছে। আইন অনুযায়ী যতটা বাড়তে পারে।

তাদের তুলে দিয়ে বেশি ভাড়ায় নতুন ভাড়াটে বসাবার চেষ্টা করার সাহস বাড়িঅলার হয়নি। হয়নি, কারণ বাড়িঅলা ভয় পায়। শান্তনুকে না, অতনুকে ভয় পায়। তাকে কেন ভয় পায়, অতনু বুঝতে পারে না। সে কবে কোথায় গুণ্ডার মতন আচরণ করল, অতনু নিজে জানে না। অথচ আশপাশের অনেকেরই তার প্রতি ত্রাসের মনোভাব, তার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকায়। শান্তনু একদিন বলেছিল, হুইসপার ক্যামপেনের থেকে বড় প্রচারযন্ত্র আর নেই। তার মতন সুন্দর চেহারা নাকি লাখে একটা মেলে। শান্তনুই বলে। তবু চারপাশে এত ভয়ের চোখ কেন?

সে যা হোক। হচ্ছিল রঙবদলের কথা। এই চারতলা বাড়িটা বিশাল। অনেক ভাড়াটে। কারো জিম্মায় তিনখানা, কারো দুখানা ঘর। এজমালি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নামতে দোতলার মিত্তিরদের ফ্ল্যাটের মেয়েটিকে দেখতে পেত অতনু। মেয়েটি মিত্তিরদের তিন ভাইয়ের একমাত্র বোন। তিন ভাই বিবাহিত। একজনও বেকার নয়। তবু দুবেলা রান্নাবান্না থেকে শুরু করে বাড়ির মেইনতের সব কাজ একা সেই মেয়েটিকে করতে হত। অতনুর অজানা কারণে মেয়েটির বিয়ে হচ্ছিল না, যদিও মেয়েটি অসুন্দর নয়। যখনই দেখেছে, মেয়েটির পরনে আধময়লা ন্যাতনেতে বিবর্ণ শাড়ি, শীর্ণ নিরক্ত মুখ, হাতপা জলে ভেজা। অতনু জানত, পাড়ার ডজনখানেক মেয়ে তাকে হৃদয় দিয়ে বসে আছে। তার মধ্যে অন্তত দু-তিন জন হয়তো মনের এলাকা পেরিয়ে শরীরে পৌঁছে যেতেও রাজী। কিন্তু মিত্তিরদের ফ্ল্যাটের মেয়েটি অতনুর বিষয়ে পুরোপুরি উদাসীন। একটু আশ্চর্য লাগত অতনুর। সেই মেয়ে একদিন তাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় একটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেল।

দেড় বছর পরে এক বিকেলে তাকে চৌরঙ্গীতে দেখেছিল অতনু, পাশে সেই যুবকটি, অতনুর কাছাকাছি বয়েসের। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় মেয়েটি নিজের উজ্জ্বলতায় ঝলসাচ্ছিল। তার ঘন-নীল সিলকের শাড়ি, ঠোঁটের তীব্র লাল, অতনু একঝলক দেখেছিল। তার অমন রঙবদল দেখে ভালোই তো লেগেছিল অতনুর।

একবার রাজগীর বেড়াতে গিয়ে বর্মী বৌদ্ধমন্দিরসংলগ্ন দোতলা বাড়িটার ছাদে দাঁড়িয়েছিল একা। পশ্চিমের ছোট বাগানের কমলালেবুগাছটার ডালে একটা গিরগিটি বসে ছিল। তাকে অতনু দেখছিল কয়েক মিনিট ধরে। গিরগিটির গায়ের রঙ গাছের পাতার মতন সবুজ-ঘেঁষা। তাই তাকে ছাদ থেকে চট করে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু হয়তো নড়াচড়া করায় অতনু দেখতে পেয়েছিল। দুটো পাখি উড়ে এসে বসল কমলালেবুগাছের ডালে। সামান্য দুলুনি লাগল। গিরগিটিটা নিমেষে নেমে এল গাছের তলায়। সেখানে সম্ভবত মেরামতি কাজের জন্য ইঁট স্তূপ করে রাখা ছিল। ইঁটের স্তূপের ওপর গিয়ে বসল গিরগিটিটা। দ্রুত নেমে যাওয়ার উত্তেজনায় তার গলার তলার দিকে ঝুলন্ত নরম চামড়া ফুলে উঠছিল, কুঁচকে যাচ্ছিল। দেখতে-দেখতে তার গায়ের রঙ ইঁটের রঙের মতন হয়ে গেল।

এমন রঙবদল অতনু প্রচুর দেখেছে। অন্যরাও নিশ্চয়ই দেখেছে, তারা তো অন্ধ নয়। অন্যদের থেকে তার নজর আলাদাও নয়। তেমন দাবি করার অহংকার অতনুর নেই। তাহলে তার রঙবদলের বেলায়, কম বয়েসে সে যা ছিল তার থেকে বদলে যাওয়ায়, আশপাশের মানুষের তার প্রতি ত্রাসের মনোভাব কেন? মা যে-চোখে শান্তনুকে দেখেন, সেই চোখে দেখেন না কেন অতনুকে? দুই ছেলের প্রতি মার দুরকম মনোভাব কি স্বাভাবিক? মা কি সত্যিই তাকে অন্য চোখে দেখেন? অতনুর সন্দেহ ভুল নয় তো?

বাবার মৃত্যুর পর শান্তনুর তুলনাহীন ভালোর দৃষ্টান্ত জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠছিল। সেই শান্তনু বদলে যায় নি? মার প্রতি অতনুর প্রতি সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দুম করে কলেজের

চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় নি? পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস অব্দি যে-পথে চলছিল, হঠাৎ তার উলটো দিকে চলতে শুরু করে নি?

শান্তনুকে অবশ্য একটুও হিংসে করে নি অতনু। চার বছরের বড় দাদার সঙ্গে রেশারেশির প্রশ্ন কোনোদিনই ছিল না। আর এখন তো শান্তনুকে হিংসে-টিংসে করার কোনো অবকাশই নেই। সব রেশারেশির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে শান্তনু। দুজনের মধ্যে কোনোই মিল না থাকলেও অতনু বরং মনে মনে শান্তনুকেই যা একটু শ্রদ্ধা করে এসেছে। মাবাবাকে তেমন শ্রদ্ধা করতে পারে নি বলেই হয়তো এরকম।

মাবাবাকে কেন তেমন শ্রদ্ধা করতে পারে নি? পারে নি এটাই সত্যি, কেন পারে নি তার কোনো কৈফিয়ত জানা নেই অতনুর। বাবাকে ভালো করে চিনবার সুযোগই তো তার হল না। শুধু মনে আছে খুব লম্বা রোগা একটা মানুষ, রাগী নয়, পাতলা ঠোঁট, চুল উঠে যাওয়ায় কপালটা চওড়া, সাদা পাঞ্জাবি, কাঁধে ঘি রঙের চাদর। হাতের কাছে কাগজ পেলেই অঙ্ক কষার অভ্যেস। অথচ অঙ্ক এমন একটা জিনিস যা অতনু কোনো দিন ভালবাসতে পারল না। অঙ্কের মাস্টার সেই অল্প-চেনা লোকটি চোখ বুজবার পর অতনুর বারবার মনে হয়েছে, এই তিনঘরের ফ্ল্যাটের মধ্যেই দুটো ভাগ আছে। এক দিকে শান্তনু আর মা, অন্য পাশে অতনু, একা, মধ্যিখানে একটা কাচের দেয়াল। মা সেই দেয়াল ডিঙিয়ে এপাশে আসেন না, কিন্তু মাঝেমাঝেই শান্তনু সেই কাচের দেয়াল ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দেয়। তখন অন্তত সাময়িকভাবে মনে হয়, শান্তনু, মা আর অতনুকে নিয়ে একটা নিখুঁত ত্রিভুজ। কিন্তু ত্রিভুজ জিনিসটা তো জ্যামিতির, জীবনের নয়। আর স্কুলে থাকতে জ্যামিতির সঙ্গে যে সামান্য সম্পর্ক ছিল অতনুর সেটাই দুঃসহ অভিজ্ঞতা।

অঙ্কের সংখ্যা-রেখায় ডুবে-থাকা সেই লোকটির মৃত্যুর পর থেকে অতনু বদলাতে শুরু করল। তার আগে অন্যরকম ছিল, একেবারে অন্যরকম। শান্ত, নরম। সেই বদল কখন থেকে কেমন করে এল, মা তার খোঁজ রাখলেন না। শান্তনুও কি তার হদিস রাখে? বলা যায়, ওইসব দিনে অল্প বয়েসেই এত ভার বইতে হচ্ছিল শান্তনুকে যে তার পক্ষে সব দিকে চোখ রাখা সম্ভব ছিল না। ঠিকই তো, অস্বীকার করবার উপায় নেই। শান্তনুর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ অতনুর মনে প্রশ্রয় পায় নি। কিন্তু মা? যতই পাতলা আর স্বচ্ছ হোক, মা কেন কাচের দেয়ালের ওপাশে? একটা আটপৌরে কথা আছে,—অভিমান। মার প্রসঙ্গে কথাটা অতনুর মনে আসে। মনে এলেই খারিজ করে দেয়। ব্যবহার করতে চায় না কথাটা। মেয়েদের বেলায় কথাটা মানায়। পুরুষমানুষের আবার অভিমান কী?

পাড়ায় একটা ছোট পার্ক ছিল, এখনো আছে। অতনু আজন্ম পার্কটাকে দেখে আসছে, ঘাসের চিহ্নহীন। এক সময়ে চারপাশে লোহার রেলিং ছিল, দুদিকে গেট। এখন রেলিং কোনো কোনো জায়গায় নেই। কারা যেন দুটো-চারটে করে ভেঙে নিয়ে গেছে। বেচে দিয়েছে হয়ত। খুব ছোটবেলায় ওই পার্কে একদিন চোর-চোর খেলছিল। অনেকক্ষণ ধরে বিভাস একাই চোর। পাড়ারই ছেলে, তবে ওদের বাড়িটা পার্ক থেকে অনেকটা দূরে। অত্যন্ত অস্থির স্বভাবের ছেলে বিভাস। অতনুর থেকে দু-তিন বছরের বড়। সহজে চোর হওয়ার কথা নয় বিভাসের। সেদিন সকালে আচমকা একবার চোর বনে গিয়ে অনেকক্ষণের মধ্যে আর কাউকে চোর বানাতে পারছিল না। রোদ্দুর কড়া হয়ে উঠলে বিভাসের ফরসা গালে লালচে আভা দেখা দিল। পাগলের মতন এলোপাথাড়ি ছুটছিল সবার পেছনে। এক সময়ে অতনু হঠাৎ বোকার মতন বিভাসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ধরা দিল। বোকাবোকা হেসে বলল, এবার আমি চোর। সবাই অবাক, বিভাসও।

খেলাটা আর তেমন জমল না সেদিন।

আর-একদিন ওই পার্কেই খেলতে খেলতে দুই দলের মধ্যে মারামারি লেগে গেল। অতনু ছিল এক দলে, বিভাস অন্য দলের পাণ্ডা। একটা ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে মেরে বিভাস ছুটে পালাচ্ছিল। টুকরোটা বেশ জোরেই এসে লাগল অতনুর মাথায়। দৌড়ে পালাতে গিয়ে বিভাস হোঁচট খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। উঠবার চেষ্টা করবার আগেই অতনু সেখানে পেঁছে গেছে। অথচ ইঁটের ঘা খেয়েও বদলা নেবার কোনো লক্ষণই দেখাল না অতনু। মাটিতে পড়ে-থাকা অসহায় বিভাসের দিকে তাকিয়ে একটু থেমে ধীর পায়ে পার্ক থেকে বেরিয়ে গেল। সবাই অবাক। বিভাসও উঠে দাঁড়িয়ে অতনুর চলে যাওয়ার দিকে গোল-গোল চোখে চেয়ে রইল।

এইরকম ছিল অতনু ছোটবেলায়। শান্ত, নরম। একটু বয়েস বাড়লেও, পড়াশোনার দিকে মন না গেলেও, বিনীত নম্র রয়ে গেল। তারপর, তার বছর বারো বয়েসে দুম করে অঙ্ক-প্রেমিক লোকটি মারা যাবার পর, তার নিজেরও অজানতে বদলের শুরু।

তখন তৃতীয়বারের চেষ্টায় স্কুলের চৌকাঠ ডিঙিয়ে কলেজে ঢোকার অধিকার পেয়েছে অতনু। অথচ মার মুখ ভাবলেশহীন, শান্তনুও পুরোপুরি খুশি নয়। শান্তনু চোখ খুলে অতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, দৃষ্টিতে সন্দেহের ছায়া নামে। শান্তনু খোলাখুলি কিছু জানতে চায় না, অতনুও বুকে হাত দিয়ে বলে না, তুই যা ভাবছিস তা নয়। আমি টুকে পাস করি নি। পরীক্ষার হলে কেবল এক-আধটু কথা বলেছিলাম। সে তো অনেকেই বলে। কলেজে ভরতির প্রসঙ্গে অবশ্য অতনু উৎসাহ দেখায় না।

ওই সময়ে এক বিকেলে মোষের পিঠের রঙের মেঘে আকাশ ঢেকে গিয়েছিল। একটু পরে তুমুল বৃষ্টি আর দীর্ঘকাল মনে থাকবার মতন হিংস্র ঝড়। সেই ঝড়ে পাড়ার একটা প্রাচীন জীর্ণ বাড়ি ভেঙে পড়ল। করপোরেশন থেকে জানিয়েই গিয়েছিল, বাড়িটা ভেঙে পড়তে পারে। কাঠের ফলকে বিপদের কথা লিখে ঝুলিয়ে দিয়েছিল সদর দরজায়। ভাড়াটেদের উঠে যেতে নির্দেশ দিয়েছিল। ভাড়াটেরা তবু ছিল ওই বাড়িতে, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। বাড়িটা ধসে পড়ার সময় চারটি পরিবারের কারো মাথা ফাটল না, হাত-পা ভাঙল না। আশ্চর্য।

সন্ধ্যের মুখে বাড়িটা ভেঙে পড়ার পর ঘণ্টা বাজিয়ে দমকলের গাড়ি এল। বেশ কয়েকখানা। দু-এক ঘরে কয়লার উনুন ধরানো হয়েছিল। তবে দুর্ঘটনার সময় আগুন লেগে যায় নি। ইঁট-কাঠের তলায় কেউ চাপা পড়েছে কিনা দমকলের লোকরা খোঁজটোঁজ নিল। চারটি পরিবারের সবাইকে এসে দাঁড়াতে হল বাইরের ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে। কয়েকজনের মাত্র সামান্য আঁচড়-টাঁচড় লেগেছিল। ধসে-যাওয়া বাড়িটার মালিক মহাদেব সামন্ত অনেকদিন থেকে তাদের তুলে দেবার চেষ্টা করছিল। পুরনো ভাড়াটে। নামমাত্র ভাড়া দিত। তা-ও অনিয়মিত।

ঝড়বৃষ্টি কমে এলে মহাদেব নিজে যে-বাড়িতে থাকে তার সামনে নাটুকে কাণ্ড হচ্ছিল। বিভাসদের একটা বেশ বড় দল ছিল পাড়ায়। বয়েস বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভাসদের সঙ্গে অতনুর অমিলও বেড়ে গিয়েছিল। ওই দলে আর মিশত না অতনু। নাটুকে কাণ্ড করছিল বিভাসদের ওই দলটা। দলের অনেকেরই বয়েস বিভাসের থেকে বেশি। পাড়ায় মহাদেবের একটা খোলার চালের বাড়ি ভেঙে নতুন দালান তোলা হয়েছিল। ভেতরের দিকের কাজ শেষ, বাইরে তখনো বাঁশের ভারা বাঁধা। ভাড়াটে আসে নি। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় নেমে-আসা চারটি পরিবারকে সেই বাড়িতে জায়গা দেবার দাবি জানাচ্ছিল বিভাসরা। মহাদেবের তকতকে নতুন বাড়িতে ছেঁড়া মাদুর, তোবড়ানো বাক্স, দলাপাকানো বিছানা-কাপড় আর সেগুলোর মালিকদের নিয়ে তুলবার দাবি জানাচ্ছিল। মহাদেবকে প্রায় ছিঁড়ে খেয়ে, তার কাছ থেকেই সুবিধে আদায়ের

চেষ্টা। বিভাসদের দলের এক-একজন তীব্র নাটুকে দৃশ্যের হিংস্র চরিত্রের মতন। ওই চারটি পরিবারে বিভাসদের কাছাকাছি বয়েসের তরুণ কেউ ছিল না। বয়স্ক লোক, একপাল বাচ্চা আর স্ত্রীলোক। তারা ছেঁড়া মাদুর তোবড়ানো বাক্স-বাসন, দলাপাকানো বিছানা-কাপড়ের স্তূপ আঁকড়ে ধরে মহাদেবের দোতলার বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে-বসে বৃষ্টির ছাটে ভিজছিল। বাচ্চা-গুলোর ভয়ার্ত কান্না থামে নি, অন্যদের ভিজে সপসপে কাপড় ভালো করে জড়াতে গিয়ে দমকা বাতাসে আরো ফেঁসে যাচ্ছিল।

অতনু তিনতলা থেকে ফুটপাথে নেমে এসে রাস্তার ওপাশের ওই দৃশ্য দেখছিল। মাঝে-মাঝে শান্তনুকে বিভাসদের আড্ডায় যেতে দেখেছে। তখন অবশ্য বিভাসদের দলে ছিল না শান্তনু। আসলে ওইসব দিনে শান্তনু বাড়িতে এবং পাড়ায় থাকত খুব কম সময়। সেদিনও সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল, ফিরবার সম্ভাবনা রাত বাড়লে।

বিভাসদের দলটাকে সরে যেতে হয়েছিল। কিছু করতে পারে নি। ততক্ষণে মহাদেবের পক্ষের অন্য একটা দল এসে গিয়েছিল। তর্কাতর্কি ঝগড়া তো চলছিলই, এবারে ধস্তাধস্তি হল। কয়েকজনের জামা ছিঁড়ল, কারো ঠোঁট কেটে খুথুর সঙ্গে রক্ত মিশল। মহাদেবের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, কেমন করে বিষ দিয়ে বিষ নামাতে হয় তার জানা আছে।

বিভাসদের থেকে হিংস্র এবং রহস্যময় ওই দলটা কেন মহাদেবকে ছায়ার মতন অনুসরণ করে তা তলিয়ে বুঝবার বয়েস তখনো হয় নি অতনুর। ওই দলের কয়েকজনকে চিনত। পাণ্ডা-গোছের একজনের নাম নেপাল। সে তো প্রায়ই আসে মহাদেবের বাড়ি। সেও নিশ্চয়ই ঠিক সামনের বাড়ির ছেলে অতনুকে চিনত। অতনুকে দেখলে লালচে চোখ সরু করে কালোকালো দাঁত দেখিয়ে মধুর করে হাসত।

নেপালদের দলটাও চলে গিয়েছিল। কেবল থেকে গিয়েছিল পাড়ার দু-তিনটি ছেলে যারা তখনো অতনুর মতন বিনীত, নম্র। যারা তখনো সেবাটেবা করা ভালো কাজ ভাবত। অতনু এবং তাদের সাহায্য চেয়েছিল সেদিন মহাদেব।

মহাদেবের কাছ থেকে চারটি ত্রিপল এবং তার নতুন বাড়ির ভারা থেকে অনেকগুলো বাঁশ খুলে নিয়ে অতনু এবং অন্য তিনটি ছেলে পার্কটায় ঢুকল। বাঁশ পুঁতে ত্রিপলের ছাউনি দিল। ঘাসের চিহ্নহীন পার্কটায় কাদা হয়েছিল বৃষ্টিতে। করাতকল থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি কাঠের গুঁড়ো এনে পুরু করে ছড়িয়ে দিল ছাউনির তলার মাটিতে। তাদের সঙ্গে বেশি মেহনতের কাজ করল মহাদেবের বাড়ির কাজের লোকরা।

বিভাসরা দূর থেকে পার্কের মধ্যের ছাউনি দেখে গেল। ভেতরে এল না একবারও। অতনু সারাক্ষণ রইল সেখানে, সঙ্গের ছেলে তিনটি চলে যাবার পরও রাত দশটা পর্যন্ত।

ছাউনির তলার চারটি পরিবারের অন্তত এক রাত্তিরের খিদে মেটাবার ভার নিয়েছিল মহাদেব। অতনুর কথাতেই রাজী হয়েছিল। রাত প্রায় দশটায় অতনুর মনে হল, তার করবার আর কিছু নেই। এবার বাড়ি ফেরা যায়।

বিভাসরা কিছু করতে না পেরে চলে গিয়েছিল। কোনোরকম হিংস্রতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে পরিবার চারটিকে অন্তত সাময়িক আশ্রয় দিতে পেরেছে অতনুরা। একটু কি আত্মতৃপ্তি এসেছিল? চারটি ছাউনির মধ্যে ঢুকে অতনু আশ্বাস দিচ্ছিল, পরদিন সকালে আবার আসবে। চতুর্থ ছাউনিটার মধ্যে সরকারী অফিসের দপ্তরী প্রাণতোষ সরকারের বউ-ছেলেমেয়েরা। প্রাণতোষ সেই রাত্তিরেই বাইরে কোথায় গেছে বাড়ির খোঁজে, তখনো ফেরেনি। বাচ্চা কটা দলাপাকানো ভিজে বিছানায় গড়াচ্ছে, গোল করে জড়ানো মাদুরের ওপর তাদের মা বসে, বড় মেয়ে মালা ভিজে

কাপড় বদলাচ্ছিল। মহাদেবের বাড়ি থেকে আসা খাদ্য তখনো কেউ ছোঁয় নি। ঝড় থেমে গেছে, মাঝেমাঝে শুধু দমকা হাওয়া। ঝিরঝির করে ছাউনির বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। ভেজা, ফেঁসে-যাওয়া কাপড়টা ছেড়ে মালা তোবড়ানো বাক্স থেকে বের করে একটা শুকনো শাড়ি পরছিল। বাতাস থেকে বাঁচাবার জন্য বাক্সটার আড়ালে মোমের কৃপণ আলো। অতনুই এনেছিল। মালার আঙুলে ক্ষিপ্র নিপুণতা ছিল না। ঝড়ে, বৃষ্টিতে সব ভেসেছে। তার শরীরের প্রকট রেখায় রেখায় মোমের আলো পড়ল। ভিজে কাপড়টা বুক থেকে খসিয়ে শিথিল আঙুল দিয়ে শুকনো শাড়িটা জড়িয়ে নেবার আগে মালার চিবুকের তলায় দপ করে নীল আগুন জ্বলে উঠল একটুক্ষণের জন্য। সেই আগুনের জিভ অতনুর চোখ চেটে-চেটে দুঃসহ জ্বালা ধরিয়ে দিল। সেই নীল আগুনের ভয়ংকর তীক্ষ্ম চিৎকারে ছাউনির ভেতরের পাতলা অন্ধকার ফালাফালা হল।

একসঙ্গে এক বিন্দুতে মালার মা এবং অতনুর দৃষ্টি বিঁধে গিয়েছিল। একসঙ্গে দুজন চোখ ফিরিয়ে আনল। অতনু দেখতে পেল, মালার মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মালা বাচ্চা কাঁটাকে ঠেলেঠেলে তুলছিল। খিচুড়ি খাওয়াবে।

অতনু ছাউনির তলা থেকে বেরিয়ে এল। পার্কের বাইরে এসে এলোমেলো ঘুরল রাস্তায় রাস্তায়। চোখ জ্বলে যাচ্ছিল। অন্ধ হয়ে গেলে হয়তো জ্বালা কমত। ঝিরঝির বৃষ্টিটাও তখন থেমেছে।

মালার মা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল কেন? ওই মুহূর্তে কেমন দুঃখের আঘাত পেল মালার মা? ভয়ে কান্না এল নাকি? মেয়ের বয়েসের ভয়? ঝড়ে বৃষ্টিতে বন্যায় যেমন ভেসে যায়, বয়েসের মারাত্মক টানে মেয়ে তেমন ভেসে যাবে—এই ভয়ে কি মালার মা কাঁদছিল?

মালা লজ্জায় কুঁকড়ে যায় নি। একবার কেঁপে উঠেই উদ্ধত অহংকারে সোজা দাঁড়িয়ে রইল। শুকনো শাড়িটা নীল আগুন-জ্বলা বুকের ওপর জড়িয়ে নিয়েছিল কয়েক ঘণ্টার জলে ভেজা শিথিল আঙুলে। তখন বিভাসদের আস্তার ঘরের দেয়ালে সাঁটা ভয়ংকর উজ্জ্বল রঙে আঁকা হাহাকার আর হিংস্রতার ছবিগুলো কেন যেন অতনুর চোখের সামনে দুলছিল।

অতনুর সামনে কি লজ্জায় কুঁকড়ে যাবার কোনো কারণ ছিল না মালার? অতনুকে কি পুরোপুরি অস্বীকার করল, ছাউনির তলায় তার অস্তিত্বই কি মানল না? অথবা কি বিভাসদের মতন ক্ষোভের ক্ষণিক প্রদর্শনী সাজাল মালা? অতনুকে ছেলেমানুষ মনে করার কারণ ছিল না। নিঃসন্দেহে তখন জীবন-যৌবনের কিছু কিছু রহস্য, মন দিয়ে না হলেও শরীর দিয়ে জানবার বয়েস তার হয়েছে।

অত রাতেও রাস্তায় খানিক উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ির দিকে ফেরার সময় এই জাতের ধারালো প্রশ্ন অতনুকে বিঁধছিল। মালার চিবুকের তলায় নীল আগুন জ্বলে উঠতে দেখার পর পার্কের ভাঙা রেলিংয়ের পাশ দিয়ে বাড়ির দিকে আসবার সময় এতক্ষণের এই প্রথম-বার অতনুর মনে হল, এই পার্কে মানুষ থাকতে পারে না। এখানে এক রাত্তির কাটানোও অসহ্য যন্ত্রণা। ঘাসের চিহ্ন নেই, জলেকাদায় ডোবা বড় বড় গর্তের হাঁ-মুখ, পুরো পার্কটাকে ঘিরে রেলিংয়ের কোলে সবাই ময়লা ফেলেছে। ইঁদুর, ছুঁচো, বিছে, আরশোলা, পিঁপড়ে। একপাল কুকুর জড়াজড়ি কামড়াকামড়ি করছে। নাক-জ্বালা-করা দুর্গন্ধ। বৃষ্টিতে দুর্গন্ধ কমেনি, বেড়েছে। এখানে মানুষ থাকতে পারে না। করাতকলের কাঠের গুঁড়ো নিশ্চয়ই এর মধ্যেই কাদায় মাখামাখি। এখানে এক রাত্তিরও কাটানো অসম্ভব।

বাড়ি ফিরে এত দেরির দায়সারা কৈফিয়ত দিল অতনু। শান্তনুর প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেল। ভাল করে খেতেও পারল না। নিজের ঘরে বিছানায় গিয়ে ঘুমোতে পারল না চট করে। রাত্তিরে

না ঘুমিয়ে বিছানায় দাপাদাপি করার যন্ত্রণা অতনুর নয়। কিন্তু সেই রাতে ঘুম আসছিল না। রাতটা বরং ঠাণ্ডা। তুমুল বৃষ্টি আর হিংস্র হাওয়ায় গরম কমে গিয়েছিল। জল জমেছিল রাস্তায়। দশটার পরে ফিরবার সময়েও দেখেছিল, ফুটপাথের কোল ঘেঁষে জলের স্রোত ঝজিরিতে এসে নামছে। রাস্তার আলোটা জানলা থেকে দূরে। তবু অন্ধকার পাতলা, চোখ খোলা রাখলে ঘরের আদল দেখা যায়। পাড়া কাঁপিয়ে একটা ভারী লরি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। ধসে-পড়া বাড়িটার কোনো-কোনো অংশ থেকে আরো কিছু ইঁটসুরকি নিশ্চয়ই ঝরে পড়ল। বিছানা থেকে নেমে জানলায় এসে দাঁড়াল অতনু। চার-পাঁচ ঘণ্টার বৃষ্টিতে ধোয়া রাস্তার রঙ নিখাদ কালো। মাঝেমাঝে এক-একবার বাতাসের ঝাপটায় রাস্তার ওপাশের গাছটার ডালপালা দুলছে। অতনুর খালি পায়ের তলায় ঘরের মেঝেটা ঠাণ্ডা। ফিরে এল বিছানায়।

এসব তো শান্তনুর অভ্যেস। রাত্তিরে ঘুমোতে না পেরে বিছানা ছেড়ে জানলায় যাওয়া, বারান্দায় গিয়ে রাস্তা দেখা, আকাশ দেখা। অতনু তো নিজে জানে, আত্মীয়স্বজন সবাই জানে, সে অন্যরকম। তবু সেই রাত্তিরে সে শান্তনুর মতন ছটফট করছিল কেন? তবে কি তার মধ্যেও একটা শান্তনু লুকিয়ে আছে? নাকি দুজনেরই ভেতরমহলে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে সেই অঙ্ক-প্রেমিক লোকটা? যা চোখের সামনে স্পষ্ট নয় তা নিয়ে মাথা ঘামায় না অতনু। তাহলে তার মধ্যে একটা শান্তনু লুকিয়ে না থাকলে সেই রাত্তিরে যা চোখের সামনে নেই তার ভাবনা অতনুর ঘুম কেড়ে নিচ্ছিল কেন?

এ বাড়ির তিনটি মানুষের জন্য তিনখানা আলাদা ঘর। এই শহরের নিম্নবিত্তদের কথা ভাবলে এটাকে বিলাস বলা যায়। অঙ্ক-প্রেমিক লোকটা এই ব্যবস্থা করে গিয়েছিল। বুদ্ধি করে ভাড়া নিয়েছিল এই ফ্ল্যাট। মধ্যিখানের ঘরখানা মার। বড়। দুপাশের দুখানা ছোট। তবু তো অতনুর একার জন্য একখানা আলাদা ঘর। অবশ্য দেয়ালে কতকাল রঙ করা হয় নি। দিনের বেলায় দেখা যায়, এখানে-ওখানে ঝুল-ময়লা। তক্তপোশের ওপর তোশকটা শক্ত। বালিশের ওয়াড় তেমন সাদা নয়। মশারির মধ্যে ঘুমোতে পারে না অতনু। মাঝেমাঝে মশার গুনগুনানি। বৃষ্টিতে মশা এসেছে ঘরে। অতনু সেই রাতেই প্রথম নিজের চারপাশ বিষয়ে এতটা সচেতন হয়ে উঠেছিল। জানলায় দাঁড়িয়ে পার্কটাকে দেখতে পায় নি, জানলা থেকে দেখা যায় না। বিছানায় ফিরে এসে ভাবছিল, সেখানে ত্রিপলের ছাউনির তলায় চারটি পরিবারের বাচ্চারা কি ঘুমোতে পারছে?

মহাদেব সামন্তকে শৈশব থেকে চেনে অতনু। লোকটা কেমন, কোনোদিন তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে নি। সন্ধ্যেয় তার বাড়ি থেকেই ত্রিপল এনেছিল। তার সাহায্যেই অতনু ঘাসের চিহ্নহীন পার্কটায় ত্রিপলের ছাউনি দিয়েছে। সততা অথবা শঠতা, কোনোটাই প্রকট হতে দেখতে পায় নি মহাদেবের মধ্যে। ঠিক আর পাঁচটা সফল ব্যবসায়ীর মতন। এখন যদিও চোখের সামনে নেই তবু অতনু ঘুম-ঘুম আচ্ছন্ন অবস্থায় মহাদেবের ভরাট মুখ বরং স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিল। সেই মুখে প্রচুর ধূর্তামি। সেই রাত থেকেই কি প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠছিল অতনু?

বিভাসদেরও অতনু ছোটবেলা থেকে দেখছে। শৈশব কেটেছে তাদের দলের কারো কারো সঙ্গে। বয়েস বাড়তে অমিল বেড়েছে। পাড়ায় একটা ঘরে বিভাসদের আড্ডা। ভয়ংকর উজ্জ্বল রঙে আঁকা কয়েকটা ছবি দেয়ালে সাঁটা। মাঝেমাঝে ছবিগুলো ওরা বদলায়। হাহাকারের, হিংস্র-তার নতুন নতুন ছবির ওপর-নিচে ভয়ংকর সব কথা বড়-বড় হরফে লেখা থাকে। ঘনঘন ভাঁড়ে চা আসে, সিগারেটের ধোঁয়ায় ছোট ঘর প্রায় অন্ধকার। সেই ঘরে অতনু কখনো ঢোকে নি। সামনে দিয়ে যায়, দূর থেকে দেখে যায়। শান্তনু সময় পেলে সেই ঘরে গিয়ে বসে এক-একদিন।

বিভাসরা একটা কিছু উপলক্ষ পেলেই মিছিল করে পাড়ায় ঘোরে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে রাগ দেখায়। দূর থেকে অতনু দেখে, দূর থেকে শোনে। কোনো কিছুরই এমন প্রদর্শনী তার পছন্দ ছিল না। তার সব ইচ্ছের, সব বাসনার রঙ মৃদু ছিল একদা।

অথচ আজ পার্কের চতুর্থ ছাউনিটার ভেতরে ঢোকার পর থেকে চোখ পুড়ে যাচ্ছিল। নিজের ঘরের বিছানায় শুয়েও ঘুম আসতে রাত প্রায় শেষ।

ঘুম আসবার অল্প আগে অতনু ভাবছিল, ধূর্তামি না করলে মহাদেব পার্কের ছাউনির তলার চারটি পরিবারকে তার নতুন বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারত। অন্তত তারা অন্য আস্তানা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত থাকতে দিতে পারত। তাহলে প্রাণতোষ সরকারের বড় মেয়ে মালা বিকেলে গা ধুয়ে শুকনো শাড়ি জড়িয়ে তকতকে নতুন বাড়ির বারান্দায় গিয়ে একটু দাঁড়াতে পারত। তার ভাইবোনগুলো ছোটাছুটি করতে পারত ঘরে-বারান্দায়।

রাস্তার একটা কর্কশ শব্দে অতনুর ঘুম ভাঙল। তাকিয়ে দেখল, সকাল। জানলা দিয়ে অবশ্য রোদ্দুর আসে নি।

আধ ঘণ্টার মধ্যে অতনু বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। মহাদেবের বাড়িতে এসে শুনল, এত সকালেই গদিতে চলে গেছে। মহাদেবের স্ট্যান্ড রোডের গদি দেখেছে অতনু। চেনে।

পার্কটার ধার দিয়ে যাবার সময় ভেতরে একবার ঢুকতে গিয়ে অতনু রেলিং চেপে ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। খানিক তফাতে ত্রিপলের হেলে-পড়া ছাউনিগুলো সকালের আলোয় অত্যন্ত করুণ দেখাচ্ছিল। ওখানে গিয়ে কী করতে পারে, কী বলতে পারে? কাল রাত দশটায় ওদের আশ্বাস দিয়েছিল, আজ সকালে আবার আসবে। ওদের কী দিতে পারে আজ সকালে?

ডান হাত দিয়ে রেলিং চেপে ধরেছিল। হাতটার কাঁপুনি চেষ্টা করেও থামাতে পারছিল না। রক্ত সরে যাওয়ায় লোহার রেলিংয়ের ওপর চেপে-বসা আঙুল সাদা দেখাচ্ছিল।

সকালেই মহাদেবের গদিতে যাবে ভেবেছিল। হিংস্রতার পথ এড়িয়ে সেখানে গিয়ে মহাদেবের কাছে তার আরজি রাখবে। অথচ আগের রাত্তিরে নীল আগুনের জিভ তার চোখের ছানি চেটে-চেটে তুলে নেবার পর সকালবেলায় পার্কের রেলিং চেপে ধরে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, মহাদেবের গদিতে যাওয়া অর্থহীন। সেখানে যাবে না, লোহার রেলিংয়ে আঙুলের আরো জোর চাপ দিল, সেখানে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। গদিতে না গিয়েও, এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই গদিতে গেলে কী হবে অতনু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

তাকে হঠাৎ এমন আসতে দেখে অস্বস্তি লুকোতে হলেও প্রায় অভ্যর্থনা করবে মহাদেব। —কী খবর, অতনু?

গদিতে বসবার জায়গা কম, অথচ টেলিফোন দুটো। এর মধ্যেই পাঁচ-সাতটি লোক ঘিরে বসেছে মহাদেবকে। গদির পেছনের গুদোমে কী মজুত আছে অতনু জানে না।

সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠে মহাদেবের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। বসতে হলে মহাদেবের গা ঘেঁষে বসতে হয়। অন্য জায়গাটুকুতে অন্য লোক। মহাদেব তার দিকে মুখ তুলে তাকাবে। থেমে থেমে স্পষ্ট করে অতনু নিজের বিনীত বক্তব্য রাখবে।—ছাউনির তলার পরিবার চারটিকে অন্তত কয়েক দিনের জন্য আপনার নতুন খালি বাড়িটায় জায়গা দিন। ওই পার্কের মধ্যে মানুষ থাকতে পারে না। সুবিধেমতন পেলেই ওরা আপনার বাড়ি ছেড়ে দেবে।

কথা বলতে-বলতেই দেখবে, মহাদেবের মুখ বদলে যাচ্ছে। কেবল চোখমুখের রঙ না, মুখের প্রান্তরেখাও বদলে যাবে। অতনুর মুখ থেকে এমন কথা শোনার বিস্ময়ে মহাদেব কেমন একটা দুর্বোধ্য শব্দ করবে।

একটা টেলিফোন হয়তো বেজে উঠবে তখনই। মহাদেব মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে টেলিফোনে ডুবে যাবে। কথা সহজে শেষ হবে না। একটির পর একটি জটিল প্রসঙ্গ নিয়ে অদৃশ্য কারো সঙ্গে আলোচনা। অতনু বুঝতে পারবে, তার শরীরটা আর তেমন সোজা থাকছে না, ভেতরের জোর কমে আসছে।

টেলিফোনে কথা শেষ করে মহাদেব পাশের লোকটিকে কিছু বলতে যাবে, তখন অতনু নতুন গলায় প্রায় চিৎকার করে উঠবে, আমাকে কিছু বলুন!

একটা রক্তাভ ভরাট মুখ পরিপূর্ণভাবে অতনুর দিকে ফিরবে।—তুমি এখন যাও, অতনু। তোমার সঙ্গে এখন কথা বলতে পারব না। কাজের ঝামেলায় আছি।

তবু অতনু আরো একবার একই কথা না বলে পারবে না।

মহাদেব শুধু বলবে, এখন যাও! যাও কথাটা চাপা দুসারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বেরিয়ে আসব।

স্ট্যান্ড রোড বড় কঠিন রাস্তা। প্রচুর ধুলো উড়বে। অতনু সব সময় দেখেছে, বৃষ্টির পরদিন শহরের রাস্তায় বেশি ধুলো ওড়ে। ভারী চাকাগুলোর সঙ্গে যাও কথাটা কেউ লটকে দেবে। অতনু প্রায় দৌড়ে স্ট্যান্ড রোড ধরে ফিরবে। এই শহরের পোকা অতনু। রাস্তায় এলো-পাথাড়ি দৌড়বার সময় গাড়ি চাপা পড়বে না। মহাদেবের তাড়া খেয়ে ছুটে আসতে আসতে নিজের পুরো নামটা মনে পড়বে, অতনু রায়চৌধুরী।

হেলে-পড়া ছাউনিগুলোর দিকে তাকানো যায় না। আকাশে আজো মেঘ রয়েছে। রোদ ওঠে নি। সকালটার যেন কতকালের অসুখ। পার্কের ভেতরে যেতে পারছিল না। ওখানে গিয়ে কী বলবে ওদের?

অতনুর মনে হল, সে খানিক সময় ধরে একটানা চিৎকার করছে। অথচ কোনো শব্দ নেই। কারো নাম ধরে দারুণ আর্তিতে যেন ডাকছিল। বিভাসদের বাড়ি এখান থেকে তিন-চার মিনিটের পথ। সেই পথ পার হয়ে বিভাসদের বাড়ি পর্যন্ত যায় নি, পার্কের রেলিং চেপে ধরেই দাঁড়িয়ে ছিল। তথাপি সেই মুহূর্তে ডান হাতে যেন বিভাসদের বাড়ির বন্ধ দরজার কড়া ধরে খুব জোরে নাড়ছিল। কার নাম ধরে ডাকছিল, বিভাসের কিনা, ঠিক বুঝতে পারল না। হয়তো কারো নাম নয়, কোনো অর্থবহ কথা নয়, শুধুই নিঃশব্দ চিৎকারে গলা চিরে যাচ্ছিল।

জন্মের সময় মার শরীর থেকে ছিঁড়ে এসে প্রথম স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পেয়ে নিশ্চয়ই চিৎকার করেছিল। অতনুর কিছু মনে নেই, কারোই মনে থাকে না। এখন নিজের গলা-চেরা চিৎকার, নিঃশব্দ হলেও, মানে বুঝতে না পারলেও, স্পষ্ট শুনতে পেল।

কয়েকদিন রোগভোগের পর প্রথম খোলামেলায় বেরোলে যেমন লাগে, বৃষ্টির পরদিন সকালটাকেও তেমন লাগবার কথা। তবে আগের বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত তুমুল বৃষ্টির পরও মেঘ কাটে নি বলেই হয়তো সেই সকালটার অসুখ সারে নি। মরা রোদ উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছিল। ভাঙা রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল অতনু একা। তার মনে হচ্ছিল, জন্মক্ষণের মতন চিৎকার করছে, যদিও গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় নি। সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ তো শোনে নি সেই চিৎকার। কারো নাম ধরে ডেকে থাকলেও, সেই ডাক অনুচ্চারিত বলে কারো সাড়া দেবার প্রশ্ন ছিল না। তবু যদি ঠিক ওই সময়ে বিভাসদের দলের কেউ ওখানে এসে পড়ত, তাহলে অতনুর একটা পথে পা বাড়াবার সম্ভাবনা ছিল। ওই পথে এগোলে তাকে নিয়ে আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে ফিসফাস-কানাকানি শুরু হত না। বিভাসদের দলের কেউ আসে নি। তার বদলে এল এমন দুজন যাদের অতনু নেপালের সঙ্গে দেখেছে, যারা মহাদেব সামন্তর পোষা বলে তার

সন্দেহ। দুজনকেই চেনে ছোটবেলা থেকে, নামও জানে। লাটু আর বাঁটু। দুজন এসে অতনুর পাশে থামল। লাটু হেসে-হেসে বলল, এখানে একা দাঁড়িয়ে কিসেব শোভা দেখা হচ্ছে?

চোখের সামনে কোনো শোভা ছিল না। অতনু চুপ করে রইল।

গলার স্বর বদলে লাটু বলছিল, বাঁশ ভালো করে পোঁতা হয় নি। আজ আবার জোর বাতাস দিলে তাঁবুগুলো তো উপড়ে যাবে। শালা মহাদেব সামন্ত বেইমান! নতুন বাড়িতে ওই লোকগুলোকে দুদিন থাকতে দিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত। দুদিন পরে উঠতে না চাইলে পিটিয়ে বের করে দিতে কতক্ষণ লাগে! যাও না, তুমি মহাদেবকে গিয়ে বলো না এই কথা। শুনবে না, তোমার কথা রাখবে না। শালা বেইমান। তুমি মহাদেবের জন্য কম কর নি। আমাদের মনে আছে, তুমি তখন ছোট ছিলে, মহাদেব মেয়েছেলে ভোটারদের গাড়ি করে আনবার সময় তোমাকে পাঠাচ্ছিল। তুমি ভদ্দরলোকের বাড়ির লালটু ছেলে, তোমার সঙ্গে ভদ্দর মেয়েরা গাড়িতে উঠতে আপত্তি করবে না ভেবেছিল। মহাদেব ভোটে হেরে গেল, সে কি তোমার দোষ? তুমি খাটলে, তোমাকে কী দিয়েছে? লুচি-আলুরদম খাইয়েছে। অমন লুচি-আলুরদমে পেচ্ছাব করি!

একটানা এত কথা বলার সময় লাটুর মুখ থেকে এমন দু-একটা শব্দ খসল যা অতনু নিজে কখনো ব্যবহার করে নি। তবে ওই জাতের শব্দ আশপাশ থেকে আকছার কানে আসে। লাটুর কথা বরং অতনুর ভালো লাগছিল, মধুর লাগছিল মহাদেব সামন্তর নিন্দে। ধরে নিল, মহাদেবের সঙ্গে অথবা নেপালের সঙ্গে কোনো কারণে লাটু-বাঁটুর আর বনছে না। লাটুর কথা মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে অতনু চোখমুখে হাসি মাখিয়ে ওদের দিকে ফিরল। আপনজন মনে হল ওদের।

লাটু আবার বলল, মহাদেব আর কিছু করবে না। ওদের জন্য আমরা ঘর খুঁজে দিতে পারি। অনন্ত পোদ্দারের পেয়ারাতলায় ঘর আছে।

অতনু মুখ ফসকে বলে ফেলল, সে তো বস্তি।

লাটুর অসহিষ্ণু মন্তব্য, বস্তি কাকে বলে? ঘর ভালো। সেখানে গরিব ভদ্দরলোকের বাস। যে ভাঙা বাড়িতে এতকাল ছিল তার থেকে ভালো জায়গা।

অতনু ভাবল, লাটু অন্যায় কথা বলছে না। তারই বরং বস্তি কথাটা ওভাবে উচ্চারণ করা অন্যায় হয়েছে।

আসলে অতনুর আর পড়াশোনা করার ইচ্ছে ছিল না। শান্তনুকে কিছু না জানিয়ে আয়ের পথ খুঁজছিল। সেটা আগের দিন মহাদেবের কাজে এগিয়ে আসার একটা কারণ। মহাদেব কোনো আয়ের পথ বাতলে দিতে পারে ভেবেছিল। এখন লাটুর মুখে যার নাম শুনল সেই অনন্ত পোদ্দার তো রীতিমত জননেতা। তার সঙ্গে তাহলে লাটু-বাঁটুর যোগাযোগ আছে। ওদের আরো আপন মনে হল।

পার্কটার কাছেই একটা পানবিড়ি সিগারেটের দোকান। তার তলায় খোঁদলের মতন জায়গাটায় আবার একটা ছোট চায়ের দোকান। সামনে ফুটপাথে সরু বেঞ্চি পাতা। সেখানে অতনু বসল ওদের সঙ্গে। ওষুধের গেলাসের মতন ছোট নীলাভ কাচের গেলাসে চা এল। তিনটে সস্তা কড়া সিগারেট কিনল লাটু। একটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরতে অতনু সহজেই নিল। বাঁটু দেশলাই জ্বালতে মুখ এগিয়ে এনে ধরাল। সিগারেটের স্বাদ অতনুর মোটেই অচেনা ছিল না। তবে এত কড়া সিগারেট আগে খায় নি।

সেই থেকে আত্মীয়-পরিজনদের চোখে অতনুর রঙবদল শুরু।

মাত্র কয়েক মাস লাটু-বাঁটুদের সঙ্গে মেলামেশা করেছিল। তাতেই ফিসফাস-কানাকানি। পেয়ারাতলায় তিনটি পরিবারের জন্য সত্যিই তিনখানা ঘরবারান্দা যোগাড় করে দিল লাটু-বাঁটুরা। ভাড়া তেমন বেশি নয়। প্রাণতোষ সরকার অন্য জায়গায় ঘর পেয়ে গিয়েছিল। অনন্ত পোদ্দারের খুব কাছে পৌঁছতে পারছিল না অতনু। যেটুকু ঘেঁষতে পারল তাতে নিজের কিছু সুবিধে হচ্ছিল না। অনন্ত পোদ্দারের মতন জননেতাদের আজকাল নানা কারণে লাটু-বাঁটুদের মতন লোকের দরকার হয়। অনেক কাজে অনেকখানি নির্ভর করতে হয় তাদের ওপর। কিন্তু অতনুর মতন ছেলেকে দলে টেনে ওদের কী লাভ? অতনু চট করে বুঝতে পারে না। পরে মনে হয়, যেহেতু লাটু-বাঁটুদের ইদানীং প্রায় সবাই চিনে ফেলেছে, যেহেতু তাদের একটাই নোংরা ট্রেডমার্ক, তাই হয়তো লাটু-বাঁটুদের ময়লা মুখে অতনুরা একটু শোভনতার প্রসাধন, শুধুই একটু বাইরের সাজগোজ।

লাটু-বাঁটুদের সঙ্গে ওদের একটা আড্ডায় যাওয়া-আসা করল কয়েক মাস। জায়গাটা কাছেই খোলামেলা বড় রাস্তার ওপরে। মস্ত তিনতলা বাড়ি। দেখে তো মনে হয়, আবাসিক হোটেল। সাইনবোর্ডে সেইরকমই লেখা ছিল। একতলায় অবশ্য বাইরের লোক এসে চা-কফি ইত্যাদি খেয়ে যেতে পারে এমন একটা রেস্টরান্ট। বেশ সাজানো-গোছানো। মালিক হয়তো অনন্ত পোদ্দার। অতনু ঠিক বুঝতে পারে নি।

সেই বাড়ির তিনতলায় একখানা ঢাউস ঘরে সন্ধ্যে থেকে অনেক রাত পর্যন্ত আরো অনেকের সঙ্গে লাটু-বাঁটুদের আড্ডা। দেয়াল ঘেঁষে কয়েকখানা সোফা, মেঝেয় জুটকার্পেট পাতা। তার ওপর বসে ওরা তাসটাস খেলে। বোঝা যায়, নির্ভেজাল তাসখেলা নয়, জুয়ো। নানা বয়েসের কয়েকটি মেয়েকেও আসতে-যেতে দেখেছে কয়েকবার। তারা এসে জুয়োর আসরে জমে যায় নি। এসে দু-দশ মিনিট পরেই কারো সঙ্গে কিছু কথা বলে চলে গেছে।

অন্তরেরও আবার গভীরতম অন্তস্তল থাকে, অন্দরমহলেরও আবার অন্দরমহল। তার হদিস অতনু পায় নি। অতনুর সহজ সরল মতলব ছিল, অনন্ত পোদ্দারকে ধরে কোনো চাকরি-বাকরি জোটানো। লাটু-বাঁটু আশা দিয়েছিল, হয়ে যাবে একটা কিছু। প্রায়ই ওখানে গিয়ে সোফায় অথবা কার্পেটে বসে থাকছিল অতনু, সিগারেট টানছিল, বারবার চা গিলছিল। বসে-বসে দেখছিল, মাঝেমাঝে দু-চারজন দূরে কোণের দিকে সরে যায়, চাপা গলায় কী-সব কথা বলে, কেউ-কেউ চট করে বেরিয়ে যায়, পরে সেদিনই আবার ফিরে আসে অথবা আসে না।

একদিন সন্ধ্যের পর সেখানে স্বয়ং অনন্ত পোদ্দার এলেন। আসবার কথা ছিল কি ছিল না, অতনু জানে না। তাড়াতাড়ি তাসটাস সরিয়ে ফেলা হল। তখনই পাঁচটা মুরগি কেটে রান্না করা হল। ফিস্ট হল অনন্তবাবুর অনারে। একসময়ে অতনুর দিকে তাকিয়ে অনন্ত বললেন, তুমি মাস্টারমশাইয়ের ছেলে?

অতনুর মনে হল, বন্ধ দরজা-জানলা খুলে যাচ্ছে। অনন্তর পায়ের ওপর চোখ রেখে অস্পষ্ট বলল, হুঁ।

—লাটু আমায় বলেছে। দেখি তোমার জন্য কী করতে পারি। বলে অনন্ত অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

অনন্ত পোদ্দার তাহলে হয়তো কোনো দিন সেই অঙ্কপ্রেমিক লোকটির ছাত্র ছিলেন। কিন্তু সেই মাস্টারমশাইয়ের ছেলে বলে নিজেকে ওই তিনতলার ঘরে হাজির করা অতনুর কেমন বেমানান লাগল। বুঝতে পারল না কেন একটু মন খারাপ হয়ে গেল। মুরগির নরম মাংসে দাঁত বসিয়েও তেমন স্বাদ পেল না। অন্যরা তো বলছিল, রান্না হয়েছে দারুণ।

লাটু-বাটুদের সঙ্গে হোটেলের তিনতলার ঘরে যাওয়া-আসা করেছিল যে কয়েক মাস তার মধ্যে দুটো ঘটনায় বেশ মজা পেয়েছিল অতনু। প্রথমটি এক কবিসম্মেলন। এক শনিবার সন্ধ্যায় হোটেলের তিনতলার ঘরসংলগ্ন ছাদে ছোটখাট মঞ্চ করা হয়েছিল। তার সামনে কয়েক শো ফোলডিং চেয়ার। মাথার ওপর শামিয়ানা। প্রচুর আলো। আর ঢালাও মদের আয়োজন।

অনন্ত অনুপস্থিত, তবে লাটু-বাটু ছিল, খাটাখাটনি করছিল। এর আগে কখনো এই ধরনের কবিসম্মেলনে অতনু যায় নি। কোনো ধারণাই ছিল না। সেদিনই প্রথম জানতে পেরেছিল, অনন্ত পোদ্দার একটি চালু পত্রিকারও মালিক।

কবি এসেছিলেন জন-পঞ্চাশ। তার মধ্যে সাত-আট জনের নাম অতনুর শোনা। দুজনকে আগে দেখেছে পলাশদার সঙ্গে। একজন তো অতনুর নাম না জানলেও তাকে আগে দেখেছেন বলে চিনতে পারলেন। হেসে বললেন, কী রে, কেমন আছিস? তুই পদ্যটদ্য লিখিস নাকি?

অতনু কেবল ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

কবিতা পাঠ শুরু হওয়ার আগে, শুরু হলে এবং সম্মেলন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ছাদ-সংলগ্ন ঢাউস ঘরে দ্রুত বোতল নিঃশেষ হচ্ছিল। একজন কবিকে মঞ্চে তোলাই গেল না। তিনি কার্পেটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলেন। টানাটানি করেও কেউ তাঁকে ওঠাতে পারল না। ভারী মজা লাগল অতনুর। ছেলেমানুষের মতন হাসি ফুটল মুখে। এমন তো আগে কখনো দেখবার সুযোগ পায় নি।

কবিতা পাঠ চলছিল, একটির পর একটি। শব্দগুলো কানে এসে ঘা দিচ্ছিল, মন দিয়ে শুনছিল না অতনু। কার্পেটে উপুড় কবির কাছ থেকে সরে ছাদে চলে এল। একখানা খালি চেয়ারের পেছনে হাত রেখে দাঁড়াল। মঞ্চে মাইক ছিল। এক পাশের উঁচু বাড়ির দেয়ালে লেগে ফেটে যাচ্ছিল শব্দ। এই প্রথম একটা কবিতার একটি-দুটি লাইন অতনু শুনল। মঞ্চে প্রায় কিশোর বয়েসের একজন, অতনুর থেকেও ছোট হবে, যাচ্ছেতাই রোগা, সামনে ঝুঁকে পড়ছিল, এক পশলা হালকা শ্রাবণ, তারপরও সবুজ পাতারা কাঁপে, সারাক্ষণ, ইতিউতি ওড়ে ফুটন্ত ইচ্ছের ফড়িং। রাত গাঢ় হলে অন্ধ গুহার পাথরে ফাটল, রক্ত চোঁয়ানো বন্ধ হয় না। অতনু অল্প আগে ভারী মজা পেয়েছিল। ছেলেমানুষি হাসি লেগেছিল ঠোঁটে। এখন সেই হাসির রেশ মিলিয়ে গেল ঠোঁট থেকে। হঠাৎই ভাবল, কবিতা এইরকম বুঝি! এমন অবলীলায় ভেতরে চলে আসে! আমি কখনো কবিতা পড়ি না কেন? অঙ্কও কি এইরকম? নাকি আমি শান্তনু আর সেই অঙ্ক-প্রেমিক লোকটাকে মাঝেমাঝে ছুঁয়ে যাই কোনো এক বিন্দুতে?

আর-এক সন্ধ্যায় লাটু এল বাড়িতে। খুব ব্যস্ত। এসেই বলল, চলো, নিচেয় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

আগে থেকে বলা ছিল। অতনু বাড়িতে অপেক্ষা করছিল লাটুর জন্য। রাস্তায় নেমে এসে দেখল, গাড়িতে একটি মেয়ে। চেনা। তাকে দু-একবার দেখেছে হোটেলের তিনতলার ঘরে। আলাপ হয় নি অবশ্য।

গাড়ির দরজা খুলে অতনুকে পেছনের সিটে মেয়েটির পাশে তুলে দিল লাটু। দরজা বন্ধ করে দিল। অতনু ভাবে নি লাটু গাড়িতে উঠবে না। আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি আসবে না?

লাটু হাসিহাসি মুখ করল।—সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে লালটু ছেলে থাকাই ভালো।

গাড়ি চলতে শুরু করল। বড় রাস্তায় বাঁক ঘুরে পাড়া ছাড়িয়ে গেল। রাস্তার আলো জ্বলেছে আধ ঘণ্টা আগে। গাড়ির মধ্যে আবছা আলো। গাড়ির মধ্যে মৃদু সুগন্ধ জমে আছে। নিশ্চয়ই মেয়েটির শাড়ি-জামা-প্রসাধন থেকে আসছে গন্ধটা। গাড়িতে উঠেই অতনু গন্ধটা

পেয়েছিল।

মেয়েটি বলল, তুমি তো অতনু?

—হুঁ। আপনি?

—আপনি-টাপনি বলবে না। ওসব আমাদের চলে না। আমার নাম পান্না।

পান্না তো সবুজ। অতনু জানে। গাড়ির ভেতরের আবছা আলোয় দেখল, মেয়েটি সবুজ রঙের সিলকের শাড়ি পরেছে। অতনু জানতে চাইল, কোথায় যাচ্ছি?

—চলোই না, দেখবে।

জ্যাম ছিল না, লাল আলোতেও তেমন আটকায় নি। পঁচিশ মিনিটে গাড়ি খিদিরপুর। জাহাজীদের একটা ক্লাবের সামনে গাড়ি থামল। অতনুকে গাড়িতে বসিয়ে পান্না নেমে গেল। জানলার কাচ আধাআধি তোলা ছিল। নামিয়ে দিল অতনু। চোখমুখে ঠাণ্ডা বাতাস লাগল। গঙ্গার জল দেখবার চেষ্টা করল। দেখতে পেল না। বাড়ি-গাছপালার আড়ালে পড়ে গেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল দরজা খুলে নামতে। নামল না। কেউ কিছু বলে নি, তবু মনে হল, চুপচাপ বসে থাকাই ভালো। এখানে আসাটাই কেমন রহস্য-রহস্য।

পান্নার ফিরতে বোধ হয় তিন মিনিটও লাগে নি। তার সঙ্গে একটি লোক। বাঙালী নয় নিশ্চয়ই। কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দাও মনে হয় না। লোকটি ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসবার আগে অতনুকে এক নজর দেখল। কোনো কথা হল না, আলাপ-পরিচয় নয়। পান্না উঠে এল পেছনের সিটে।

গাড়ির গতি বাড়লে অতনু ড্রাইভারের মাথাভরতি সাদা চুল দেখছিল আর তার পাশের লোকটির পাতলা কটা চুল। গাড়ি যখন দাঁড়িয়ে ছিল তখনো ড্রাইভার একবারও এদিকে ফেরে নি। তার মুখই দেখতে পায় নি অতনু। ড্রাইভারের ঘাড় এবং কবজি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, যৌবনে শক্তিমান ছিল।

ছোট বড় অনেকগুলো মোড় ঘুরে একটা বাড়ির দরজায় গাড়ি থামবার আগের মুহূর্তে অতনু সাইনবোর্ডে লেখা দেখেছিল, মার্কুইস স্ট্রীট। ড্রাইভারের পাশের লোকটির সঙ্গে পান্না নেমে সেই বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

এবারেও পান্না ফিরল খুব তাড়াতাড়ি। একা। লোকটি বাড়ির ভেতরে রয়ে গেছে। পান্না গাড়িতে এসে বসতে অতনু বুঝতে পারল, তার হাতে একটা কালো ব্যাগ। দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠবার সময় ব্যাগটা দেখতে পায় নি। আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছিল হয়তো। পান্না তাকালই না অতনুর দিকে, বাইরের আশপাশ লক্ষ্য করছিল, মুখে কথা নেই, গম্ভীর।

গাড়িটা ফ্রি স্কুল স্ট্রিট দিয়ে খানিক এগোতে আর-একখানা গাড়ি একেবারে পাশে চলে এল। জায়গাটায় আলো কম। দুখানা গাড়ি গতি কমিয়ে পাঁচ সেকেন্ড থামল কি থামল না, পান্না ব্যাগটা পাশের গাড়িতে চালান করে দিল। ব্যাগটা পেয়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেল গাড়িখানা। ওই গাড়িতে লাটু-বাটু ছিল কিনা অতনু ঠিক বুঝতে পারল না।

চৌরঙ্গীতে এসে পান্না বলল, নামতে হবে, অতনু।

তাদের নামিয়ে দিয়ে খালি গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার চলে গেল। এতোক্ষণ অতনু বসেছিল ফ্রেমে আটকানো ছবির মতন। এবারে ছাড়া পেল। রাস্তায় নেমে পান্নাও অন্যরকম। হাসছিল। বুকের ওপর হাওয়ায় উড়ে আসা ছোট করে ছাঁটা চুল মাথার নিপুণ ঝাঁকানিতে কাঁধের ওপর ফেরত পাঠাল। কতকালের বন্ধুর মতন সহজ গলায় পান্না বলল, তোমার খিদে পায় নি? দোসা খাবে, মশলা দোসা? বেশ পেট ভরে যায়।

ভারী মজা লাগল অতনুর। রহস্যকাহিনীর খাসমহল থেকে দোসায় নেমে আসতে হল! চাপা হাসি লক্ষ্য করে পান্না বলল, গাড়িতে বসে পার্ক স্ট্রিটের খানাপিনার জায়গাগুলো পেরিয়ে এসেছি। গাড়ি চলে গেছে। এখন আমরা রাস্তায়। ভিড়ের বাস-ট্রামে উঠবার আগে চলো দোসা খাই। তুমি ইচ্ছে করলে দইবড়াও খেতে পার।

মাদ্রাজী রেস্টরান্টের দোতলায় উঠতে হল। একতলায় ভিড়। রাত বেশি হয় নি। দোতলায় জানলা ঘেঁষে খালি টেবিল। খাবার এল। পান্নার জন্য মশলা দোসা, অতনুর সাদা দোসা আর পান্না জোর করায় দইবড়া। খিদে মিটে গেলে স্টেনলেস স্টিলের গেলাসে কফিতে চুমুক দিয়ে অতনু ভাবল, স্রেফ খানিকক্ষণ একটি সমবয়েসী অথবা দু-এক বছরের বড় মেয়ের পাশে গাড়িতে বসে থাকা। খিদিরপুর, মার্কুইস স্ট্রিট। দুটো গাড়ি পাঁচ সেকেন্ড পাশাপাশি, কাছাকাছি। ব্যাস। এতো সহজ! কবিতা কিংবা অঙ্কের মতন।

পরদিন লাটু পঞ্চাশটাকার একখানা নোট অতনুর পকেটে গুঁজে দিল। নতুন নোট, করকরে। প্রথম নিজের উপার্জন। বড় ভালো লাগে। আবার কাঁটার খোঁচাও লাগে। কিসের কাঁটা, ঠাওর করা সহজ হয় না।

লাটু ঠোঁট টিপে হাসছিল।—তুমি নাকি বেশ চালু। তোমাকে নিয়ে কাজের কোনো ঝামেলা নেই।

—কে বলল? পান্না?

—পান্না কে?

—কাল সন্ধ্যেয় যার সঙ্গে গেলাম।

—ওর নাম চুনি—পান্না কিছু নয়।

—তবে?

—সে তোমার জেনে কাজ নেই।

কোনো কাজ না থাকলে অতনু সকালবেলায় খুব দেরিতে বিছানা ছাড়ে। ইদানীং তো সত্যি কোনো কাজ নেই। সেদিন সকালে বেশ বেলায় সবে কলঘর থেকে ঘরে এসে চা খেয়ে নিজের ঘরে ঢুকেছে। শান্তনু এর মধ্যেই স্নান-খাওয়া সেরে বেরিয়ে গেছে। মা তখনো রান্নাঘরে। অতনু রাত্তিরে মশারি টাঙায় না, একটা পাতলা চাদর রাখে গায়ের ওপর। সেই চাদরটাই গায়ে জড়ানো ছিল। বেশ জোরে কে ফ্ল্যাটের দরজার কড়া নাড়ল। ছেলেরা কেউ বাড়ি থাকলে মা দরজা খুলতে যান না। অতনু এগিয়ে দরজা খুলে দেখল, একটি অচেনা লোক, স্বাস্থ্যবান, মাঝবয়েসী।

লোকটি বলল, আপনি অতনু রায়চৌধুরী?

—হুঁ। উৎসাহী হয়ে উঠল অতনু। চাকরিবাকরির দরজা খুলে গেল বোধ হয়।

তখনই অবশ্য জানা গেল, লোকটি গোয়েন্দা পুলিস। সাদা পোশাকে এসেছে বলে বোঝা যায় নি। লোকটি অতনুর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলতে চায়।

তাকে নিজের ঘরে এনে বসাতে হল। অতনু জানে, মা এদিকে ঘেঁষবেন না। অতনুর কাছে কে এসেছে জানতে চাইবেন না। অতনুর ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ বড় কম।

ঘরে এসে বিবর্ণ নড়বড়ে বেতের চেয়ারটায় বসে লোকটির প্রথম প্রশ্ন, আপনি গত শনিবার সন্ধ্যেয় কোথায় ছিলেন?

অতনু সতর্ক হয়ে গেছে।—সর্দিজ্বর হয়েছিল। এই ঘরে শুয়ে ছিলাম।

লোকটি তাকিয়ে রইল পলকহীন।—আমাদের কাছে অন্যরকম রিপোর্ট আছে। আপনি

শনিবার সন্ধ্যেয় শিরিনের সঙ্গে গাড়িতে কোথাও গিয়েছিলেন।

অতনু বলতে যাচ্ছিল—ওর নাম শিরিন নাকি? ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে বুঝতে পেরে চেপে গেল।

লোকটি দুম করে ধারালো প্রশ্ন করল, কী বলতে যাচ্ছিলেন?

—না, কিছু না তো।

একটু চুপ করে থেকে লোকটি আবার বলল, শিরিনের সঙ্গে একজন ছিল। আপনারই মতন। আমাদের ধারণা আপনিই। আপনি অবশ্য বলছেন, জ্বর হয়েছিল, বাড়িতে শুয়ে ছিলেন। আমি এখনই আলাদা করে আপনার মার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলতে পারি। আপনার মার কথা আপনার কথার সঙ্গে না মিলতে পারে। তবে এখন ওসব করতে যাচ্ছি না।

অতনু দাঁতের ওপর দাঁত চাপল।—আমার মাকে মিথ্যে বিরক্ত করবেন না।

—বললাম তো, এখন ওসব করতে যাচ্ছি না। বুঝতেই পারছেন আপনার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়েছে। আপনার কতদূর পড়াশোনা, আপনি কেমন পরিবারের ছেলে। আপনি আর পড়ছেন না কেন?

—বসে-বসে বইয়ের পাতা মুখস্থ করার মেজাজ নেই। চাকরি খুঁজছি।

লোকটি প্রথম সরল হাসল।—আমার আপনার বয়েসী ছেলেমেয়ে আছে। আপনাকে তুমি বলতে চেয়েছিলাম। বলি নি। গ্র্যান্ড ন্যাশনাল হোটেলে আপনার কী? ওখানে যাওয়া-আসা বন্ধ করুন। ওদের সঙ্গে জড়াবেন না। আমার কথা শুনলে আর কিছু হবে না। না শুনলে আপনারই ক্ষতি হবে, বিপদ ডেকে আনবেন।

দুই ভাই খুব কমই একসঙ্গে খেতে বসে। দুজনের দিনযাপন দুরকম। স্নান-খাওয়া এক সময়ে হয় না। কেবল সকালের চা এবং রাত্তিরের খাওয়া কখনো সখনো এক সময়ে। সেদিন রাত্তিরে শান্তনুর সঙ্গে খেতে বসেছিল। খেতে-খেতে শান্তনু বলছিল, অতনু, তোর কলেজে ভরতি হতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর বেশি দেরি হলে কোথাও ভরতি হতে পারবি না। আমি তোর ভরতির জন্য টাকা রেখেছি আলাদা করে। একটা কলেজে কথাও বলে রেখেছি। অন্তত পাস কোর্সে ডিগ্রিটা কর।

অতনু চুপ। উপদেশ ভালো লাগে না। শান্তনু কেন যে বুঝতে চায় না তিন বছর বই মুখে করে থেকে পরীক্ষা উতরে যাওয়ার ধৈর্য অতনুর নেই।

মা খেতে দিয়ে সামনেই বসেছিলেন। এতক্ষণ কথা বলেন নি। এখন দুজনেরই খাওয়া শেষ হলে হঠাৎ চাপা ক্ষোভের গলায় বললেন, আজ সন্ধ্যের পর একটা মাতাল এসেছিল। তনুর নাম ধরে ডাকাডাকি করছিল। দরজা খুলতে আমার পায়ে মাথা ঠুকে প্রণাম করবেই। আমি সরে যেতে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে টলছিল। চোখ লাল, জল্লাদের মতন চেহারা। নাম বলল নেপাল। সামনের বাড়ির মহাদেব সামন্তর ছোট ভাইয়ের মতন নাকি সে। আমি তো কখনো দেখি নি। বলে গেল, তনু খারাপ লোকদের সঙ্গে মিশছে। আমরা যেন সাবধান হই। হাঁকডাক শুনে পাশের ঘরের অমল আর অরূপ বেরিয়ে এসেছিল। তোরা কতটুকু সময় আর বাড়ি থাকিস, আমাকে এইসব সয়ে যেতে হবে?

একসঙ্গে এত কথা বলে মা হাঁপাচ্ছিলেন। শান্তনুর ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল, নড়াচড়া করছিল চোয়ালের হাড়। অথচ কেমন আশ্চর্য কৌশলে চোখমুখ নরম করে আনল। মিষ্টি হেসে বলল, তুমি এ নিয়ে আর ভেবো না মা। নেপালকে আমি চিনি। আর কোনো দিন আসবে না আমাদের বাড়ি। অতনু কলেজে গিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা

উঠছি, তুমি কী খাবে খাও তো মা।

অতনু আগে উঠে হাতমুখ ধুতে গেল। মা এবং শান্তনুর মধ্যে নিচু গলায় আরো কিছু কথা হচ্ছিল। অতনু শুনল না, শুনতে চাইল না।

কয়েক সপ্তাহ ধরে বলতে বলতে লাটু এক সকালে অতনুকে নিয়ে গেল অনন্ত পোদ্দারের বাড়ি। বিশাল বাড়ি, প্রচুর লোকের ভিড়। দেড়ঘণ্টা অপেক্ষা করে দেড় মিনিটেরও কম সময়ের জন্য অনন্তর সামনে যেতে পারল। প্রার্থীর ভূমিকায় আগে কখনো নামে নি অতনু। তবু যতটা সম্ভব বিনীত ভঙ্গিতে জানাল, অনন্ত তার চাকরি-বাকরির একটা ব্যবস্থা করবার আশা দিয়েছিলেন।

বাড়িতে গিয়ে হাজির হওয়ায় অনন্তকে তেমন খুশী মনে হল না। মুখে সেই এক কথা —দেখি তোমার জন্য কী করতে পারি। তোমাকে এখানে আসতে হবে না। কোনোরকম সুবিধে হলে লাটুকে দিয়ে খবর পাঠাব।

অনন্ত পোদ্দারের বাড়িতে গিয়েছিল বেলা সাড়ে দশটায়। ফিরবার সময় কড়া রোদ্দুর। লাটু তখনো আবার চা খেতে চাইল। একটা চা-খানায় দেখা গেল চেয়ার উলটে টেবিলের ওপর তুলে দিয়েছে। সুতরাং লাটুর সঙ্গে আলাপের প্রথম দিনের মতন একটা পান-সিগারেটের দোকানের তলায় গুহার সামনে ফুটপাথে সরু বেঞ্চিতে বসল। এই ধরনের দোকানের চা লাটুর বেশি পছন্দ। দাম কম বলে নয়, এর অদ্ভুত স্বাদটাই তার ভালো লাগে। চা শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে প্রথম জোরালো টানের ধোঁয়া ছেড়ে লাটু বলল, এত ব্যস্ত হলে কি চলে? একটা কিছু হয়ে যাবেই। উনি যখন আশা দিচ্ছেন—

লাটুর সব কথা অতনুর কানে যাচ্ছিল না। এক হাত তফাতে ঠা ঠা রোদ্দুর। মাথার ওপরের দোতলা বারান্দার তলায় এক চিলতে ছায়ায় বসেছিল সরু বেঞ্চিতে। চা শেষ করে সিগারেট টানতে টানতে লাটু একটা জর্দাপান মুখে দিয়েছে। ঘামে ভেজা গেঞ্জি সেঁটে গেছে গায়ের সঙ্গে। লাটুর গলায় কালো সুতোয় লকেট ঝোলানো। লকেটটা বুকের ওপর বেগনি-রঙের হাওয়াই শার্টের তলায়। কিসের লকেট দেখা যায় না। কেবল গলায় জড়ানো কালো সুতোটা ময়লা আর ঘামের নুন মেখে ঈষৎ রঙ বদলেছে বোঝা যায়। ঘামের গন্ধ, পান-জর্দার গন্ধ। অতনুর অস্বস্তি লাগছিল। নিজের আঙুলের ফাঁকের জ্বলন্ত কড়া সিগারেট আধাআধি হতেই ফেলে দিয়ে বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়াল। বেশ কয়েক মাস তো হল এদের সঙ্গে মেলামেশা, ঘোরাঘুরি। সেই কবে একবার পঞ্চাশটা টাকা পাওয়া ছাড়া আর কিছুই হল না। অথচ আশ-পাশের চেনামহলে তাকে নিয়ে ফিসফাস বেড়েছে। কতই যেন নিচে নেমে গেছে অতনু। কিছুদিন থেকেই লাটু-বাটুদের খারাপ লাগছিল। আজ দুঃসহ রোদ্দুরের দুপুরে সেই খারাপ লাগা চরমে উঠল। লাটুর সঙ্গে একটাও কথা না বলে জোর পায়ে হাঁটছিল বাস স্টপের দিকে। এর মধ্যে এক সন্ধেয় নেপাল যে এসে মার কাছে মাতলামি করে গেছে, লাটুকে আগে বলে নি। আজ বলতে গিয়েও বলল না। এক সময়ে ওরা পরস্পরের সাকরেদ ছিল। কী হবে ওকথা বলে ওদের খেয়োখেয়ি বাড়িয়ে। পুলিস আসার কথাটা কেবল বলেছিল লাটুকে। লাটু মোটেই গুরুত্ব দেয় নি ব্যাপারটাকে।

অতনুকে বাসে তুলে দেবার সময় লাটু বলল, সন্ধেয় ওখানে আসছ তো?

ওখানে মানে হোটেলের তিনতলার ঘরে। বাসের ভিড়ে সেঁধিয়ে যেতে যেতে লাটুর কথা শুনতে পেল অতনু। কোনো জবাব দিল না।

অনন্ত পোদ্দারের বাড়ি গিয়েছিল এক বুধবারে। পরের সোমবারে উৎসাহ না থাকলেও

অতনু শান্তনুর সঙ্গে গিয়ে কলেজে ভরতি হল। শান্তনুর অধ্যাপনার বয়েস তখন প্রায় এক বছর। তার কলেজে ভরতি হলে অনেকগুলো টাকা বেঁচে যেত। শান্তনু তা চায় নি, নিজের কলেজে ছোট ভাইকে নিয়ে যেতে চায় নি।

অতনু ভরতি হল, কিন্তু কলেজে যাচ্ছিল না। সন্ধেয় হোটেলে যাওয়াও বন্ধ করল। সারা দিনরাত বাড়িতে নিজের ঘরে। মা এদিকে তেমন ঘেঁষেন না, তবু কয়েকবার আধ-খোলা দরজা থেকে জানতে চাইলেন, তনু, শরীর খারাপ?

প্রত্যেকবার অতনুর একই উত্তর, না মা, কিছু না।

এভাবে দু-তিন দিন কাটলে রাত্তিরে একসঙ্গে খেতে বসে শান্তনু বলল, কলেজে যাচ্ছিস না কেন?

একটু চুপ করে থেকে অতনু বলল, তুই জোর করলি বলে ভরতি হলাম। তোর কত টাকা খরচ হল। তুই তো জানিস আমার পড়াশোনায় মন নেই। ভালো লাগে না।

শান্তনু তার স্বভাবমতন মিষ্টি করে হাসল।—ক্লাসে গিয়েই দ্যাখ না। ভালো লাগতেও তো পারে। কাল নিশ্চয়ই কলেজে যাবি। তুই আমার কথা শুনিস নি এমন কখনো হয়েছে?

অতনু ভাবল, অনেকবার হয়েছে, নানা ব্যাপারে হয়েছে। নেহাত বলার ঝোঁকে শান্তনু ওইভাবে বলল। অবশ্য একটা জিনিস অতনুকে মানতেই হবে। শান্তনু কখনো তাকে উপদেশ দিতে আসে না।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে নিজের ঘরে আলো নিভিয়ে বিছানায় গিয়ে অতনু ভাবছিল, সত্যি আমি চাকরির জন্য ব্যাকুল হয়েছি কেন? স্কোয়াশ কোম্পানির চাকরি ছেড়ে শান্তনু কলেজে চাকরি নেওয়ায় বাড়ির আবহাওয়া হালকা হয়েছে। অবস্থা আগের থেকে সচ্ছল। স্পষ্ট বোঝা যায়। তাছাড়া কলেজে যেতে শুরু করলে লাটু-বাটুদের এক্তিয়ার থেকে বেরিয়ে আসবার একটা কৈফিয়ত পাওয়া যায়। ওদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে অথবা ওরা কেউ বাড়িতে খোঁজ করতে এলে বলা যায়, কলেজ করছি। এখন চাকরি চাই না। আগে গ্র্যাজুয়েট হতে চাই। ফেল-টেল না করলে তিন বছর লাগবে।

প্রথম দিন কলেজে গিয়ে অতনুর স্কুলের দু-তিন জনের সঙ্গে দেখা। তারা স্কুলে অতনুর দু বছরের জুনিয়র ছিল। পাস করেছিল এক বছরে। তারা তো জানে, অতনু দুবার ফেল করেছে। তাদের কাছ থেকে ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েরাও হয়তো জেনে যাবে। জানুক। অতনুর কিছু যায় আসে না। সে তো সব সময় নিশেন উড়িয়েই রেখেছে। তাতে বড় বড় হরফে লেখা—আমি খুব খারাপ ছাত্র। তা ছাড়া, ওরাও কি সবাই একবারে পাস করে এসেছে? ক্লাসে ছেলে-মেয়ের সংখ্যা দেড়শোর বেশি। তাদের প্রায় সবাইকেই অবশ্য মনে হল, অতনুর থেকে বয়েসে দু-তিন বছরের ছোট। অতনু তো ক্লাস এইটেও একবার ফেল করেছিল।

যার সঙ্গেই দুটো কথা হল, প্রথম আলাপেই তুই। যেন কতকালের গলাগলি। তুমি অথবা আপনি বলে দূরে রাখা নেই। ভালোই। এরা অনেকেই বয়েসে ছোট হলেও অতনুর ভালোই লাগল। আর যা হোক, অন্তত নেপাল-লাটু-বাটুদের মহল থেকে একদম আলাদা। দলাদলি আছে প্রচণ্ড। রাজনীতি নিয়ে দলাদলি। দুদিন যেতে না যেতেই টের পেল। অতনু এসব এড়িয়ে থাকতে চায়। জানে, কীভাবে এড়িয়ে থাকতে হবে। কোন দলের ছাত্রসংগঠনের কী নাম, কে কোথায় দাঁড়িয়ে, অতনুর জানা আছে। শান্তনুর সঙ্গে একবাড়িতে মানুষ, আগ্রহ না থাকলেও খোঁজখবর রাখে। এসবের মধ্যে জড়িয়ে গেলে শান্তনুর সঙ্গে বিরোধ বেধে যাওয়া অসম্ভব নয়। অতনু তা চায় না।

আর সব ভালোই লাগছিল, কিন্তু গোলমাল আসল জায়গায়। দেরিতে ভরতি হয়েছিল। ক্লাসে পড়াশোনা এগিয়ে গিয়েছিল খানিকটা। অতনু কয়েকবার মন দিয়ে শুনবার চেষ্টা করেও অধ্যাপকদের কথা ঠিক ধরতে পারছিল না। পড়াশোনা নিয়ে কোনো মনোযোগী ছাত্র অথবা ছাত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা অতনুর ধাতে নেই। শান্তনু জানতে চাইছিল, কী বই কিনতে হবে। বুক ব্যাঙ্ক থেকেও বই ধার পাওয়া যায়। ওইসব বই খুলে টেবিলে নিবিষ্ট হওয়ার অথবা বিছানায় উপুড় হওয়ার কথা ভাবলে অতনুর গায়ে কাঁটা দেয়। সুতরাং মাঝেমাঝেই ডুব দিচ্ছিল। কোনো সপ্তাহে তিন দিন, কোনো সপ্তাহে একটানা চার দিন। মাকে বোঝানো সহজ। আজ অমুক, কাল তমুক কারণে ক্লাস হচ্ছে না। শান্তনুকে সেভাবে বোঝানো যায় না। তবু, আশ্চর্য, কলেজ কামাই করছে বলে শান্তনু তেমন কিছু বলছিল না। হয়তো আশা করছিল, এমনি করেই আস্তে আস্তে অতনুর মন বসবে।

এক বিকেলে ঝিরঝির বৃষ্টি। অল্প ভিজতে রাজী থাকলে বেরিয়ে পড়া যায়। ওরা না বেরিয়ে কলেজের ক্যান্টিনে গুলতানি করছিল। দুটো বেঞ্চির মাঝখানে একটা টেবিল। ওরা মুখোমুখি ছজন। একদিকে অমিত, নূপুর, সোমা, আর একদিকে শৈবাল, দীপ্ত, অতনু। চপ আর চা খাওয়াচ্ছিল নূপুর। চপ শেষ করে, চা খেতে-খেতে নূপুর বারবার অতনুর দিকে তাকাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কিছু বলবে, অথচ বলছিল না। বলার কথা থাকলে, না বলে চুপ করে থাকার মেয়েও নূপুরকে মনে হয় না। বড় চোখা দৃষ্টি। সামনের মানুষের হৃৎপিণ্ডের ধকধক —স্বাভাবিক অস্বাভাবিক যা-ই হোক—কান পেতে শুনতে হয় না, চোখ খুলে দেখতে পায়। অন্তত তাকানোর ভঙ্গি দেখে সেইরকম লাগে। শান্তনু বলে, আমরা অনেক জিনিস কেবল শুনি, কেউ কেউ শোনার জিনিস দেখতেও পায়।

অতনু চায়ের পর সিগারেট ধরিয়েছে, নূপুর দুহাতের ওপর থুতনি রেখে বলল, অতনু, তুই আমাকে চিনিস না?

—কেন চিনব না?

—না, মানে, কলেজে আসবার আগে আমাকে চিনতিস না?

—না তো।

—তুই মেয়েদের দেখিস না বুঝি?

—খুব দেখি। সোজা চোখে দেখি।

—সেদিন তোর চোখ দুটো বেঁকে গিয়েছিল?

—কোন দিন?

নূপুর থুতনি থেকে হাত সরাল।—মাত্র কয়েক মাস আগে তুই ডায়মন্ড হারবারে গিয়েছিলি, সাগরিকায়। তোর সঙ্গে ছিলেন লেখক পলাশ লাহিড়ী, তোর দাদা আর একটি মেয়ে, আমাদের থেকে বড়। আমি রাঙাদা আর বউদির সঙ্গে গিয়েছিলাম। রাঙাদা পলাশ লাহিড়ীকে চেনে। সবার সঙ্গে আলাপ-টালাপ হয়েছিল।

অতনুর দুম করে সব মনে পড়ে গেল। নূপুরকে ভুলে যাওয়ার লজ্জায় জিভ কাটল।—আমার না, বড় গোলমেলে দিন যাচ্ছিল। এখন সব মনে পড়ছে। তুই একটা গান করেছিলি, সুনীল সাগরে।

নূপুর হাসছিল।—সুনীল সাগরে নয়, সুনীল সাগরের। তোর তো দেখছি খুব স্মরণ-শক্তি। গানটার পরের কয়েকটা কথা বল তো।

অতনু সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে বলল, জ্বালাচ্ছিস কেন? তুলনাহীনারে-কথাটা

আছে, এটুকু শুধু বলতে পারি। কথাগুলো তুই বল।

নূপুর গুনগুন করে গাইবার ভঙ্গিতে বলল, সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে। বল তো, কোন পর্যায়ের গান?

—ঝামেলা বাড়াস না। ব্যাপারটা কী জানিস? ওই গান অনেকবার শুনেছি, দারুণ ভরাট গলায়, দেবব্রত বিশ্বাসের গলায়। তাই তোর গাওয়ার কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম।

—এই তো! পথে আয়। আমাকে অপমান করছিস, কর। তুই একটু খোঁজখবর যে রাখিস, গান-টান যে শুনিস, তার জন্য তোর আর-এক কাপ চা পাওনা হল। আর-এক কাপ দিতে বলি?

—না।

—আর-একটা কাপ?

—না।

শৈবাল বৃষ্টির অবস্থা দেখে নিয়ে বলল, আজ ভিজতে হবে রে। এক কাজ করা যাক। আর তিন কাপ চা নিয়ে সবাই ভাগ করে খাই।

নূপুর সাগরিকার কথায় ফিরে গেল।—আমাদের থেকে একটু বড় যে মেয়েটিকে দেখেছিলাম তিনি কে রে অতনু?

—এযাদি। আমার বউদি হওয়ার কথা।

—হচ্ছেন?

—আমি কী করে বলব? শান্তনু আর এযাদির ব্যাপার।

—নাম ধরছিস! দাদা বলতে পারিস না?

—মোটে তো চার বছরের বড়।

—চার বছরের বড়কে দাদা বলবি না? তুই একটা ছোটলোক।

অতনু নড়েচড়ে বসল।—তোর কী হয়েছে নূপুর? আমাকে খোঁচাচ্ছিস কেন? আমি তোদের সবার থেকে দু-তিন বছরের বড়। আমি কত ঘাটের জল খেয়ে এসেছি তোরা জানিস না। আমি মুখ খুললে তোদের কানে দুটো করে লালজবা ফুটবে।

লজ্জায় কান লাল হওয়ার কথাটা অতনু এভাবে বলায় অমিত ভারী খুশী হল। অমিত পদ্য লেখে। টেবিলে চাপড় মেরে বলল, খাসা তুলনাটা দিয়েছিস!

তখনই টেবিলে তিন কাপ চা এবং তিনটি খালি কাপ এল।

অতনুর কলেজ কামাই করার অভ্যেস কমল, তবে পড়াশোনার মধ্যে ঢুকতে পারল না। শুধুই যাওয়া-আসা, ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সঙ্গে ফাঁক পেলেই কমনরুম, ক্যান্টিন অথবা অন্য কোথাও বসে আড্ডা।

বছর ঘুরে আসতে ইউনিয়নের ইলেকশন নিয়ে মেতে উঠল শৈবাল আর দীপ্ত। মেতে উঠল ঠিক নয়, ক্ষেপে উঠল। অতনু জড়াবে না। প্রতিজ্ঞা। ওদের জানিয়ে দিল, তোরা যেদিকে, সব সময় সেদিকেই আছি। এটুকু শুধু জোর দিয়ে বলতে পারি। এর বেশি আর কিছু আমি পারব না।

অন্তত কয়েক সপ্তাহের জন্য আড্ডার দলটা ছোট হয়ে গেল। কখনো অমিত-সোমা সঙ্গে থাকছিল, কখনো কেবল অতনু আর নূপুর।

বছর ঘুরে আসতে বাড়িতে একটা জিনিস অতনুর চোখে পড়ছিল। শান্তনুর আচরণ। আজন্ম দেখেছে চার বছরের বড় দাদাকে। দুজনের মধ্যে প্রচুর অমিল। শান্তনুকে অনেকটা বুঝতে পারে বলেই তো অমিলটা ধরতে পারে। বড় হয়ে দুজন দুদিকে সরে গেছে ঠিকই, কিন্তু

একেবারে ছোটবেলা থেকে বেশ বয়েস অব্দি এক বিছানায় ওকে জড়িয়েই তো ঘুমিয়েছে অতনু। বুড়ো ছেলে হয়ে গিয়েও অতনু এক-এক রাত্তিরে বিছানা ভিজিয়ে ফেলত। তখন বিছানাটা বাঁচাবার জন্য রোজ মাঝরাত্তির পেরিয়ে গেলে শান্তনু একবার টেনে তুলত ঘুমন্ত অতনুকে, বাথরুমে নিয়ে যেত। ঘুম-ঘুম চোখে সেই সময়ে শান্তনুর যে-মুখ এক-আধটু দেখেছে তাতে আর যা-ই থাক রাগ ছিল না। এখনো শান্তনু ভালো, খুব ভালো; তবে হঠাৎ-হঠাৎ কী হয়ে যায়, রুক্ষ হয়ে ওঠে। অতনুর আশ্চর্য লাগে। আগে শান্তনু কখনো এতটুকু রুক্ষতা দেখায় নি, অতনু পরপর দুবার ফেল করলেও না। ইদানীং এক-এক সময় শান্তনুর একটানা স্থির তাকিয়ে থাকা অতনুর ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। তখন কি ও চোখ দিয়ে দেখার জিনিস কান পেতে শোনে? নাকি কোনো ভাবনায় ডুবে থাকে? মার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। এযাদিকে কিছু বলবে?

অতনুর বড় একটা জ্বরটর হয় না। ভালোই থাকে শরীর। শান্তনুর বরং অসুখবিসুখ করে। সেবার অতনুর খারাপ সর্দিজ্বর হল। গোয়েন্দা পুলিসকে মিথ্যে বলেছিল একদিন। সেটাই এবার সত্যি হল। জ্বরের মধ্যে একদিন শৈবাল, দীপ্ত, অমিত, নূপুর, সোমা বাড়িতে ছল। শৈবালরা ইলেকশনে জিতেছে। পরের রবিবার, অতনুর জ্বর ছেড়েছে, মুখে রুচি আসে নি, নূপুর এল, একা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামছে, ঘরে আবছায়া। অতনু বিছানায়, কাহিল। নূপুর বেতের চেয়ারটা তক্তপোশের কাছে টেনে বসেছে।

শান্তনু বেরিয়ে যাচ্ছিল। অতনুর ঘরে দরজায় একটু থামল। স্নিগ্ধ হেসে গলা চড়িয়ে বলল, মা, চায়ের জল চাপাও। অতনুর ঘরে শরৎচন্দ্র এসেছেন।

নূপুর কি বুঝল কে জানে। নিজের পায়ের দিকে চোখ নামিয়ে নিল। অতনুর মনে হল, স্রেফ হেঁয়ালি। শান্তনু আর যা হোক, পেশায় অধ্যাপক। তার কলেজের না হলেও নূপুর ছাত্রী তো ঠিকই। শান্তনুর গলায় চ্যাংড়ামির আভাস ছিল। নূপুরের সামনে শান্তনুর চ্যাংড়ামি করা কি স্বাভাবিক?

রাত্তিরে শান্তনু একবার এঘরে আসতে অতনু বলল, তুই নূপুরকে চিনিস। আজ ও যখন এল, তুই দরজা খুলে দিয়েছিলি। তবে বলিস কেন শরৎচন্দ্র এসেছেন?

শান্তনু হাসল শব্দ করে।—তুই শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়িস নি? তাঁর উপন্যাসে এইরকম দৃশ্য থাকে।

অতনু একেবারেই পড়ে নি এমন নয়, যদিও বই পড়ার অভ্যেস নেই। সম্প্রতি যা দু-তিন খানা পড়েছে তা বিদেশী থ্রিলারের বাংলা অনুবাদ। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এমন দৃশ্য কোথায় আছে মনে পড়ল না। ঠিক কী রকম দৃশ্য?

জ্বরের পর কলেজে যেতে অমিত বলল, আমরা এক সপ্তাহের জন্য রাজগীর যাচ্ছি। দশজন। তার মধ্যে তুইও আছিস। থাকবার জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। বর্মী বৌদ্ধমন্দিরে থাকব। খাব হোটেলে। ওখানে বেশ কয়েকটা হোটেল আছে।

সব শুনে অতনু বলল, আমি যাচ্ছি না।

—কেন?

—এখন আমার টাকা নেই।

—তোর টাকা আমরা সবাই মিলে দেব। তুই পরে শোধ করে দিস।

—আমি ধার করে যাব না।

শৈবাল ইউনিয়নের প্যাডে কীসব লিখছিল। আচমকা এদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, তুই

আমাদের সঙ্গে যাবি। তোর কান ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

নূপুর মন্তব্য করল, রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আর উনি বলছেন যাবেন না!

বাড়ি ফিরে বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে মার সামনে শান্তনুকে বলে ফেলল, কলেজের ওরা কয়েকজন রাজগীর বেড়াতে যাচ্ছে। আমাকেও যেতে জোর করছে।

শান্তনুর জবাব পেতে এক সেকেন্ড দেরি হল না।—নিশ্চয়ই যাবি। ওরা টাকার একটা আন্দাজ তো করেছে। কাল জেনে আসিস। আমি কাল রাত্তিরেই তোকে টাকা দিয়ে দেব।

মা বললেন, এবারের জ্বরটা খারাপ ছিল। বাইরে গিয়ে যদি অত্যাচার না করে, শরীরের দিকে নজর রাখে, তাহলে একটু বেড়িয়ে আসাই ভালো। অল্প দিনের জন্য হলেও হাওয়াবদল হবে।

অতনু অবাক হয়ে মার দিকে তাকাল। মার মুখে এই ধরনের কথা তেমন শোনা যায় না।

শান্তনু বলে যাচ্ছিল, নালন্দা রাজগীরের কাছেই। সেখানে তো যাবি। বুদ্ধগয়া খানিকটা দূর। সেখানেও যাবি।

অমিত বেশ গায়। রাতের ট্রেনে নূপুরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করছিল। গানের ফাঁকে নূপুর একবার বলল, তোরা অত সিগারেট খাচ্ছিস কেন? এই অতনু, সেদিন তো জ্বরে ধুঁকছিলি। এখন একটার পর একটা সিগারেট। খুব লায়েক হয়েছিস, না?

শেষরাতে বক্তিয়ারপুর। নেমে আবার ছোট ট্রেন। সকালে রাজগীর পৌঁছে টাঙ্গা নিতে হল, দুটো। বর্মী বৌদ্ধমন্দিরের লাগোয়া দোতলা বাড়ির ওপরে পাশাপাশি দুখানা ঘর। কলঘরটর একতলায়। তবে বেশ কয়েকটা। অসুবিধে নেই। বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে সামান্য ডান দিকে হোটেল। সেখানে খাওয়া। সেখানে যেতে দু মিনিট, আসতে দু মিনিট। সবাই স্বীকার করল, শৈবাল-অমিতের ব্যবস্থাপনায় খুঁত নেই। দুখানা ঘরের মধ্যে একখানা ছোট। মেয়েরা তিনজন, ছেলেরা সাত। নূপুর-সোমা ছাড়া তিন্তা এসেছে, দীপ্তর খুড়তুতো বোন, ওদেরই ক্লাসের। ছোট ঘরখানা মেয়েদের জন্য, বড়টায় অতনুরা। তক্তপোশ পাতাই ছিল, ওরা বিছানা নিয়ে এসেছে।

ওদের সঙ্গে আলম এসেছে। ইতিহাসে অনার্স। হোটেলে খেতে বসে আলম বলছিল, আমি আগেও একবার রাজগীর এসেছি, তোদের তো বলেছি। এখানে কিন্তু পুরনো বৌদ্ধ নিদর্শনের ওপর কোথাও কোথাও পরবর্তী কালের মুসলমানের কবর চাপানো আছে। নালন্দায় গিয়েও তো অনেক কাণ্ডের চিহ্ন দেখবি। এসব নিয়ে আমাকে খোঁচালে কিন্তু আমার প্যাকেট থেকে কাউকে একটাও সিগারেট দেব না। আমি সকালে হোটেল থেকে ফ্লাস্কে করে চা আনবার ভার নিয়েছি। ইতিহাসের পচা ব্যাপার নিয়ে আমাকে ঘাঁটালে আমি চা আনতে পারব না।

রাজগীরে এসে বেঁচে থাকার আদল হঠাৎ এমন বদলে যাবে, অতনু ভাবে নি। একটা ছুটকো ঘটনা এর জন্য দায়ী। কলকাতায়ই একটানা থেকে গেলে এইরকম কিছু ঘটত না, আর এমন নাটুকে আকস্মিকতার মুখোমুখি হতে হত না।

দ্বিতীয় দিন সকালে চা ইত্যাদি খেয়ে ওরা বেরিয়েছিল। রোপওয়ের চেয়ারে বসে পাহাড়ের চূড়োয় উঠবে। দেখেশুনে অতনু চেয়ারে বসতে রাজি হল না।—আদুড় চেয়ার। ঘেরাটেরা, ঢাকাঢুকি নেই। ওপরে উঠতে থাকলে আমি মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারি। তোরা রোপওয়ে দিয়ে উঠে যা। সিঁড়ি আছে, কাল বিকেলে দেখেছি। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি।

সঙ্গে সঙ্গে নূপুর বলল, আরে আমার তো ভার্টিগো আছে। উঁচু থেকে নিচের দিকে

তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে, চোখের সামনের জিনিস পাক খায়। আমি বাবা রোপওয়ের এই ন্যাড়া চেয়ারে বসছি না। আমি অতনুর সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙেই উঠব।

সোমা কি অমিতের গায় আলতো করে একটা আঙুলের খোঁচা দিল?

সিঁড়ি বেয়ে বৈভার পাহাড়ের চুড়োয় উঠতে শুরু করার আগে অতনু একটা জায়গায় নূপুরকে নিয়ে এল। জায়গাটা পাহাড়ের গায় একটা টেরেসের মতন। কত হাজার বছর আগে হয়তো বড় চত্বর ছিল। এখন ভেঙে-ভেঙে গেছে। এখানে নাকি প্রথম বৌদ্ধ সম্মেলন হয়েছিল। ভেতর দিকের পাথরে চওড়া-চওড়া ফাটল। তার যে-কোনো একটা ফাঁক গলে বোধ হয় পাহাড়ের পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়া যায়। টেরেসে নূপুরকে দাঁড়াতে বলে অতনু একটা ফাঁক দিয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। অল্প এগোতে খানিক খোলা জায়গা, কাছাকাছি কয়েকটা গুহার মতন। সেখানে সম্মেলনের প্রতিনিধিরা রাত্রিবাস করতে পারে, আবার ডাকাতরা গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। পায়ের তলায় ধুলো। তার ওপর অজস্র দাগ, মানুষের পায়ের না অন্য কিছুর, সহজে বোঝা যায় না। আরো এগিয়ে অতনুর সন্দেহ হল, ফিরবার পথ গুলিয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া স্পষ্ট বুনো জন্তুর গন্ধ পেল।

বেরিয়ে এসে নূপুরকে বলল, ভেতরটা ঠিক দেখা হল না। ওর মধ্যে বুনো জন্তুর গায়ের গন্ধ।

নূপুর রেগে গেল।—তুই দুম করে ওর মধ্যে ঢুকলি কেন?

—ভয়ের কিছু নেই। ওখানে মনে হয় বনবিড়াল থাকে। হোটেলের ম্যানেজার বলছিল, বনবিড়াল প্রায়ই তাদের মুরগি খেয়ে যায়।

টেরেস থেকে সরে এসে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল। পাহাড়ের গা কেটে বানানো সিঁড়ি। কোনো-কোনো বাঁকে ছাড়া রেলিং নেই। একপাশে পাহাড়ের খাড়াই, একপাশে ঢাল। দুধারেই ছোট ঝোপঝাড়-লতাপাতা। তার তলায় এবড়ো-খেবড়ো পাথরের চাঙড়া।

খানিক উঠে একটা বাঁকে সিমেন্ট দিয়ে তৈরী বেদী। ওপরে সিমেন্টের ছাতা। সিঁড়ি বেয়ে যারা ওঠে তারা বোধ হয় এখানে বসে দু-এক মিনিট। এখন অবশ্য অন্য কেউ উঠছে-নামছে না। বেদীতে বসে সিগারেট ধরিয়ে অতনু বলল, একটা চায়ের ফ্লাস্ক আমরা আনলে পারতাম। তিনটেই ওদের কাছে রইল।

নূপুর বলল, হাঁপাচ্ছিস, আবার সিগারেট!

—সবটা খাব না। দুটোন দিয়ে ফেলে দেব।

এদিকে এখনো শীতের রেশ। রাত্তিরে তো ওরা, বিশেষত ভোরের দিকে, চাদর গায়ে দিচ্ছিল। কিন্তু এখন আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই, বেলা বাড়তে এমন কড়া রোদ উঠেছে যে মাথার চুলে আগুন ধরে যাবে মনে হয়। নূপুর শাড়ির আঁচল তুলে ঘোমটা দিল, অতনু শার্টের দুটো বোতাম খুলে কলার ধরে টেনে তুলে দিল মাথার ওপর। অতনু টের পাচ্ছিল, গেঞ্জি ভিজে যাচ্ছে ঘামে। আরো কতটা উঠতে হবে আন্দাজ করতে পারছিল না। সিঁড়িগুলো অসমান। পা ভারী হয়ে আসছে। সামনে অনেকটা সোজা খাড়াই, বাঁক নেই।

তখন সেই ছুটকো ঘটনা।

একটা গিরগিটিকে তাড়া করেছে একটা সাপ। গিরগিটিটার পাথুরে রঙ, সাপটা সরু, লিকলিকে, কালচে। দুটোরই অবিশ্বাস্য তীব্র গতি। গিরগিটিটা পাথরের চাঙড়া, ঝোপঝাড়ের লতাপাতা-ডালপালা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গতি বাড়িয়ে পালাতে চাইছে, সাপটা তার পেছনে যেন উড়ছে গরম হাওয়ায়। গিরগিটিটা সোজা না গিয়ে ঘুরছে বারবার, একবার সিঁড়ির বাঁয়ে, একবার ডাইনে।

ভাবছে বুঝি সাপটা লম্বা শরীর নিয়ে অত দ্রুত ঘুরতে পারবে না, গতি কমে যাবে। সিঁড়িতে যে দুটো মানুষ আছে ওদের খেয়াল নেই। বেশ কাছ থেকে নূপুর আর অতনুকে ঘিরে সরীসৃপ দুটো নিমেষে বার দুই পাক খেয়ে পরপর দুবার প্রায়-নিখুঁত বৃত্ত বানাল। মুখ থেকে অজানতে একটা আতঙ্কের চিৎকার খসিয়ে নূপুর আঁকড়ে ধরল অতনুকে। সেইভাবে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল দুজনই। হয়তো সরীসৃপ দুটো নূপুরের চিৎকার টের পেয়েছিল। তাদের আর দেখা গেল না।

অতনু আস্তে আস্তে বলল, তুমি একা না নূপুর, আমিও ভয় পেয়েছিলাম।

নূপুর বলল, তুমি না থাকলে আমি গাড়িয়ে পড়ে যেতাম।

বাঁয়ে পাহাড়ের ঢাল। অনেক নিচেয় ঘরবাড়ি, রাস্তা, মানুষজন, পুতুলের মতন ছোট। সেদিক থেকে দুজন একসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে আনল। পরস্পরের মুখোমুখি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। নূপুরের কাঁপা তখনো পুরো থামে নি। অথবা হয়তো অতনুর দেখার ভুল। বাতাস নূপুরের কড়া মাড় দেওয়া ছাপাশাড়ি কাঁপাচ্ছিল। কলেজে প্রথম আলাপের দিন থেকে এত কাল তুই বলে এসেছে। আজ এখনই এই প্রথম পরস্পরকে তুমি বলা। দুজনের কারো মুখে কথা ফুটছিল না। পায়ে পায়ে উঠে যাচ্ছিল চুড়োর দিকে। উঠতে-উঠতে পাশে নূপুরের দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। নূপুরের ক্লান্ত মুখের, সারা শরীরের আদল কেমন নতুন লাগছিল। বিশেষত চোখমুখ আগের থেকে নরম, কিসের ভাবনায় মগ্ন। অতনু প্রায় প্রার্থনা করছিল, সাপটা যেন গিরগিটিটার নাগাল না পায়।

রাজগীরের বাকী দিনগুলো নূপুরের সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। সবার সামনে আগের মতন তুই, কখনো অন্য কেউ না থাকলে তুমি। রাজগীর থেকে ফিরে কলেজে গিয়ে একই ঝামেলা। ঝামেলা না বলে, খেলা বলা ভালো। তবে এই খেলা বেশি দিন ভালো লাগে না। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার অল্প আগের একটা ঘটনা অতনুকে জোর নাড়া দিল। রবিবার সকাল। অতনু চায়ের টেবিলে বসে চা-রুটি খাচ্ছিল। মাখন নেই, সাদা রুটি। মা আগের দিন অতনুকে মাখন আনবার টাকা দিয়েছিলেন। অতনু আনে নি, খেয়াল ছিল না। ভুলটা তারই, তাই অতনু চুপচাপ সাদা রুটি চিবোচ্ছিল। পাশেই শান্তনু খবরের কাগজে ডুবে ছিল। কী একটা খবর পড়তে পড়তে নিঃশব্দে হাসছিল। পটে শান্তনুর চায়ের লিকার। কাপে ঢালা হয় নি। মা ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, শানু, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

শান্তনু কাগজ রেখে এদিকে মন দিল। অতনুর টোস্ট ভালো লাগে না, নরম মাখনরুটি ভালো লাগে। শান্তনুর টোস্ট পছন্দ। মা তার রুটি সেঁকে দিয়েছেন। সেঁকা রুটিতে মাখন মাখাতে গিয়ে দেখল, মাখনের পাতটি ধোয়ামোছা। মা বললেন, তনুকে মাখন আনতে বলেছিলাম। ভুলে গেছে।

শান্তনু অদ্ভুত বিচিত্র চোখে অতনুর দিকে তাকাল। হাতে রুটি কাটবার না কি রুটিতে মাখন মাখাবার কম ধারালো ছুরিটা। একদম সামান্য ব্যাপার। টোস্ট বানাবার মাখন ফুরিয়েছে। এই নিয়ে কি কোনো ঘটনার অথবা দুর্ঘটনার কথা ভাবা যায়? শান্তনু মাকে বলছিল, তোমার ছোট ছেলে মাখন আনে নি তো কী হয়েছে? ওর গালেই প্রচুর মাখন আছে। একটু চেঁচে নিই।

কথাগুলো বলতে বলতে শান্তনু চোখমুখে সেই অদ্ভুত হাসিটা মাখিয়ে রেখে ছুরিটা অতনুর মুখের কাছে তুলে আনল। খুব কাছে, আধ ইঞ্চির মধ্যে। অতনু চমকে নড়ে উঠল। ছুরির ডগার অল্প ঘষটানি লেগে গেল থুতনিতে।

শান্তনু ছুরি সরিয়ে নিয়ে সামনে ঝুঁকে বলল, কী রে, তোর লাগল? অমন চমকে উঠলি কেন? না না, লাগে নি। রক্ত বেরোয় নি তো।

সত্যি রক্ত বেরোয় নি। পরে মুখে জল দেবার সময় জায়গাটা একটুখানি কেবল জ্বালা-জ্বালা করেছিল। তবু একটা প্রশ্ন ফিরেফিরে আসছিল অতনুর মনে। প্রশ্নটা থেকে কিছুতেই ছাড়ান পাচ্ছিল না। শান্তনুর মতন বছর পঁচিশ বয়েসের অধ্যাপকের পক্ষে নিজের ঘরে বসেও এই ধরনের রসিকতা অথবা মজা করা কি স্বাভাবিক?

একা অতনুর নয়, মার মনেও কি এই প্রশ্ন আসছিল?

অনেক রাত অব্দি ভেবে অতনু একটা সিদ্ধান্ত নিল। পরীক্ষা দেবে না। দিলে পাস করতে পারবে না। নুপুররা পাস করবে। তাদের সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে ফেল করার থেকে পরীক্ষা না দেওয়া ভালো। হয়তো আগে থেকেই মনেমনে এই সিদ্ধান্তের জন্য তৈরি হচ্ছিল। এতদিন পড়াশোনা তো কিছুই করে নি। এখন কয়েক সপ্তাহ বই মুখে নিয়ে বসে লাভ নেই। তা ছাড়া মনে হচ্ছিল, শান্তনু স্পষ্ট বদলে যাচ্ছে। শান্তনুকে আগে লক্ষ্য করত না তেমন। আজকাল করছিল। শান্তনুকে নিয়ে ভাবছিল বলে পড়াশোনায় মন দেওয়া আরো কঠিন লাগছিল।

পরীক্ষা দেবে না। তাহলে তো এবার চাকরির জন্য হন্যে হয়ে লাগতে হয়। কেন পরীক্ষা দেবে না, নুপুর জানতে চাইবে। একমাত্র একটা চাকরি পেয়ে গেলে নুপুরকে বলা যায়, চাকরি নিতে হল, তাই আর পরীক্ষায় বসা হচ্ছে না। বসলেও ফেল করব। বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বড়ই কম। শান্তনুর মতন চাকরি করতে করতে রাত্তিরে ক্লাস করে পাসটাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

চাকরির খোঁজে লাটু-বাঁটুদের ডেরায় আবার যাবে না। গিয়েও লাভ নেই। মিথোই ঘোরাফেরা। ওখান থেকে একবার ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারলে নতুন করে কি কেউ ওই ফাঁদে পা দেয়? পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পেরেছে কিনা তাই বা কে জানে। ছমাস আগেও একদিন লাটুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়ায় খানিক তর্কাতর্কি হয়ে গেল। লাটুকে অবশ্য খুশী করার জন্য তার প্রিয় বিশেষ ধরনের চা সরু বেঁগুতে বসে খাইয়েছিল। তার সঙ্গে কড়া সিগারেট, জর্দাপান। একটা জিনিস অতনুর কাছে আজও অপরিষ্কার। লাটু-বাঁটুরা তাকে দলে টানতে চেয়েছিল কেন? তাদের চেনা নোংরা মুখে একটু শোভনতার প্রলেপ কি এতই দরকারী ছিল?

অতনুকে যে-কোনো একটা চাকরি পেতেই হবে। এবং খুব তাড়াতাড়ি। পার্ট ওয়ান পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে। জানে, মোটেই সহজ নয়। তবু চেষ্টা করতে হবে। একজনের নাম মনে আসছিল। দু বছর আগেও তার কাছে চাকরির জন্য গিয়েছিল একবার। দু বছর আগে সে অতনুর কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিছুতেই তার জন্য চেষ্টা করতে রাজী হয় নি। কিন্তু এখন দু বছর পরে কি অবস্থা বদলে যায় নি? এখন কি সত্যিই চাকরির দরকার নয় অতনুর?

পরদিন ভোরবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবে যখন রোদ উঁকি দিচ্ছে, অতনু চক্রবেড়িয়ায় পৌঁছে গেল। পলাশের রাত জাগা অভ্যেস। সকালে দেরিতে ঘুম ভাঙে। অতনু এসেছে শুনে বিছানা ছেড়ে চোখমুখে জল না দিয়েই বসার ঘরে চলে এল। এসেই বলল, কী রে, কোনো খারাপ খবর নয় তো?

—না না, আমি এলাম আমার নিজের একটা দরকারে। তোমাকে ঠিক ধরব বলে এত সকালে এলাম। তোমার এখানে এসে খাব বলে বাড়ি থেকে চা-ও খেয়ে আসি নি।

—বেশ করেছিস। বস একটু। আমি বাথরুম থেকে আসছি।

এই শহরের সব কটি ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজ এর মধ্যে এসে গেছে পলাশের বসবার

ঘরে। কিনতে হয় না বোধ হয়। বিনিপয়সায় পায়। অতনু দু-একটা কাগজ উলটে-পালটে দেখতে-দেখতে পলাশ এসে বসল। চা এল।

চমৎকার একখানা কেক যত্ন করে চামচ দিয়ে কেটে-কেটে খেল অতনু। ভালো কাপে ভালো চা খেল। তারপর পলাশের মুখের ওপর থেকে সিগারেটের হালকা ধোঁয়া উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে বলল, আমার চাকরি চাই। এখনই। সেইজন্য তোমার কাছে এসেছি, পলাশদা। যে-কোনো একটা চাকরি আমাকে জুটিয়ে দিতে হবে।

পলাশ হেসে ফেলল।—আবার সেই কথা! তুই খেপেছিস? চালাকি পেয়েছিস? পড়াশোনা ছেড়ে চাকরি!

অতনু একটুও দমে না গিয়ে বলল, আমি পরীক্ষা দিচ্ছি না। দিলেও পাস করতাম না। আমার আর কিছু করার নেই। নানা কারণে আমার চাকরি দরকার।

—একটা কারণ বল।

অতনু দ্বিধায় পড়ে গেল। খানিক মাথা নিচু করে থেকে মুখ তুলে দুম করে বলে ফেলল, শান্তনুকে আমার কেমন যেন লাগছে!

—কেমন?

—আগের মতন না। আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। তুমি তো তাকে আমার থেকে বেশি জান।

পলাশকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। নতুন সিগারেট ধরাল।—আর-একটু চা খা।

অতনু না বলবার আগেই পলাশ চায়ের জন্য হাঁক দিল। আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে আস্তে আস্তে বলল, তোর সঙ্গে শান্তনুকে নিয়ে আলোচনা করা কি আমার সাজে? শান্তনু আমাদের কাগজে মাঝে-মধ্যে নানা সমস্যা নিয়ে লিখছিল। তুই পড়িস কিনা জানি না। গত সোমবারে এবং তার মাসখানেক আগে আমাকে দুটো লেখা দিয়েছিল। তার একটাও ছাপা যাচ্ছে না। এমন সব কথা আছে যা আমাদের কাগজে ছাপা যায় না। অ্যাডভেনচারিজম। আমার বলা ঠিক নয়, কারণ আমি আর রাজনীতির সঙ্গে তেমন করে জড়িয়ে নেই। কিন্তু যারা জড়িয়ে আছে তারা শান্তনুর বক্তব্যকে অ্যাডভেনচারিজম বলবে। হতেই পারে, একজনের মনোভাব বদলাতে পারে। শান্তনুর মতামত যে বদলাচ্ছে, কিছুদিন থেকেই বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আমি যে-কাগজে চাকরি করি তার চরিত্র সে জানে। সেখানে তার ওইসব বক্তব্য ছাপা হতে পারে, এটা সে ভাবল কী করে! আমার আশ্চর্য লাগছে এইখানে।

অতনু কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলল না। জিভের ডগা থেকে কথা ফেরত পাঠিয়ে দিল ভেতরে। সে এখন আরো কিছু বললে সেটা দুজনে মিলে আলোচনা হয়ে দাঁড়াবে, শান্তনুর অনুপস্থিতিতে তার আশৈশব বন্ধুর সঙ্গে তাকে নিয়ে আলোচনা। পলাশ যেটুকু বলেছে, অতনুর কাছে সেটুকু বলাও তার পক্ষে ঠিক শোভন নয়। অতনুও কি পলাশের কাছে এর মধ্যেই অন্তত ইঙ্গিতে শান্তনুর বিষয়ে অস্পষ্ট অভিযোগ করে নি? সেটা কি শোভন?

দ্বিতীয় বারের চা অতনুর তেমন ভালো লাগছিল না। সিগারেটের ইচ্ছে জাগছিল। সামনেই নিচু টেবিলে পলাশের প্যাকেট। নিয়ে একটা ধরালেই হয়। থাক। শান্তনু বা পলাশের সামনে খায় নি তো কখনো।

পলাশ বলছিল, তুই কি আমাদের অফিসের কাউকে চিনিস? সে কি তোকে বলেছে যে আমাদের অফিসে কয়েকটি তরুণ ছেলেকে নেওয়া হচ্ছে? সেই খবর পেয়ে তুই আমার কাছে এসেছিস?

—না তো! অতনু দুহাতে সোফায় দুটো হাতল চেপে ধরল।

—এখন বাড়ি যা, অতনু। খেয়েদেয়ে আমাদের অফিসে এগারোটার মধ্যে চলে আয়। আমার দুটোয় যাবার কথা। তোর জন্য আগেই যাব। চেষ্টা করে দেখি। তবে চাকরি তো হাতের মোয়া না। তুই উঠে পড়। এখনই তোর জন্যই টেলিফোনে দু-একজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সাড়ে দশটা নাগাদ পলাশের অফিসে পৌঁছে গেল অতনু। বারোটার মধ্যে চেয়ার পেল, সামনে ছোট টেবিল, তার ওপর হিসেবের খাতাপত্তর। চাকরি হল। হিসেবের খাতার পাতা উলটে অতনু বুঝতে পারছিল, অঙ্ক তাকে ছাড়বে না।

পলাশ বলল, আমি কলেজে ফোন করে শান্তনুর সঙ্গে কথা বলছি। তাহলে বিকেলে বাড়ি ফিরে তাকে বোঝাতে তোর সুবিধে হবে।

সেই দিনই শান্তনু উধাও। শুধু মার নামে পরে একখানা চিঠি এল। তাতে লিখেছিল, কোথায় গ্রামে চলে যাচ্ছে। কলেজের চাকরি আর করবে না।

পলাশ সাংবাদিক। প্রচুর প্রভাব। তবু শান্তনুর খোঁজ পাচ্ছিল না। দেড় বছর পরে প্রথম খবর পেল। জানতে পারল, আরো কয়েকজনের সঙ্গে শান্তনু জেলে। তাদের সঙ্গে দেখা করে একটা রিপোর্ট লেখার জন্য কাগজের তরফ থেকে একজন তরুণ রিপোর্টারকে পাঠাল পলাশ। নিজে যেতে পারল না। নাছোড় হয়ে এযাদি সঙ্গে গেল রিপোর্টারটির। অতনু তাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এল।

তিন দিন পরে তারা ফিরে এসে জানাল, শান্তনু এবং আরো কয়েকজনকে জেল থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে তারা পালিয়েছে।

শান্তনু আবার নিখোঁজ।

পলাশ দারুণ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। একই অফিস, রোজই দেখা হতে পারে, যদিও অতনুর চারতলা আর পলাশের তিনতলা। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল, অতনুকে পলাশ এড়িয়ে চলছে।

বিকেলের দিকে তিনতলায় নেমে অতনু সুইংডোর ঠেলে পলাশের ঘরে ঢুকে গেল।—মা তোমাকে একবার ডেকেছেন।

আঙুল তুলে চেয়ার দেখিয়ে পলাশ বলল, বস।

কথাটা বলে পলাশ চুপ। টেবিলে একটা প্যাড। আধ পাতা ভরে কিছু লিখেছে। প্যাডটা হাতে নিয়ে অকারণে নাড়াচাড়া করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, এখন তোদের বাড়ি নাই বা গেলাম। আরো দেখি, কোনো খবর পাই নাকি। তুই বরং মিথ্যে বলে দিস। বলে দিস আমি এক মাসের ছুটি নিয়ে বাইরে গিয়েছি। এখন তোদের বাড়ি গেলে মাসিমা যদি বলে বসেন—শানু বেঁচে আছে তো?

সেই এক সোমবার, যেদিন থেকে অতনু এই অফিসে, সেই দিনই শান্তনু উধাও হয়ে যাওয়ায়, পরীক্ষা না দেওয়ার ব্যাপারটা কত সহজে নূপুরকে বোঝাতে পেরেছিল। নূপুর ধরে নিয়েছিল, বাড়ির জন্য অতনুকে পড়াশোনা ছাড়তে হল। অতনু বারবার বলেছে, তোমার ধারণা ভুল, নূপুর। পরীক্ষায় বসলে আমি ফেল করতাম। কিছুই পড়িনি। কতজন তো রাত্তিরে ক্লাস করে পাসটাস করে। শান্তনুই করেছিল। আমি কি তা পারি?

এসব বললে নূপুর হাসে। নিজের ধারণা নিয়েই থাকতে ভালোবাসে নূপুর। অতনুর অফিসে আসছিল। চারতলারই একপাশে অফিসের ক্যান্টিন। সেখানে নূপুরকে নিয়ে বসছিল অতনু। ক্যান্টিনে সন্দেশ-রসগোল্লা এবং আরো অনেক খাদ্য কম দামে পাওয়া যায়। ওকে বোধ হয় দুদিন ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়েছিল। দুদিনই চারটে করে সন্দেশ খেয়ে ফেলল নূপুর। এত

মিষ্টি খেলে মুটিয়ে যেতে পারে বলায় হাসতে গিয়ে বিষম খেল। যাবার সময় বলে গেল, পরীক্ষার এগারো দিন বাকী। আমাকে পাস করতে হবে। পরীক্ষা শেষ না হলে আর আসছি না। আমি ফেল করলে ওরা বলবে দুজনে মিলে পড়াশোনায় জলাঞ্জলি দিয়েছি।

শৈবাল আর দীপ্ত এসেছিল তাদের একটা মিটিয়ের খবর নিয়ে। অমিত এল একদিন। কাঁধের ঝোলা থেকে কবিতা বের করে বলল, আমাকে একটু পলাশ লাহিড়ীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি? অমিতকে নিয়ে তিনতলায় নামতে হল। পরীক্ষার দু সপ্তাহ আগে থেকে সবার আসা বন্ধ।

পার্ট ওয়ান, পার্ট টু দুটোই পাস করল নূপুর। পার্ট টু পরীক্ষার ফল বেরোলে এক রবিবারে অনেক দিন পরে বাড়িতে এসে হাজির। হাতে সন্দেশের বাক্স। খুব সাহস করে বড় ঘরে মার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নূপুরকে দেখে মা হাসলেন। অনিচ্ছায় হাসলে হাসিটা এমন করুণ দেখায়।

আর এক-দিন অফিসের চারতলায় উঠে এসেই নূপুর বলল, এখনই চলে যাব। টিফিনের সময়ে এসেছি।

—তার মানে?

—চাকরি। আমার অফিস এখান থেকে হাঁটলে দশ মিনিট। ক্যান্টিনে ফাইন ডালপুরি পাওয়া যায়। তোমাকে খাওয়াব।

অতনুর বিস্ময় কাটছিল না।—এসব দেখলে-শুনলে তো মনে হয়, এদেশে বেকারসমস্যা নেই।

—মামার জোর থাকলে সমস্যা মেটানো যায়। তোমার পলাশদা আছেন, আমার পিসেমশাই।

—আমি তো হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছিলাম। দরকার ছিল।

—আমিও খুঁজছিলাম। তবে হন্যে হই নি। তা ছাড়া এক ঠাকুমাকে বাদ দিয়ে আমাদের বাড়ির আর সব মহিলাকে আমি কখনো না কখনো চাকরি করতে দেখেছি।

এক সন্ধ্যেয় লাটু-বাটুদের হোটেলের ছাদে দাঁড়িয়ে অতনু ভেবেছিল, কবিতা আর অঙ্ক একরকম বুঝি? এখন কবিতার খবর রাখে না, কেবল অফিসের খাতায় হিসেব কষতে-কষতে দিন কাটে। দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়, বছর ঘুরে আসে। প্রথম শান্তনুর খোঁজ পেয়ে পলাশ যখন একজন রিপোর্টারকে পাঠিয়েছিল, সঙ্গে গিয়েছিল এযাদি, তার আড়াই বছর পরে এক রাত্তিরে আচমকা নিজেই বাড়ি ফিরে এল শান্তনু। অতনু খেতে বসার একটু আগে কেউ দরজার কড়া নাড়ল। উঠে গিয়ে অতনু দরজা খুলতেই দেখতে পেল, শান্তনু, তার দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ হাসবার চেষ্টা করছে। অতনুর গলা দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে এল, মা!

ঘরের আলোয় এলে দেখা গেল, শান্তনু নিজে থেকেই ফিরে এসেছে, তবে নিজেকে প্রায় শেষ করে এনেছে। দুদিন যেতে বোঝা গেল, নিজেকে প্রায় শেষ করে এনেছে শরীর-মন দুদিকেই।

প্রথমে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা। পরে পলাশ ভালো হাসপাতালের ব্যবস্থা করল। আবার আনা হল বাড়িতে। এক-একবার ডাক্তার বদল, ওষুধ বদল। শরীর সারল না, শুধু বাড়িতে থাকায় সাফসুফ হল। মন মাঝেমাঝে সুস্থ থাকে হয়তো, মাঝেমাঝেই তলিয়ে যায় অন্ধকারে। এইভাবে প্রায় তিন বছর।

সোমার বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠি এল অফিসের ঠিকানায়। কী করা যায়? মন ভালো নেই। তাই যাবার ইচ্ছে নেই অতনুর। নূপুরকে অফিসে টেলিফোন করতে বিকেলে ছুটির পর একটা

চেনা চা-খানায় যেতে বলল।

বিকেলে সেই চায়ের দোকানে গিয়ে বসতে নূপুর বলল, সোমার বিয়ে হচ্ছে এক জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে। আমি বিয়ে করব উড়োজাহাজের ক্যাপটেনকে।

ঠিক মুটিয়ে না গেলেও বয়েস বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূপুর চেহারায় একটু ভারিক্কি হয়েছে, অথচ মেজাজ ভারিক্কি হয় নি। এখনো কথা বলে কলেজের ক্যান্টিনে বসে আড্ডার মেজাজে।

অতনু বলল, আমার বিয়েয় যাবার উৎসাহ আসছে না। তোমরা সবাই মিলে কোনো উপহার দিলে আমার চাঁদাটাও নাও।

—অন্যদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় নি। আমি একা একখানা শাড়ি দেব। আজই কিনব। শাড়িটা কেনার সময় তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

—তাহলে শাড়ি কেনার টাকার মধ্যে আমি আধাআধি কনট্রিবিউট করি?

—তা হবে না। শাড়ির দাম আমি একা দেব। তুমি তো যাবে না, উপহার পাঠাতে হবে না। চেপে যাও। অফিসের ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছে কেন সোমা? তোমার বাড়ি চেনে না? ধরে নাও চিঠি পাও নি।

বিয়ের কনে সোমা বাড়িতে এসে নেমন্তন্ন করতে পারে নি বলে অতনু তাকে অপরাধী করছে না। বাড়ি চেনে, সম্ভবত বাড়ির ডাকের ঠিকানাটা জানে না। তার অফিসের ঠিকানা তো কাগজ দেখলেই পাওয়া যায়। তাই অফিসে চিঠি পাঠিয়েছে। সুতরাং নূপুরের অভিযোগ অতনু মোটেই আমল দিল না। আর নূপুরও তো নেহাতই কথার কথা বলেছে। তবে নূপুর টাকা নিতে রাজী না হওয়ায় ভালোই হল। চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে অতনু মনে মনে বলছিল, নূপুর, তুমি কি জান যে আমি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যতটা পেতে পারি সব ধার নিয়েছি শান্তনুর চিকিৎসার জন্য? তুমি কি জান পলাশদা আর এষাদি কত টাকা খরচ করেছে তার হিসেব নেই? অথচ শান্তনুর চিকিৎসার ভার বইবার সব দায়িত্ব কি আমার নয়? আমি একা পারি না বলে কি আমার খারাপ লাগে না?

এসব অবশ্য মুখে বলল না। খালি চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখল।

নূপুরের কোলের ওপর একখানা বই। খবরের কাগজে মলাট দেওয়া। অতনু কিছু বলতে হবে বলে বলল, কী বই?

এতক্ষণে নূপুরের খেয়াল হল।—আরে, তোমাকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। পলাশদার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। তাঁর নতুন বই, আমাকে একখানা দিলেন। ময়লা হবে বলে অফিসে গিয়ে খবরের কাগজ জড়িয়েছি।

বইখানা হাতে নিয়ে মলাট উলটে অতনু দেখল লেখা রয়েছে, নূপুরকে—পলাশদা। তারপর আজকের তারিখ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লিখেছে, অথচ কী সুন্দর হাতের লেখা, যেন পাকা কমার্শিয়াল আর্টিস্টকে দিয়ে লিখিয়েছে! এ বই অবশ্য অতনুকে দিয়েছে দুদিন আগেই। অতনু পড়ে নি, পরে হয়তো পড়বে। এখন ঝকঝকে নতুন বই রেখে দিয়েছে শান্তনুর ঘরে। যদি শান্তনু পাতা ওলটায়, যদি পলাশের লেখা বলে পড়ে!

নূপুর তার স্বাভাবিক ভঙ্গি বদলে, লাজুক-লাজুক মুখ করে বলল, বইখানা দেবার সময় পলাশদা কী বলছিলেন জান?

—কী?

—বলছিলেন, একখানা বই লিখবেন, তার উৎসর্গপত্রে ছাপা থাকবে—শ্রীমতী নূপুর ও

শ্রীঅতনু রায়চৌধুরীর করকমলে।

ভাগ্যিস প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধার করার কথা আজ অন্তত বলে নি অতনু! বললে নূপুরের এই লাজুক-লাজুক মুখ দেখা যেত না।

অনুপমার কথা

এতক্ষণে নিঃসাড় হয়েছে বাড়িটা। এখন আর হন্তু পায়ে চলাফেরা-ওঠানামা নেই, হাঁক-ডাক চাপা কথা গুঞ্জন হাসি-গান নেই। কত রাত হবে? তিন ঘরের আলো নিভেছে, সিঁড়ির, ছাদের। সারা বাড়ি অন্ধকার। এত চুপচাপ যে এখন এই খালি মেঝেয় কান পাতলে মাঝেমাঝে আরশোলার মৃদু খসখস, ইঁদুরের সতর্ক নড়াচড়া অনুভবে ঘা দেয়।

সারাদিনের এক-গা ক্লান্তি নিয়ে অনুপমা ভেবেছিলেন, বুঝি ঘুম আসবে। ঘুম এল না। পাখাটা ঘুরছে। পাতলা অন্ধকারে ঝোলানো একফালি কাপড় উড়ে-উড়ে গাঢ় ছায়া দোলাচ্ছে। পাখাটা জোরে ঘুরলেও গরম যাচ্ছে না। এমন ঘুমহীন একটু-একটু জ্বালাধরা চোখে মাঝ-রাত্তিরে এপাশ-ওপাশ করা কী যে কষ্ট! অজস্র বিচিত্র ভাবনা আর স্মৃতি অগুনতি ঢেউয়ের মতন এসে আছড়ে পড়ে। কী করে সেই আঘাত থেকে মনকে বাঁচিয়ে ঘুমোয় মানুষ! অথচ এক সময়ে অনুপমাও কত সহজে কেমন চমৎকার ঘুমিয়ে পড়তেন। ঘুম না হওয়ার অসুখ তাঁর ছিল না। এই অসুখটা তাঁকে দিয়েছে শান্তনু।

কোণের দিকে খাট রয়েছে। সেখানে যান নি। মেঝেয় শুয়েছেন একটা বালিশ নিয়ে। মেঝেয় বিছানা পাতেন নি, ইচ্ছে হয় নি। ক্লান্তি। হয়তো শুধু ক্লান্তি নয়। আরো কোনো নিগূঢ় কারণে তাঁর সব ইচ্ছের মৃত্যু হয়েছে। যেমন তাঁর বাঁ দিকের ঘরে আজ বিকেলের চায়ে মিশিয়ে দেওয়া মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ওষুধে প্রায় মৃত্যু হয়েছে শান্তনুর। অনুপমা নিজেই চায়ে ওষুধ মিশিয়েছেন। মেশাবার সময় হাত কাঁপে নি।

তিনতলায় একসারিতে তিনখানা ঘর। রাস্তার দিকে একচিলতে টানা বারান্দা। এই ঘর থেকে বারান্দায় যাবার দরজা দিয়ে তাকালে রাস্তার ওপারে একটা নিঃসঙ্গ আলো। তার তলায় একটি নলকূপ। হাতলটায় একদা সবুজ রঙ ছিল, এখন এক বিন্দু নেই। কালো অমসৃণ ঠাণ্ডা লোহায় আলো পড়ে। হাতলটা হয়তো সত্যিই ঠাণ্ডা। অন্তত বারান্দা থেকে তাই মনে হয়। আজ এই ঘরের মেঝে এতটুকু ঠাণ্ডা হল না।

অনুপমার ঘামে ভেজা শরীর। পাখার হাওয়া পাচ্ছেন। তবু ঘাম শুকোচ্ছে না। তাঁর চারদিকে ঘরের কঠিন মেঝে প্রসারিত। যদিও ঘরের কোণে কোণে কত কী অগোছালো পড়ে আছে, তাঁর দুপাশে অনেকখানি জায়গায় নিখাদ শূন্যতা। তাঁর একটি মেয়ে নেই। তৃতীয়বার মা হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর জীবনে এল না। তাহলে হয়তো একটি মেয়ে আসত তাঁর কোলে। আজ এখন পাশে ঘুমন্ত মেয়ে থাকলে তার গায়ে আলতো করে একটা হাত রাখলে বোধ হয় কোনো আশ্রয় পেয়ে যাওয়ার স্বাদ মিলত।

উঠে বসতে অনুপমা বুঝলেন, অবসন্ন শরীরের ভাঁজে-ভাঁজে যন্ত্রণা। বারান্দায় এসে রাস্তার ওপারে নিঃসঙ্গ আলোটার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন একটু, সরে গিয়ে শান্তনুর ঘরের খোলা দরজার চৌকাঠে হাত রেখে ভেতরে তাকালেন। খাট নয়, মেঝেয় বিছানা পাতা। খাট সব সময় নিরাপদ নয়। সেই বিছানায় একটি জ্যামিতির নকশার মতন শান্তনু ঘুমিয়ে আছে, যেন

মরে গেছে। আবছা অন্ধকারে বুকের ওঠানামা চোখে পড়ে না। শীর্ণ অথচ দীর্ঘ হাতপা গুটিয়ে এনে কয়েকটা কৌণিক বিন্দু তৈরি করেছে। রাস্তার দিকের জানলার গায়ে একটা টেবিল, একটা চেয়ার। টেবিল, শেলফ, আলমারিতে অগুনতি বই। কেউ ছোঁয় না। অন্ধকারে কেউ সোজা, কেউ সামান্য কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অতীতের কটাক্ষের মতন। ওই টেবিলের পাশে ওই চেয়ারে শান্তনু কতকাল বসে না। আর কি ঘুম ভাঙবে শান্তনুর? চা চাইবে কাল সকালে? বিয়ে হয়েছিল বিশ্বানের সঙ্গে। অনুপমার তাই তো প্রার্থনা ছিল। বিয়ের সময় তাঁর বয়েস ছিল কুড়ি-একুশ। তখনই জানতেন, লক্ষ্মী-সরস্বতী দুজনকে একসঙ্গে পাওয়া যায় না। তাঁর সরস্বতীকেই বেশি পছন্দ ছিল। নিজের লেখাপড়া তেমন এগোয় নি। একটি পাস করেছিলেন। কলেজ দূরের জেলা শহরে। সেখানে আর যাওয়া হয় নি। কলেজে পড়া হল না বলে দুঃখ ছিল। একান্তে ভাবতেন, নিজের অপূর্ণ বাসনা মেয়ের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ করবেন।

বিয়ের আগে গ্রামে ছিলেন। বিয়ের পরেও অবশ্য প্রায় আট বছর গ্রামেই কেটেছে। শ্যামল-রঙ গ্রামের মেয়ে, অমন বিশ্বানের থেকে বেশি কী আশা করতে পারতেন অনুপমা? নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবতী মনে হয়েছিল। বাপেরবাড়ি-শ্বশুরবাড়ি দুটোই গ্রামে। এক নদী দুই গ্রামের কোল ঘেঁষে বয়ে গেছে। স্টিমারে যাওয়া-আসা। শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন খুড়শ্বশুর, খুড়শাশুড়ি আর তাঁদের ছেলেমেয়ে। তাঁদের সঙ্গেই কেটেছে প্রায় আট বছর। তাঁরা কেউ খারাপ মানুষ ছিলেন এমন অন্যায় ভাবনা কোনোদিন অনুপমার মনে জায়গা পায় নি।

যে-লোকটির সঙ্গে বিয়ে হল সে থাকত এই শহরে। ছুটিছাটায় গ্রামে যেত। এই শহরের এক মেসে থাকত। অনেক পরে দূর থেকে সেই মেসবাড়িটা একদিন দেখিয়েছিল অনুপমাকে। দেখে তিনি হেসেছিলেন।—ওই পোড়ো বাড়িতে মানুষ থাকে!

লেখাপড়ায় ইতি হয়ে যাওয়ার চার-পাঁচ বছর পরে বিয়ে। সেই চার-পাঁচ বছরে সব রকম ঘরের কাজে নিপুণ হয়ে উঠেছিলেন। মধ্যবিত্ত ঘরের আর পাঁচটা মেয়ে যেমন হয়। কতরকম রান্না শিখেছিলেন মার কাছে। অথচ যে-লোকটার সঙ্গে বিয়ে হল সে থাকত শহরের মেসে। মেসের ঘরে ঘুম। খাওয়া মেসের ঠাকুরের রান্না। লোকটা বলত, মাছের ঝোলে কেবল জিরে ভাসে। মিহি করে বাটে না। মেসে রাত্তিরেও ভাত। অত রুটি কে করবে? লোকটা রাত্তিরে ছাত্র পড়িয়ে দেরিতে ফিরত। খাবার ঢেকে রাখত ঠাকুর। থালায় ঠাণ্ডা ভাতের তলায় ডাল আর তরকারির ঝোল মিশে যেত। অত বাটি কোথায়?

এসব শুনে কষ্ট পেতেন অনুপমা। কষ্ট বেড়ে যেত, যখন দেখতেন, অমন লম্বা লোকটা বড় রোগা, গায়ের মাখনের মতন রঙে ফ্যাকাশে রক্তহীনতার আভাস, বয়েস তিরিশ পেরোতে না পেরোতে চুল উঠে কপাল চওড়া হয়ে যাচ্ছে। তুলনায় নিজের ভালো স্বাস্থ্যের জন্য অনুপমা প্রায় লজ্জা পেতেন।

তখনো এই শহর নিজের চোখে দেখা হয় নি। শুধু গল্প অনেক শুনেছিলেন। খুব লোভ ছিল এই শহরে চলে আসবার। যাকে স্বপ্ন বলে, মনের মধ্যে তার বাসা। এই শহরে চলে এসে লোকটাকে নিয়ে নিজের সংসার পাতবেন। তা যদি না হল তাহলে এত ঘরের কাজ, মার কাছে এত বিচিত্র রান্না চার-পাঁচ বছর ধরে কেন শিখেছিলেন?

লোকটা কেবল বলত, আর একটু গুছিয়ে নিই। এখানে তোমার এত বড় বাড়িতে, এমন খোলামেলায় থাকা অভ্যেস। এখনই তুমি শহরে গেলে কারো আপত্তি করার কিছু নেই অবশ্য। কিন্তু আমি তোমাকে এমন ঘুপসি ঘরে নিয়ে তুলব, তুমি হাঁপিয়ে উঠবে।

গুছিয়ে নিতে লোকটার প্রায় আট বছর লাগল। তখন শান্তনুর ছয় আর অতনুর দু বছর।

যখন নতুন বউ, তখন সম্ভব হয় নি। পরে, পুরনো হয়ে গেলে, প্রথমে এক ছেলে এবং আরো পরে দুই ছেলে নিয়ে বারবার স্টিমারে বাপের বাড়ি। বাবা তখন নেই। মার সঙ্গে পরামর্শ।—কী করি মা? জোর করে শহরে চলে গেলে কি নিন্দে হবে?

অতনু হবার আগে খুব আশা করেছিলেন, এবারে তাঁর মেয়ে হবে। ছেলে হল দেখে সবাই খুশী। একমাত্র অনুপমা খুশী হতে পারলেন না। মেয়ে না থাকলে সাজাবেন কাকে? ফ্রকের এত কাটছাঁট, ছোট বড় সব বয়েসের মেয়ের চুলের এত রকম বিন্যাস কেন শিখেছিলেন? বিশ্বানের ছেলেরা বিশ্বান হবে অনুপমা ধরেই নিয়েছিলেন। মেয়ে না থাকলে তাঁর নিজের অপূর্ণ বাসনা কে পূর্ণ করবে?

এই শহরে যতকাল আছেন, এই বাড়ি, এই ফ্ল্যাট। কোনোদিন বাড়ি বদল করতে হয় নি। একবার মাত্র, সর্বনাশ হয়ে যাবার পর, ছেলেমানুষ শান্তনু যখন চাকরির জন্য তোলপাড় করছে চারদিক, শুকনো মুখে বাড়ি ফিরে জোর করে হেসে বলছে—ভাবনার কিছু নেই মা, একটা ব্যবস্থা হবেই—সেই সময়ে অনুপমা একবার ভেবেছিলেন, দুই ছেলেকে নিয়ে শহরের বাস উঠিয়ে আবার গ্রামে চলে যাবেন? গ্রামের বাড়িতে, জমিজমায় তাঁর তো অংশ ছিল। যান নি, মন সায় দেয় নি। গেলে শান্তনুর পড়াশোনায় বাধা পড়ত। জেলা শহরের কলেজের হস্টেলে ছেলেকে রাখার টাকা কোথায় পেতেন অনুপমা? এই বাড়িতেই এতকাল কেটেছে, বাকী দিনগুলোও কাটবে।

প্রথম দিন অতনুকে কোলে নিয়ে এই ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলেন। সে তালা খুলে শান্তনুর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ঘরদোর দেখে নাও অনু।

অনুপমার ঠোঁট চাপা। চট করে দাঁত দেখা যায় না। ওই দিন বোধ হয় ঠোঁট আলগা হয়ে গিয়েছিল, ঈষৎ হাঁ করে পলকহীন চোখে ঘরদোর দেখছিলেন। কোথায় ঘুপসি? সদ্য চুনকাম-করা তিনখানা ঘর। মাঝখানেরটি তো বেশ বড়, রাস্তার দিকে বারান্দা। শান্তনু প্রথম দিনই তার ঘর বেছে নিয়েছিল। চার বছর বয়েস হতে না হতে শান্তনুর বিছানায় রাতে ঘুমোতে যেত অতনু। এখন যেটা অতনুর, সেটা ছিল বসবার ঘর। সেই লোকটার ছাত্ররা এসে বসত।

গুছিয়ে নিতে অনুপমার সাত দিনের বেশি লাগে নি। মাঝে মাঝে এক শান্তনুর ছাড়া আর কারো অসুখ-বিসুখের বালাই ছিল না তেমন। ডাক্তার-ওষুধের জন্য টাকা ঢালতে হয় নি। স্কুলে ছেলেদের মাইনে লাগত না। দু-চারখানা ছাড়া বই কিনতে হত না। প্রকাশকরা স্কুলে এসে বই দিয়ে যেত। লোকটা অসুখে না ভুগলেও রোগা ছিল। ক্লান্ত হয়ে ফিরলে তার মুখ ফ্যাকাশে দেখাত। সকাল-সন্ধ্যেয় ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে বেড়ানো অনুপমা জোর করে বন্ধ করেছিলেন। কেবল বাড়িতে দু-চার জন আসত পড়তে।

ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে ট্রেনে চেপে দূরে বেড়াতে গিয়েছিলেন মাত্র একবার। সেবার তার লেখা উঁচু ক্লাসের একখানা অঙ্কের বই কয়েকটা স্কুলে পাঠা হয়েছিল। কিছু বাড়তি টাকা দিয়েছিল প্রকাশকরা। সেই একবারই পুরী বেড়াতে যাওয়া। অনুপমা চেয়েছিলেন, একখানা ঘর ভাড়া করে থাকবেন, নিজে রান্না করবেন। সে রাজী হয় না।—ওখানে গিয়েও বাজার আর রান্না নিয়ে থাকলে বেড়াবে কখন, অনু?

সমুদ্রের ধারের এক হোটেলে অনেকগুলো টাকা দিতে হয়েছিল সেবার।

মন্দিরে পুজো দিয়ে অনুপমা বলেন নি, ঠাকুর, আমার কষ্টে দিন যায়, আমাকে সচ্ছলতা দাও! তাঁর সব থেকে বড় প্রার্থনা ছিল, ঠাকুর, সবাইকে সুস্থ রেখো!

তবে?

দশ বছর এই বাড়িতে তার সঙ্গে ঘর করেছেন অনুপমা। তাঁর জীবনের সব থেকে সুখের

দশটা বছর। অন্য অনেক মেয়ের জীবনে কত জটিলতা থাকে। কারো কারো খবর অনুপমা এক-আধটু রাখেন। তাঁর নিজের দিনরাত তো সরলরেখায় চলছিল। কুড়ি-একুশ বছর বয়েস পর্যন্ত মা-বাবার ছায়ায়। বিয়ের পর আট বছর শুধু একটা চাপা দুঃখ। এই বাড়িতে এসে তেমন সচ্ছলতা না থাকলেও স্বচ্ছন্দ দশটা বছর। যাকে নিয়ে ঘর করা সে রোগা ছিল, ক্লান্ত হলে তাকে এক-এক সময় নীরক্ত মনে হত। তবু তার মধ্যে কোনো মারাত্মক রোগ লুকিয়ে থাকলে কখনো জানান দেয় নি কেন? রোগের স্পষ্ট লক্ষণ কেন প্রকাশ পায় নি?

দুদিন বিছানায় পড়ে রইল না। বউ-ছেলেকে তার বিছানার পাশে রাত জাগিয়ে রাখল না। স্কুলে গেল সুস্থ মানুষ। বিকেলে বুকে হাত চেপে কষ্টে তিনতলায় উঠে এসেই বড় ঘরের খালি মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। এক মিনিট। তারপরই সে আর রইল না এই ঘরে। সে প্রথমে যেমন করে শুয়ে পড়েছিল, হাতপা গুটিয়ে এনেছিল, এখন পাতলা অন্ধকারে প্রায় তেমনভালে বাঁ পাশের ঘরে শুয়ে আছে শান্তনু।

কাল সকালে কখন ঘুম ভাঙবে শান্তনুর?

শান্তনু অনুপমার প্রথম। পঁয়ত্রিশ বছর আগে তার আসার বার্তা যখন তাঁর শরীরে সঞ্চারিত, একজন তাঁর চোখমুখে সুখের আভাস দেখে ঠোঁঠে মৃদু হাসি বুনেছে। আজ বিকেলে শান্তনুর চায়ে মাত্রাছাড়া ঘুমের ওষুধ মেশানো দেখবার জন্য বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয় বলত, এত কূটকৌশল তুমি জান অনু! তুমি বড় কুটিল।

শুধু কুটিলতা নয়, তাঁর কিছুই কেউ আর দেখবে না। চারদিকের করুণা, বিরক্তির দৃষ্টি থেকে তাঁর বাঁচবার, শান্তনুকে বাঁচাবার, সতর্ক সাধনা কেউ দেখবে না। আজ এখন এই দুঃসহ গরমে যদি এক আশ্চর্য তীক্ষ্ম শীতের অনুভব মনের গভীরতম প্রত্যন্ত থেকে উৎসারিত হয়ে সারা গায়ে ছড়িয়ে যায়, যদি দাঁতের চাপেচাপে কাটা কাঁপা ঠোঁটের রক্ত দেখেন, তিনি একাই দেখবেন। আর কেউ নেই যার চোখ সেই দৃশ্যে আহত হবে।

অনুপমা সবই তো দেখলেন, এখন একাই সব দেখেন। একটু একটু করে চাপ-চাপ অন্ধকার শান্তনুর মনের মধ্যে কেমন করে জীবন্ত হয়ে উঠল, কখন সেই জীবন্ত অন্ধকারের অসংখ্য বিপরীতমুখী ফণা শান্তনুর মনের মধ্যে পরস্পরকে ছোবল মারল, সব তিনি দেখেছেন। সেই ছোবলের বিষে নীল হয়ে যাওয়ার আগের শান্তনুকেও তিনি দেখেছেন, দুচোখ মেলে দেখেছেন। ওর বাবার মতন রোগা অথচ অত্যন্ত ঋজু, দীর্ঘ। সারা গায় কী এক কঠোর সংকল্পের টানটান বুনুনি। কখনো খুশিতে খুব কাছে ঘন হয়ে এলে ওপর দিকে চোখ তুলে তাকাতে হত, মনে হত, সামনেই এক দুরন্ত দুর্লঙ্ঘ্য চড়াই। দলে দলে বন্ধুরা আসত-যেত। অনেক বছর আগে কম ভাড়ায় পাওয়া স্কুলমাস্টারের এই বাড়িতে নির্জনতা দুর্লভ ছিল। কী এক উৎসবে মেতে থাকত দিনরাত। সেই উৎসব নাকি ছড়ানো ছিল সারা দেশে। শান্তনুর ছোট একখানা ঘর নাকি চার দেয়ালের একটি পরিমিত পরিসর ছিল না, অনেক বড় কিছুর অংশ ছিল। বহুকাল থেকে টুঁটি চেপে ধরা সাঁড়াশির মতন আঙুল সেই উৎসবে নাকি শিথিল হয়ে খসে পড়বে। কখনো কখনো কথা বলতে একেবারে ভুলে যেত শান্তনু, সোজাসুজি অনুপমার মুখের দিকে তাকিয়েও অন্য কিছু, দূরের কিছু দেখত। আবার এক-একদিন রোদে পুড়ে-পুড়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে স্রোতের মতন বেয়ে এসে বাড়ি ফিরেও ক্লান্ত হত না, যেন খুশির হাওয়ায় উড়ত।

সেইসব দিনে অনুপমা কখনো চুপচাপ রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থেকে, কখনো টুকিটাকি কাজ নিয়ে তাঁর প্রায় নিরন্ন সংসারে বরং পূর্ণ ছিলেন। শান্তনু তাঁকে পুরো সাদা থান পরতে

দেয় নি, ঈষৎ কুণ্ঠিত ঘন চুল কেটে ফেলতে দেয় নি। তখনো তাঁর কাপড়ে লাল ছাড়া অন্য রঙের পাড়, তখনো তাঁর মাথায় লম্বা চুল। এসব বদলালে শান্তনু যদি ক্ষেপে যায়?

সেইসব দিনে হয়তো অনেক রাত করে ফিরেছে শান্তনু, তখন অতনুর এক ঘণ্টা ঘুম হয়ে গেছে। এখনকার মতন নিঃসাড় বাড়িতে একা খেতে বসে হঠাৎই বলেছে, আর কিছু রাঁধ নি মা?

অনুপমা সামান্য চমকে উঠেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছেন, ভালো লাগছিল না। আমার শরীর ভালো নেই আজ।

ততক্ষণে শান্তনু সতর্ক হয়ে গেছে। বাঁ হাতের আঙুল নিজের ছোট ছোট চুলের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে শব্দ করে হেসে বলেছে, তোমার পাপের ভয় নেই মা? এই বয়েসে মিথ্যেভাষণ! সত্যি কথা বললে বলতে—তোর বাবার কখানা স্কুলপাঠ্য বই আর তোর দুটো ছাত্রের দক্ষিণায় এর বেশি পারি না।

তারপরই মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছে, আর কিছুদিন পরে তুমি এমন সব সুখাদ্য সাজিয়ে দেবে যে একঝলক দেখেই জিভে জল এসে যায়। এসব ব্যাপারে আমার তো আবার একটু বনেদী রুচি। তুমি তো সবই জান মা।

স্কোয়াশ কোম্পানিতে চাকরি করতে করতে—যখন অবস্থা খানিক বদলেছে—একদিন এসে বলল, কী করি বলো তো মা? অতনু তো পাস করতে পারল না। আমার কাছে পড়বে না। আমাকে মোটেই মানে না। আমার সময়ই বা কোথায়? আমার নিজের পড়াটড়া এক-আধটু তো আছে। অতনুর একটু পড়াশোনা না হলে শেষ অব্দি তোমাকেই জ্বালাবে।

সেই দিনই অতনুর ঘরে দুজন কথা বলছিল। কথা ভেসে আসছিল অনুপমার কানে।

শান্তনু বলছিল, আমি একজনের সঙ্গে কথা বলেছি রে। তিনি সপ্তাহে দুদিন তোকে একটু অঙ্ক দেখিয়ে দিতে রাজী। আমার খুব চেনা। সামান্যই দিতে হবে।

অতনু রুক্ষ গলায় বলছিল, তুই টাকার কুমির হয়েছিস বুঝি? যে-গরিব মাস্টার স্বর্গে গেছে, তার ফেল-করা বাজে ছেলের জন্য প্রাইভেট টিউটর!

রান্নাঘরে অনুপমা একটুক্ষণ প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকলেন। ওরা যদি টের পায় তিনি ওদের কথা, বিশেষত অতনুর নোংরা কথাগুলো, শুনতে পাচ্ছেন!

সহ্য করতে না পেরে অনুপমা পরে শান্তনুকে বলেছিলেন, তুই তনুর এইসব ক্ষমা করিস কী করে? ও কী বলছিল আমি শুনেছি।

শান্তনু ম্লান হাসছিল।—ফেল করার লজ্জায় ওর মাথার ঠিক ছিল না। না হলে ও কি অমন বিশ্রীভাবে কথা বলে?

কলেজে চাকরি হল শান্তনুর। অতনুও পাস করল তিন বারের বার। এই বাড়িতে দু-তিন বছর আবার একটু সুখের হাওয়া। মনে হচ্ছিল, সামনে চেনা সড়ক। সেই লোকটা না থাকলেও এই বাড়ির আর সবাই ওই সড়কটা ধরে চলবে এটাই ঠিক ছিল। সবাই কি আর বইয়ের পাতা মুখস্থ করে বিদ্বান হয়?—অতনুর এই মন্তব্য শুনেছেন অনুপমা। শুনে রাগ হত। ওই সময়ে ভাবছিলেন, কথাটা তো মিথ্যে নয়। তবু যা হোক, অতনু কলেজে ঢুকেছে। যদিও পরে দুম করে পড়াশোনা একেবারে ছেড়ে দিল।

কপালে নেই, কঠিন মুঠোয় মনকে পিষে মারতে হয় না এমন সুখ বেশি দিন অনুপমার কপালে টেঁকে না। শান্তনু এক রাত বাড়ি ফিরল না। আগে থেকে না বলে কোনো দিন রাত্তিরে বাড়ির বাইরে থাকে নি। বেশ রাত পর্যন্ত ছটফট করে অতনু ঘুমে ডুবল। কিছু বলার নেই।

সেই দিনই প্রথম অফিসে কাজ করে এসেছে। অনুপমা সারা রাত জেগে দুই ক্লান্ত হাতের ঝাপটায় আতঙ্ক তাড়াতে চাইলেন। ভোরের দিকে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে ভাবলেন, চারদিক আর একটু ফরসা হলে, কেউ দরজা নাড়বে, শান্তনু নিজে না আসুক তার বন্ধুদের একজন আসবে। এসে জানাবে, কোনো সভা অথবা মিছিল থেকে আরো অনেকের সঙ্গে শান্তনুকে পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। এইরকম অস্পষ্ট আশঙ্কা ছিল অনুপমার। চার দিকে আলো ফুটল। কেউ বাইরে থেকে হাত রাখল না দরজার কড়ায়।

অতনু তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গেল। অনুপমা বারান্দার রেলিংয়ে বুক চেপে রাস্তার দিকে ঝুঁকে রইলেন।

পলাশ এল, এষা। সারা দিন ছোটাছুটি। কোথাও কোনো খবর নেই। শেষ বিকেলের ডাকে অনুপমা চিঠি পেলেন। চিঠিতে দুটো লাইন। শান্তনু গ্রামে যাচ্ছে কিছু দিনের জন্য। কলেজের চাকরি আর নয়।

বলা যায়, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতন, জীবনের নকশা কুচিকুচি হয়ে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার মতন। তবু একেবারেই কি অভাবনীয়? এরকম যে হতে পারে, কখনো কি ভাবাই যায় নি? এরকম একটা কিছু যে হতে পারে তার জন্য কারো, এমন কি অনুপমার মনও, অজানতে তিলে তিলে তৈরী হচ্ছিল না—একথা জোর দিয়ে বলা যায়? বরং সেই দিনই প্রথম শান্তনুর কী এক সংকল্প অনুপমার চোখে খানিকটা স্পষ্ট আদল পায় নি?

এষা যখন দূরের জেলা-শহর থেকে ঘুরে এসে জানাল, হাসপাতালে নেই, দেখা হয় নি, তখন অনুপমা ভেবেছিলেন, শান্তনু বেঁচে নেই। বেঁচে না থাকারই সামিল। অতগুলো বছর পার করে যে-শান্তনু ফিরে এল সে অন্য মানুষ। ওই সময় থেকে অনুপমার ঘুম না হওয়ার অসুখের বাড়াবাড়ি।

ভেসে যেত সব, যদি না অমন অবিশ্বাস্য বদল হত অতনুর। অনুপমা অবাক হয়ে দেখেছিলেন, প্রায় আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর আরো একটি ছেলে আছে। মার আদল অতনুর, বাবার গায়ের রঙ। মার আদল হলেও বলিষ্ঠ শরীর। শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেছিল এই ঘরসংসার।

এ সবের জন্য অতনুর প্রতি অনুপমা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ? ছিঃ! এমন কথা কখনো ভাবতে আছে? অবাধ্য ছোট ছেলেকে তো মায়েরা বেশি ভালোবাসেন। অনুপমা কেন অন্য মায়েদের থেকে আলাদা হবেন? তিনি আলাদা হতে চান নি।

একটা কথা মনে হয়েছিল অনুপমার। এখনো কথাটা মন থেকে পুরো খারিজ হয়ে যায় নি। কাউকে কখনো বলেন নি কথাটা। এষাকে বলতে পারতেন। বলেন নি। অতনু পড়াশোনা ছেড়ে অমন ব্যস্ত হয়ে পলাশের অফিসে চাকরিতে না ঢুকলে কি শান্তনু সব দায়িত্ব ফেলে উধাও হয়ে যেতে পারত? আর ওইভাবে চলে না গেলে তো এমন শান্তনুর প্রেত হয়েও ফিরে আসত না। এই কথাটা সেই লোকটাকে বলা যেত। তাকে বললে সে মন্তব্য করত, এত ভাবনাও তোমার মনে আসে, অনু! তনু চাকরি না নিলেও যা হওয়ার তা হতই।

চেষ্টা অনেক হয়েছিল। অতনু তার কম বয়েসে, কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে, অনুপমা খুশী হতে পারেন এমন কাজ হয়তো কমই করেছে। কিন্তু শান্তনু ফিরে আসার পর অতনু তার সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলতে চেয়েছে। তা ছাড়া পলাশ, এষা। অনেক চেষ্টাই তো তারা করল। হল না তো কিছুই।

শান্তনু ফেরার পর বিভিন্ন সময়ে ছেলের মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে নেড়েচেড়ে দু-চারটে খুচরো খবর অনুপমা বের করে নিয়েছিলেন। যেমন ধরে আনার প্রথম রাত্তিরেই কী

এক স্বীকারোক্তি আদায়ের আশায় তাকে ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে কুপিয়েছে। অমন রোগা শরীরে চামড়ায় ঢাকা উঁচিয়ে থাকা হাড়-পাঁজর ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে কুপিয়েছে। ভাবলে যেন কেমন লাগে, অনুপমার ভাবনা ফতুর হয়ে যেতে চায়। নিজের শরীরের ভাঁজে-ভাঁজে কাঁটা বিঁধে আছে মনে হয়।

একটু-একটু করে শান্তনুর হাতপায়ের জোর কমেই যাচ্ছে। অন্তত অনুপমার তাই ধারণা। এক-একদিন কথা বলতে প্রায় ভুলে যায়। শুয়ে-শুয়ে মরা মাছের মতন চোখ করে চেয়ে থাকে। কখনো আবার খুব জ্বলজ্বলে দেখায় শান্তনুর চোখ। অনুপমার মুখের দিকে তাকিয়েও তাঁকে দেখে না, অন্য কিছু খোঁজে। একটু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে কপালে আর নাকের ডগায় ঘামের বিন্দু জেগে ওঠে। শক্ত কিছু ধরবার জন্য হাত বাড়ায়। কোনো কোনো দিন মাথার মধ্যে সাপগুলো কিলবিলিয়ে উঠলে কর্কশ, অশোভন কথা বলে, যা সুস্থ শান্তনুর মুখে আগে কখনো শোনা যায় নি।

ফেরার পর প্রথম প্রথম এক সময়ের কলেজের সহকর্মীরা ছাত্রছাত্রী জুটিয়ে দিয়েছে। ঘরে বসে তাদের পড়িয়েছেও দু-এক মাস। অনুবাদ করার জন্য বিদেশী বই এনে দিয়েছে পলাশ। আস্তে আস্তে এসব চেষ্টাও ফালতু হয়ে গেছে। তারপর কিছুই আর বাকী থাকে নি। এখন তো তেমন কোনো চিকিৎসাও আর হচ্ছে না। এখন কেবল নিয়মমাফিক ঘুমের ওষুধ। শুধু ঘুম পাড়িয়ে রাখা। শান্তনু সমর্থ হাত মুঠো করে কোনো জিনিস ধরে রাখতে পারে নি। ধরে রাখবার মতন অনুপমাও হাত বাড়িয়ে কিছু পেলেন না। এখন দিন-মাস-বছর তাঁর একটিই সাধনা। প্রতিদিনের অপমানের ভোঁতা তলোয়ারের আঘাত থেকে শান্তনুকে বাঁচাবার সাধনা।

সবাই তো এষা-পলাশ-অতনু নয়। একটু একটু করে অনিবার্যভাবে শান্তনুর দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া সবার কাছে সমান নয়। তাদের মুখ কখনো করুণায় বড় বেশি নরম, কখনো বিরক্তিতে বিকৃত। তাদের করুণা আর বিরক্তির দৃষ্টি ধারালো ছুরির মতন অনুপমার শরীর-মনের পরতে-পরতে কেটে বসে যায়। দুঃসহ জ্বালায় ঠোঁঠের ওপর দাঁতের কঠিন চাপ পড়ে। তখন শান্তনুকে বিষ দিতে পারেন অনুপমা। হাত কাঁপে না।

কত দূর থেকে সপ্তাহ দুই আগে এষা একখানা চিঠি লিখেছে অনুপমাকে। অতনুকে অভিনন্দন জানিয়েও চিঠি পাঠিয়েছে এষা। আজ সকালের ডাকেই এসেছে। সে-চিঠির কথা নয়; দু সপ্তাহ আগে এষার অন্য এক দীর্ঘ চিঠি পেয়েছেন অনুপমা। খামের মধ্যে শান্তনুকে লেখা একটা টুকরো চিঠিও ছিল। অনুপমা এই প্রথম এষার চিঠি পেলেন না, আগেও পেয়েছেন। তবে এমন বড় চিঠি আগে লেখে নি।

কতবার যে পড়েছেন এষার এবারের চিঠিখানা! প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। শান্তনুকে লেখা ছোট চিঠিও পড়ে ফেলেছেন। না পড়বার কী আছে? লুকোচুরির কোনো অবকাশ যখন আর নেই? শান্তনুকে লিখেছে, তোমাকে পর পর দুখানা চিঠি দিলাম। একখানারও উত্তর পেলাম না। কেন? তুমি কি আমার চিঠি পড়ই নি? জানি, তোমার লিখতে কষ্ট হয়। হাত কাঁপে। তবু দু-চারটি কথা লিখে পাঠিও। নিজে বেরোতে না পারলে অতনুকে দিও। খামে ভরে অতনু ডাকে দেবে। এত দূরে একা পড়ে আছি। তোমাদের চিঠি পেলে তাই নিয়ে আমার কয়েকটা দিন কেটে যায়।

অনুপমাকে লেখা বড় চিঠিখানা এই ঘরেই আছে, ঘরের কোণে খাটের বিছানার তলায়, শিয়রের দিকে। বারবার পড়েছেন, আবারও হয়ত পড়বেন।

এষা লিখেছে, কলকাতা ছেড়ে দূরে কেন চলে এলাম আপনাকে বোঝাতে চেয়েছি এক-

আধটু। চলে আসবার আগে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে বেশি কথা বলি নি। বেশি কথা বলার দরকার ছিল না। জানতাম, একটু আভাসেই আপনি সব বুঝতে পারবেন। ভয় ছিল, এ নিয়ে আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে গেলে আপনি বাধা দেবেন, একা এতদূর আসতে বাধা দেবেন। আমার বাড়িতেও একই ব্যাপার। তাঁরাও সহজেই বুঝেছিলেন, আমি কেন সরে যেতে চাই। এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাঁরা বাধা খাড়া করতেন। তাই চুপচাপ অফিসের ক্ষমতাবানদের ধরাধরি করছিলাম, আমাকে বোম্বাইয়ের অফিসে বদলী করুন।

আপনি আমার সবই জানেন। কত বছর আগে থেকেই জানেন। আপনার কাছে কী লুকিয়ে রাখব? শান্তনুকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা অনেক হয়েছে। অতনু চেষ্টা করেছে, পলাশদা। আপনি দেখেছেন, আমিও চেষ্টা করেছি আমার সাধ্যমতন। কাছে থেকে ওর একটু-একটু করে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া আমি আর দেখতে পারলাম না। আমি সেই দিন কলকাতা ছেড়ে দূরে চলে যাওয়ার স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম যেদিন আমি ওর ঘরে প্রায় দু ঘণ্টা বসেছিলাম অথচ ও আমার সঙ্গে মোটেই কথা বলল না। শুয়েই রইল, উঠেও বসল না বিছানায়। কেবল চেয়ে থাকল, অসহায় লক্ষ্যহীন দৃষ্টি। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন, শান্তনু আজকাল মাঝেমাঝে মুখে তালা দিয়ে রাখে, কথা বলা ভুলে যায়। আপনাকে এসব দেখতে হয়, দেখেও তার কাছে থাকতে হয়। আপনি দূরে কোথাও চলে যেতে পারেন না। আমি জানি, আপনি কাছে আছেন বলে শান্তনু আজও আছে। সব সহ্য করে আপনি ওকে আঁকড়ে থাকেন, আগলে রাখেন। আপনি যা পারেন আমিও তা পারব, এমন অহংকার আমার নেই। এই যে দূরে চলে এসেছি, এতেই প্রমাণ হয়, আমি পারি নি।

শান্তনুকে দেড় মাসের মধ্যে দুখানা চিঠি দিয়েছি। একখানারও জবাব পাই নি। রোজ অফিসে যাওয়ার আর ফেরার সময় চিঠির বাক্স হাতড়ে কিছু না পেয়ে কী যে খারাপ লাগে! সবার খবর দিয়ে আপনি অন্তত তাড়াতাড়ি আমার চিঠির উত্তর দেবেন। এই খামের মধ্যে শান্তনুকেও একটুকরো চিঠি দিলাম।

আরো কত যে লিখেছে এষা! অনুপমা ভাবছেন মুখস্থ, তবু পুরোপুরি কি মুখস্থ হয়? মাঝারি চিঠি তো নয়, পাতলা কাগজে পাতার পর পাতা।

লিখেছে, প্রথম যখন আপনাকে দেখলাম, আমার বয়েস কম। আপনার কাছে আমার লজ্জা ছিল, ভয়ও পেতাম আপনাকে। বাইরে থেকে আপনাকে বেশ গম্ভীর দেখায়। একটা বিকেলে শান্তনুর ঘরে বসে খানিক গল্প করে আমি ভাবলাম, রান্নাঘরের দিকে যাই। শান্তনু চায়ের জন্য চেঁচাচ্ছিল। তাকে চুপ করতে বলে আমি আপনার কাছে গেলাম। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না বিকেলের চা যদি আমি করি আপনি খুশী হবেন কি না। রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে আপনি বললেন, সুজি রান্না করব। তুমি ঝাল সুজি খেতে ভালোবাসো, না মিষ্টি সুজি? শানুর ঝাল সুজি পছন্দ, তাই জানতে চাইছি।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, ঝাল সুজি আমার দারুণ লাগে! নিজেকে সংযত করলাম। অতটা উচ্ছ্বাস হয়তো আপনার খারাপ লাগবে। আস্তে করে বললাম, আমি দুরকমই ভালোবাসি।

আপনি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ একেবারে তুই করে বললেন, এদিকে সরে আয় তো। আলোয় এসে দাঁড়া। তোর থুতনিতে ওটা কিসের কাটা দাগ? বাচ্চাবেলায় খুব দুরন্ত মেয়ে ছিলি বুঝি?

সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে নিলাম, আমি যা চেয়েছি, তা পেয়েছি। আপনার খুব কাছে আমার আসন পাতা হয়ে গেছে।

এসব খুঁটিনাটি কেন আমার এমন মনে আছে? একা-একা এইসব নিয়েই তো আছি। চাকরিটা করতে হয়, করি। মন ডুবে থাকে যা রেখে এসেছি তার ভাবনায়। আপনি একদিন হিসেব করে বলেছিলেন, অতনুর থেকে আমি বয়েসে মাত্র কয়েক মাসের বড়। অথচ আমার কী হয়েছে, আমার মনে হয়, কত বয়েস হয়ে গেছে আমার, অতনুরা আমার কাছে কত ছেলেমানুষ!

বাবার কাছে চিঠিতে মিথ্যে লিখেছি। তাঁকে লিখেছি, এখানে একরকম ভালোই আছি। আপনার কাছে স্বীকার করি, অনেক বলেকয়ে বদলী হয়েছিলাম, অথচ এখন টিঁকতে পারছি না এখানে। এমন নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না মানুষ। আমার এমন চেনা কেউ নেই যার সান্নিধ্যে খানিক সময় কাটতে পারে। বুঝতে পারছি, ভুল করেছি।

একবার ভাবলাম, শান্তনুকে কিছু দিনের জন্য এখানে নিয়ে আসি। হাওয়াবদল হবে। এখানকার ডাক্তার দেখাব। শান্তনু এলে আপনাকেও আসতে হয়। কিন্তু এখানে আমার একখানাই খুব ছোট ঘর। একটি পরিবারের ফ্ল্যাট-সংলগ্ন। কমন বাথরুম। এখানে নিয়ে এলে শান্তনুর এবং আপনারও অসুবিধে হবে। শান্তনুকে এত দূর নিয়ে আসা, রেখে চিকিৎসা করানো, আবার কলকাতায় নিয়ে যাওয়া, এত টাকাই বা আমার কোথায়? তা ছাড়া শান্তনু আসতেই রাজী হবে না। ও আমার চিঠিরই জবাব দেয় না! চিঠি পড়েও না হয়তো।

আবার অফিসারদের ধরাধরি শুরু করেছি। বলছি, আমাকে কলকাতায় বদলী করুন। হয়তো হবে, তবে একটু সময় লাগবে। মোটেই বেশি দিন তো হয় নি এখানে এসেছি। আবার কলকাতায় যাবার বায়না ধরে আমি নিশ্চয়ই যাকে বলে লোক হাসাচ্ছি।

দূরে এসে আমি টিঁকতে পারছি না। ফিরে যেতে চাই। কাছ থেকে চোখ খুলে সব দেখতে চাই, কান পেতে সব শুনতে চাই।

আপনার কাছে এত কথা লিখছি, চিঠি বড় হয়ে যাচ্ছে। কারো কাছে লিখতে পারাও যে একটা সুখ। আমি ভাবি, একমাত্র আপনাকেই এসব লেখা যায়। একমাত্র আপনি বুঝবেন, আমার কোথায় কষ্ট। আবার চিরকাল আমি কোন অধিকারে আপনার স্নেহ মমতা চাইব তাও তো বুঝি না!

খালি মেঝেয় অনুপমার মাথার তলায় কেবল একটা বালিশ। পাখা ঠিকই হাওয়া দিচ্ছে। তবু মনে হল, ঘামে ভিজে গেছে বালিশটা। অনুপমা বালিশটা উলটে নিলেন। এবার লম্বা চিঠির কথাগুলোর মাঝেমাঝে মুখের আদলটাও ভাসছিল তাঁর বোজা চোখের সামনে। দু-একবার থুতনির কাটা দাগটাও দেখতে পেলেন। বোজা চোখে সেই ম্লান মুখ লক্ষ্য করে অনুপমা মনে-মনে বললেন, এষা, মা আমার, তোকে যেখানে বসিয়েছি সেখানে আমি অন্য কাউকে টেনে আনব কেমন করে?

একটি মেয়ে এসেছে এ বাড়িতে, পরের মেয়ে। রজনীগন্ধার পাপড়ি-দলিত বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। ভালো মেয়ে, তার সম্বন্ধে অনুপমার অন্য কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু সে কেমন করে শান্তনুর প্রতি স্নিগ্ধ হবে? যখন সাপের সদ্য ডিমভাঙা শিশুদের মতন অজস্র অন্ধকারের ঢেউ শান্তনুর মনের মধ্যে ফণা তুলবে, ছোবল মারবে, তখন কেমন করে তার প্রতি স্নিগ্ধ হবে নূপুর? এখন সেই মেয়ে অতনুর ঘরে ঘুমিয়ে আছে, ওদের বন্ধুদের কয়েক ঘণ্টা আগের হাসি, গান, বেসামাল দাপাদাপিতে রজনীগন্ধার পাপড়ি-দলিত বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

শান্তনুর ঘুম কি আর কখনো ভাঙবে?

অনুপমার ডান দিকের ঘরে আজ অতনুর ফুলশয্যা, অতনু আর নূপুরের ফুলশয্যা। ওদের কোনো সাড়া নেই; ফিসফিস কথা কানে আসছে না। এতক্ষণে ওরা ঘুমিয়েছে সন্দেহ নেই।

ওঘরেও নিশ্চয়ই পাখাটা ঘুরছে নিঃশব্দে! ওঘরের রজনীগন্ধার ঝাড় এমন কৃপণ কেন? একটুও গন্ধ উড়ে আসছে না।

আজ দুঃসহ গরম। এখান থেকে গঙ্গা বেশি দূর নয়। জলের ওপর দিয়েও বাতাস বইছে না বুঝি। অথচ বোধ হয় রাত শেষ হয়ে আসছে। এই সময়ে গঙ্গায় স্টিমারের ভোঁপু কী গম্ভীর! সেই ভোঁপুর টানে অতলে নেমে যাবার মতন স্রোত আর নেই অনুপমার মনে। শুধু এক-গা ক্লান্তি। বিকেলে শান্তনুর চায়ে মাত্রাছাড়া ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেবার সময় তাঁর হাত কাঁপে নি। সন্ধ্যে থেকে, সন্ধ্যের আগে থেকেই হয়তো, অতনু-নূপুরের বন্ধুরা আসতে শুরু করবে ভেবেছিলেন। ওই নিষ্ঠুরতার দরকার ছিল। নিজেকে পুড়িয়ে শক্ত করার জন্যও ওই নিষ্ঠুরতার দরকার ছিল। অনেক সহ্য হয় অনুপমার। শুধু সহ্য হয় না শান্তনুর দিকে তাকিয়ে আর তার কোনো কথা শুনে কারো মুখ করুণায় নরম হবে, বিরক্তিতে বিকৃত। শান্তনুকে বিষ দিতে পারেন, তার অপমান অসহ্য।

আজ অতনুর ফুলশয্যা। অনুপমা অতনুর মা। আজকের বিশেষ সন্ধ্যেয় অতনু-নূপুরের বন্ধুদের পেয়ে, নূপুরের বাপের বাড়ির কয়েকজনকে পেয়ে তিনি নিশ্চয়ই খুশী হয়েছেন। খুশী না হওয়া অন্যায়, খুব অন্যায়, অমার্জনীয়। অতনু যদি বলে, তোমার দুঃখ আছে জানি, কিন্তু আমি কী করেছি মা! তুমি মুখ ফিরিয়ে থাকলে আমি কেমন করে আনন্দ করি, কেমন করে বাঁচি? অনুপমা কোনো জবাব দিতে পারেন না। কী জবাব আছে?

দুপুরের পরে শান্তনু শুয়ে-শুয়ে ছেলেমানুষি খুশী-খুশী গলায় বলেছিল, আজ কত আনন্দের দিন, না মা? আমি কিন্তু অভ্যর্থনায় থাকব। ওদের বন্ধুরা এলে হেসে-হেসে বলব, এসো, এসো।

পাশে দাঁড়ানো অতনু কেমন অসহায় চোখে অনুপমার দিকে তাকিয়েছিল। তখনই তিনি বুঝেছিলেন, কী করতে হবে। তাঁর একটুও হাত কাঁপে নি।

সন্ধ্যের মুখেই পলাশ এসেছিল। একা। বউ নিয়ে আসে নি। বউ নিয়ে, বউ যখন নতুন, একবারই মোটে এসেছে এবাড়ি। পলাশ এসে প্রথমেই শান্তনুর ঘরে ঢুকেছিল। অসময়ে শান্তনুর ঘুমের বহর দেখে সে কি কিছু ভেবেছে? অনুপমার মুখের দিকে স্থির চোখে চেয়ে ছিল একটুক্ষণ। পলাশ কি বুঝেছে, আজ অনুপমা কেমন চা খাইয়েছে শান্তনুকে?

রাস্তার ওপারে একটি নিঃসঙ্গ আলো। তার তলায় একটা নলকূপের অমসৃণ হাতলে আলো পড়েছে। এক সময়ে সবুজ ছিল নলকূপটা এবং তার হাতল। সেই সবুজ রঙ এখন নেই। কয়েক বছর আগে একদিন এবাড়ির দোতলার একটি বউ তিনতলায় উঠে এসে দরজা থেকেই বলেছিল, কী কষ্টের কথা দিদি! আপনার বড়ছেলের নাকি মাথার দোষও হয়েছে!

শান্তনু তার ঘরে ছিল। বউটির মন্তব্য যদি শুনতে পায়! একটিও কথা না বলে অনুপমা বউটির বিষণ্ণ মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করায় বিশ্রী শব্দ উঠেছিল। তখন শান্তনুর অসুখ এতটা বেড়ে যায় নি। অনুপমা ভেবেছিলেন, অসুখটা সাময়িক, সেরে যাবে। শান্তনু, তাঁর প্রথম, কখনো ওই অসুখে তলিয়ে যেতে পারে? সেরে না ওঠা পর্যন্ত ছেলেকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন আশা ছিল।

এখন অতনুর ঘরে যে মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে তার মুখের ওপর কেমন করে দরজা বন্ধ করে দেবেন অনুপমা? প্রথম প্রথম সে করুণায় বড় নরম হবে, তারপর আসবে বিরক্তি। কিছু হয়তো বলবে না মুখ ফুটে, কিন্তু ক্রমে তার দৃষ্টিতে স্বচ্ছ হবে শান্তনুর, অনুপমার অপমানের মৃত্যু। এই সংসারে একটু-একটু করে একদিকে অতনু-নূপুর, আর একদিকে শান্তনু-অনুপমার

মাঝখানে একটি অনিবার্য বিবর্ণ দেয়াল সবিনয়ে মাথা তুলবে। কিসের জোরে সেই দেয়াল অনুপমা ভেঙে ফেলবেন?

এই ঘরখানাই সবথেকে বড়। কোণে কোণে কত কী অগোছালো পড়ে আছে। এই ঘরখানাই সবথেকে অগোছালো। এক সময়ে এই ঘরখানাই সব থেকে ছিমছাম ছিল। সেই লোকটা সব জিনিস গুছিয়ে রাখা পছন্দ করত। অথচ চলে যাবার আগে এই সংসারের কিছুই গুছিয়ে রেখে যায় নি। এখন ঘরের দেয়াল ঘেঁষে নানা পাত্রে অথবা মেঝেয় ছড়ানো ময়দা, মসলা, কলা-পাতা, চায়ের পেয়ালা, মিষ্টির হাঁড়ি থেকে বেয়ে পড়া চিটচিটে রস, পিঁপড়ে, আরশোলা, দু-একটা ইঁদুরও হয়তো। ছাদেও আজকের জন্য টাঙানো ত্রিপলের ছাউনির তলায় কত জিনিস ছড়ানো পড়ে আছে। কাল সকালে শান্তনুর ঘুম ভাঙার আগে কোনো কিছুতে আর হাত দেবার সাধ নেই অনুপমার।

দেয়াল ঘেঁষে এত জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও অনুপমার চারপাশে কঠিন মেঝেয় প্রসারিত শূন্যতা। সারা বাড়ি নিঃসাড়। এত চুপচাপ যে খালি মেঝেয় বালিশটার ওপর কান পাতলে মাঝেমাঝে আরশোলার মৃদু খসখস, আর সম্ভবত ইঁদুরের সতর্ক নড়াচড়া অনুভবে ঘা দেয়। দুঃসহ গরম! অনুপমার এক-গা ক্লান্তি, জ্বালা-ধরা চোখ, স্বেদসিক্ত শরীরের ভাঁজে-ভাঁজে যন্ত্রণা। ঘুম আর এল না, তাঁর ঘুম সহজে আসে না, বাকী রাতটুকু এভাবেই কাটবে। আসলে এটাই তাঁর কষ্ট। ঘুম এলে, সহজে ঘুম এলে, এই আপাতনিথর রাত্রির এত বিচিত্র রহস্যময় ধ্বনি অনুভবে ঘা দিত না, এমন বিরামহীন ভাবনার ঢেউ আছড়ে পড়ত না মনে।

শেষরাতের কিছু সংলাপ

শান্তনুর ঘরের দিকে একটা জোর শব্দ হল। দরজার ভারী পাল্লা দেয়ালে আচমকা ঘা মারার শব্দ। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে, তিনবার মাত্র পা দিয়ে মেঝে স্পর্শ করে অনুপমা বারান্দায় এলেন। দেখলেন, দরজার একটা কপাটের ওপর কাত হয়ে ভাঙাচোরা রেখায় শান্তনু দাঁড়িয়ে আছে, বলা যায়, শান্তনুর প্রেত। রাস্তার আলোর আভাস এসেছে জায়গাটায়। শান্তনু তার বুজে-আসা চোখ জোর করে মেলে রেখে অনুপমার দিকে তাকাল। ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে আচ্ছন্নতা ঠেলে ফেলে দাঁড়িয়ে থাকার প্রাণান্তিক কসরতে, সর্বাঙ্গের কৌণিক খাঁজে-খাঁজে শান্তনুকে মনে হল, একটি তীব্র অভিযোগের করুণ মুদ্রা। অনুপমার পেছনে, শান্তনুর সামনে, রাস্তার ওপারের নিঃসঙ্গ আলোটা। ঘরের মেঝেয় বিস্রস্ত বিছানায় শান্তনুর অস্পষ্ট দীর্ঘ ছায়ার পাশে অনুপমার অস্পষ্ট ছায়াও প্রসারিত হল।

গলায় অভিযোগের ঝাঁজ এনে শান্তনু বলছিল, আমি কিছু দেখলাম না মা। অতনু আর তার বউকে আজ কেমন দেখাচ্ছে, আমি দেখলাম না। আলো নিভিয়ে আমার ঘর অন্ধকার করে রেখেছ!

অতনু নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, সঙ্গে নূপুর। ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে গিয়ে অতনু দুহাত বাড়িয়ে শান্তনুর ঘুমজড়ানো শিথিল শরীরের ভার টেনে নিল। ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন অনুপমা।

সচেতন প্রচেষ্টায় মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে শান্তনু বলল, ওদের গলায় মালা নেই কেন মা? ওদের বন্ধুরা কোথায়? আমি তো কিছুই দেখলাম না!

প্রত্যেকটি কথায় একটু বেশি জোর দিয়ে অতনু বলল, তুই সব দেখেছিস। তুই তো সব

দেখাশোনা করলি। তুই না দেখলে কি এ বাড়িতে কিছু হতে পারে? নিমন্ত্রিতরা চলে গেছে, এখন রাত প্রায় শেষ। আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আয়, ঘুমো।

অতনুর কথা সত্যি ভাবল শান্তনু। তাকে বিশ্বাস করল পুরোপুরি। খুশির হাসিতে দুসারি দাঁতের সুচারু বিন্যাস চিকচিক করে উঠল।

ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে অতনু তাকে শুইয়ে দিল। আলো নিভিয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। বাধ্য শিশুর মতন শান্তনু চোখ বুজল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ঘুমিয়ে পড়েছে। আবছা অন্ধকারেও দেখা গেল, হাসির রেশ জড়িয়ে আছে ঠোঁটে।

নিজের ঘরে যাবার সময় অনুপমাকে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে অতনু বলে গেল, তুমি শুয়ে পড়ো মা। ঘুমোতে চেষ্টা করো একটু।

খালি মেঝেয় প্রসারিত শূন্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে বসলেন অনুপমা। শান্তনুর ঘরে রাস্তার ওপারের আলোটার আভাস একটু বেশি যায়, এঘরে কম। চারদিক তাকিয়ে ঘরের আদলটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন না। ভোরের আলোও ফোটে নি। এখনো তাহলে অল্প একটু রাত বাকী আছে। এইমাত্র যা ঘটল তারপরও ঘুমের কথা ভাবা বাতুল কল্পনা। তার বেশিক্ষণ অন্ধকারে মুখ ঢেকে রাখা যাবে না। সকাল হবে। অনেক দিন আগে কম ভাড়ায় পাওয়া এই তিনঘরের সব বিশৃঙ্খলা, সব দৈন্যের ওপর রোদ পড়ে চোখে কাঁটার খোঁচা দেবে। কাল সকালে কেমন করে সহজ স্বাভাবিক মুখ দেখাবেন নূপুরকে? এইমাত্র শান্তনু অশ্লীল কিছু করে নি। তবু আজ এই সময়ে অমন নাটুকে দৃশ্য কেমন লাগবে নূপুরের?

ওদের ঘরে আলো নিভেছে। মৃদু গলায় কথা বলছে ওরা। কী কথা বলছে? শান্তনুর বিষয়ে কী বলছে ওরা? নূপুর কী বলছে? বারান্দায় যতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, একটি কথা বলে নি। এখন মৃদু গলায় অতনুকে কী বলছে? হয়তো বলছে নূপুর, রাতদুপুরে নাটক ভালো লাগে না! বলে পাশ ফিরে শুয়েছে, আর বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে অতনুর মুখ।

অনুপমা উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। এঘর থেকে স্পষ্ট কিছু শোনা যায় না। অন্য কাউকে শোনাবার জন্য কথা বলছে না ওরা। ইচ্ছে হল সন্তর্পণে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলের ঘরে আড়ি পাতবেন? ছিঃ! কিন্তু এই বসে থাকাও অসম্ভব মনে হল। মনের গভীর প্রত্যন্ত থেকে এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণ শীত উৎসারিত হয়ে ছড়িয়ে গেল সারা গায়। নিচের ঠোঁটের ওপর কয়েকটা দাঁতের কঠিন চাপ যখন আর কোনো যন্ত্রণার অনুভব জাগাল না, পায়েপায়ে বাইরে বারান্দায় এলেন অনুপমা। এত কালের ন্যায়-অন্যায়, শোভন-অশোভনের চেতনার গলা টিপে মারলেন। অতনুর ঘরে তাঁর ছায়া না পড়ে এমনভাবে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। ওদের নরম গলার কথা স্পষ্ট হল।

কেমন আশ্চর্য উত্তাপে গলে গিয়ে নূপুর বলছে, শোনো, একটা কথা বলছি।

—বলো।

—আমারও তো একটা চাকরি আছে। এখন না হয় ছুটি নিয়েছি এক মাস। দুজনেরই চাকরি আছে বলে এখন আমাদের সামর্থ্য বেশি। জানি, দাদাকে সুস্থ করে তোলার জন্য তোমরা অনেক চেষ্টা করেছ। তুমি, এযাদি, পলাশদা। এসো দুজনে মিলে আর-একবার, শেষবারের মতন, দাদার জন্য চেষ্টা করে দেখি।

রজনীগন্ধার পাপড়ি-দলিত বিছানায় অতনুর কাছে ঘন হয়ে এসে এইসব কথা বলছে নূপুর? অনুপমার রাতজাগা জ্বালাধরা চোখে কিসের অসহ্য তাপ লাগল। প্রায় টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

মাথার ওপরের পাখার হাওয়া ছাড়াও কোথা থেকে একটু ঝিরঝির বাতাস আসছে, খানিক ঠাণ্ডা হয়েছে মেঝেটা। বসে মেঝেয় হাত রেখে অনুপমা ভাবছিলেন, শান্তনুকে বাঁচাতে, সুস্থ করতে পারবে না নূপুর। তার এই মুহূর্তের সংকল্পের টানটান সুতো আলগা হয়ে যাবে। সব সময় শান্তনুর প্রতি এমন স্নিগ্ধ থাকতে পারবে না নূপুর, পারা যায় না। মেঝেয় গা এলিয়ে মাথার তলায় বালিশটা টেনে নিয়ে অনুপমা মনে মনে বললেন, সব সময় শানুর প্রতি এমন নরম থাকতে পারবি না জানি, তবু, নূপুর, আমার তো মেয়ে নেই, তুই আমার মেয়ে। এখন থেকে শানু-তনুর মতন তুই আমাকে মা বলে ডাকিস।

সমাপ্ত

সমালোচনা

Freedom Struggle and Anushilan Samiti. *Ed. by* Buddhadeva Bhattacharyya. Anushilan Samiti, 1979

'ফ্রীডম স্ট্রাগল অ্যান্ড অনুশীলন সমিতি' গ্রন্থটির প্রয়োজন ছিল। বিপ্লবীদের গোপন কার্যক্রমের একটি অবধারিত ফল হয়, এ'দের কর্মধারার ইতিহাস প্রায়ই বিকৃত হয়ে যায়, কিছুটা সজ্ঞানে কিছুটা অজ্ঞানে। ১৯০২ সাল থেকে যে অনুশীলন সমিতি ভারতবর্ষের বিপ্লবের সাধনা করে এসেছে এবং প্রায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত সেই সাধনায় বিরত থাকে নি, সেই অনুশীলন সমিতির ইতিহাসের প্রথম খণ্ড পাওয়া গেল। ১৯৭৬ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে প্রাক্তন বিপ্লবীরা মিলিত হন সমিতির ৭৫ জন্মবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি হিসেবে। তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টার এই একটি সুফল, গ্রন্থটির প্রকাশ।

তবে যথেষ্ট আন্তরিকতা না থাকলে এইসব চেষ্টা প্রায়ই লোকদেখানো চেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায় লিখেছেন, নীহাররঞ্জন রায়। ইনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনুশীলন সমিতির জন্ম ১৯০২, এ'র ১৯০৩। পেশায় ইনি ঐতিহাসিক। আশা করা গিয়েছিল, প্রথম যুগের ইতিহাস কিছু বিশদভাবে কিছু স্পষ্টভাবে এ'র কাছ থেকে পাওয়া যাবে এবং অবিসংবাদিতভাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ইনি আর পরিশ্রম স্বীকার করতে নারাজ। ইতিহাস লিখতে, এবং এমন কিছু সুদূরের ইতিহাস নয়, যদি লেখক it seems কথাটি ঘনঘন ব্যবহার করেন, তাহলে 'ধরি মাছি না ছুঁই পানি' জাতীয় ইতিহাসে আস্থা বজায় রাখা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। গ্রন্থটির ২৩ নম্বর পাতায় যেমন দেখা যাচ্ছে লেখক সাতবার এই কথাটি ব্যবহার করেছেন ; তা ছাড়া, it is not clear, presumbly, for some reason or other জাতীয় বাক্যবন্ধও পর্যাপ্তভাবেই ছড়িয়ে আছে ওই একই পাতায়, অনুশীলন সমিতির ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠাবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে।

অনুশীলন সমিতির ১৯০৫-১৩ সালের ইতিহাস লিখেছেন সরলকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার একটি কলেজের রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক। ১৯১২-১৯-এর ইতিহাস লিখেছেন প্রদ্যোতকুমার ঘোষ। এ'দের রচনা তথ্যসন্ধিৎসু, ঐতিহাসিকের, তবে পরনির্ভর। ১৯২০-২৯-এর ইতিহাস লিখেছেন তারাপদ লাহিড়ি, যাঁর জন্ম সেই ১৯০২ সালেই এবং যিনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমসাময়িক ইতিহাসের বহু বিকৃত তথ্যের পরিচয় দিয়ে ইনি প্রকৃত ঘটনার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই অংশটিতেই।

একটা নমুনা দেওয়া যাক। অসহযোগ আন্দোলনে অনুশীলন সমিতির সমর্থন ছিল কি ছিল না? ডেভিড এম. লসি তাঁর 'বেঙ্গল টেররিজম অ্যান্ড মার্কসিস্ট লেফট' গ্রন্থে লিখেছেন, ছিল না। এই সাহেবের তথ্যের উৎস অতুলচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় 'স্টাডিস ইন দি বেঙ্গল রেনেশাঁস' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গোপাল হালদারের প্রবন্ধ 'রেভলিউশনারি টেররিজম' প্রবন্ধটি। অরুণচন্দ্র গুহও 'অরবিন্দ অ্যান্ড যুগান্তর' গ্রন্থে অনুরূপ বিকৃত তথ্য দিয়েছেন, বলছেন তারাপদ লাহিড়ি। এই কথা বলে তিনি বলছেন, গান্ধীর অহিংস নীতিতে অনুশীলন সমিতির আস্থা ছিল না, কিন্তু অসহযোগে সমিতি যোগ দিয়েছিল। তারাপদ লাহিড়ি কিন্তু তার কোন

তথ্য দেন নি। যে তথ্য দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে, তা হল অসহযোগ-পরবর্তী ছাত্র আন্দোলনে অনুশীলন সমিতির কিছু সদস্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ফলে গোপাল হালদার বা অরুণ গুহ তারাপদ লাহিড়ির বৃত্তান্তকে বিশেষ আমল দেবেন বলে মনে হয় না।

বরং অনুশীলন সমিতির সঙ্গে হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পর্ক বিষয়ে তারাপদ লাহিড়ি যথার্থভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে এইচ. এইচ. হেল তাঁর পোলিটিক্যাল 'ট্রাবল ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে, বিপানচন্দ্র তাঁর 'দি আইডিওলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অব দি রেভলিউশনারি টেররিস্টস ইন নর্দার্ন ইন্ডিয়া' প্রবন্ধে জে. এন. বাজপেয়ী তাঁর একটি প্রবন্ধে, অরুণচন্দ্র গুহ তাঁর গ্রন্থে, নির্মলা যোশী তাঁর প্রবন্ধে, ডেভিড লসি তাঁর গ্রন্থে, সকলেই ইচ্ছা করে বা অজ্ঞতার ফলে এইচ-আর-এ'র জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে ভুল তথ্য দিয়ে গেছেন। এইচ-আর-এ এবং গদর পার্টি অনুশীলন সমিতিরই শাখা, এ বিষয়ে লাহিড়ির তথ্য পর্যাপ্ত। অনুশীলন সমিতির কার্যক্রম বাংলার বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হিপুরার রাজ্মণবাড়িয়ার ডোলাচর গ্রামে নরেন সেন, যোগেশ চ্যাটার্জী, শচীন সান্যাল এবং প্রতুল গাঙুলি সমবেতভাবে এইচ-আর-এ'র প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্যে মনোমোহিনী, মতান্তর, হতাশা ইত্যাদি কোন ব্যাপার ছিল না।

অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুগান্তরের পার্থক্য ক্রমেই বড়ো আকার ধারণ করার একটি কারণ, রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব। অনুশীলনের সদস্যরা ক্রমেই সোস্যালিজমের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকেন, যুগান্তরের সদস্যরা জাতীয়তাবাদের দিকে। ভগৎ সিং এবং চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারি অ্যাসোসিয়েশন নাম নেয় এইচ-আর-এ। এই তথ্যও অনেক ঐতিহাসিক বিকৃতভাবে দিয়েছেন, বলেছেন মতান্তর হওয়ায় এই নতুন দলের উদ্ভব।

অনুশীলন সমিতি অবশ্য স্ট্যালিনের কমিউনিজমের অনুক্রমণ করতে উৎসুক ছিল না। সত্য হোক মিথ্যা হোক, অনুশীলন সমিতি দেখল, তারাপদ লাহিড়ির ভাষায়,

"Lenin gave stress upon the revolutionary character of national-liberation movements in the colonial and backward countries. Stalin reversed the idea and theorized that the bourgeois-led national-liberation movements were anti-revolutionary...Another reversal of policy of vital importance which characterized the Stalin regime was Stalin's theory of socialism in one country as against Lelin's idea of spreading communism into capitalist-imperialist states of Europe."

এই দুই কারণে কমিনটার্নের নির্দেশ মেনে চলা অনুশীলন সমিতির পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। জাতীয়তা আন্দোলনে যোগ না দেওয়া তার কাছে প্রায় আত্মহত্যার মতো। কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা না করাও তার কাছে দেশের মূল রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে ব্যবচ্ছেদের মতো। কমিনটার্নের বাইরে আর-এক ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করা তার সাধ্যের বাইরে, কেননা নেতারা ১৯২৩ থেকে ৩৮ পর্যন্ত জেলে জেলেই ঘুরছেন। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেওয়াও তার পক্ষে দুঃসাধ্য। তারাপদ লাহিড়ি এই পর্যায়ে এসে থেমে গেছেন। পরবর্তী পর্যায়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকব গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডটির জন্য।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

প্যারী কমিউন—অমলেন্দু সেনগুপ্ত। মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩। ১৯৮১। ১৯২ পৃ। মূল্য পনেরো টাকা।

ইতিহাসের বিশ্বমানচিত্রে বিপ্লবের পুণ্যপীঠ প্যারীর স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে পরবর্তী শতকে প্যারী মহানগরীতে যেসব বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটে, তার মধ্যে দ্বিতীয় প্যারী কমিউন (১৮৭১) সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারায় এক মহান আদর্শ এবং প্রেরণার উৎস হিসাবে বিবেচিত। উত্তরকালে সামাজিক আর রাজনৈতিক চেতনায় এবং চিন্তাপ্রবাহে দ্বিতীয় কমিউনের দান অসামান্য। রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের দ্যোতক যুগান্তকারী প্যারী কমিউন সমকালীন শিল্পবিপ্লবকেও ত্বরান্বিত করে। বিপ্লবের ইতিহাসে বিভিন্ন দিক থেকে প্যারী কমিউনের সমতুল নজির প্রায় বিরল। স্বল্পস্থায়িত্ব, সাফল্য আর ব্যর্থতা, মূলত দেশাভিমানমিশ্রিত বিচিত্র বৈপ্লবিক মতাদর্শ, প্রস্তুতি বিনা সর্বাত্মক সশস্ত্র অভ্যুত্থান, অশেষ আত্মত্যাগ এবং বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, এবং একটি ক্ষণস্থায়ী ঘটনায় অবিশ্বাস্য-সংখ্যক নরনারী আর শিশুর হত্যালীলার এরূপ একত্র সমাহার আর কোনো বিপ্লবে দেখা যায় না।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নেতৃত্ব আর আধিপত্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফ্রান্স এবং প্রুশিয়ার যুদ্ধ (১৮৭০) প্রথমোক্ত দেশটিকে গৃহযুদ্ধের পথে ঠেলে দেয়। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নাপোলেয়ঁ সেদাঁ রণক্ষেত্রে প্রুশিয়ার হাতে পরাজিত আর বন্দী হবার পরে প্যারী মহানগরী ১৮৭১ সালের ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চার মাস প্রুশিয়ার সেনা-বাহিনীর কাছে অবরুদ্ধ থাকে। ইতিপূর্বে একটি অস্থায়ী জাতীয় নিরাপত্তা সরকার গঠিত হয়েছিল (৪ সেপ্টেম্বর)। ফৌজী অধিকর্তা লিয়ঁ গ্যামবেতার নেতৃত্বে ফরাসীরা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। বামপন্থী বিপ্লবীরা ছিল যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাবার মস্ত সমর্থক, অন্যদিকে রক্ষণশীল আর রাজতন্ত্রীরা সমেত সারা দেশের গ্রামীণ অধিবাসীরা ছিল যুদ্ধের বিরোধী। শেষাবধি গ্যামবেতা যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যেতে যখন ব্যর্থ হন, তখন অবরুদ্ধ প্যারী জাতীয় অবমাননায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

প্রুশিয়ার নির্দেশে অস্থায়ী সরকার সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১)। তাতে রক্ষণশীল আর রাজতন্ত্রীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নবগঠিত জাতীয় সংসদের নেতা অ্যাদলফ থিয়ের বোর্দোতে সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন। বিজেতাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত হয়ে দাঁড়ায় প্যারীতে প্রুশিয়ানদের প্রবেশাধিকার। প্যারীবাসী সেদিন নীরবে সেই দৃশ্য সহ্য করলেও প্রুশিয়ানদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় অবমাননার গ্লানিতে ক্রোধে এবং প্রুশিয়া আর জাতীয় সংসদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণায় জনগণ বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হয়। প্রকাশ্য বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ প্রথম জ্বলে ওঠে (১৮ মার্চ) যখন বোর্দোর সেনা-বাহিনীর কাছে প্যারীর জাতীয় রক্ষীরা শান্তিচুক্তির শর্ত হিসাবে অস্ত্রসমর্পণে অস্বীকার করে। মহানগরীর লাখ দুয়েক শ্রমজীবীকে নিয়ে রক্ষী-বাহিনী গঠিত হয়েছিল।

নিরস্ত্রীকরণের আদেশ রক্ষীদের আত্মমর্যাদায় আর দেশাভিমানে আঘাত হানে। তার উপর ছিল শহরবাসীর নানা সমস্যা আর অসন্তোষ। বিশেষ করে যখন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের তাগিদে পূর্বে মকুব-করা বাড়িভাড়া আর ব্যবসাপত্তরের দায়দেনা মেটাবার আদেশনামা জারি হয়। সেইসঙ্গে জাতীয় রক্ষীদের বেতন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিক আর নিম্নবিত্ত স্তরের জীবনে নেমে আসে চরম দুর্বিপাক। বেকার-সমস্যা তখন ছিল এমনিতেই প্রবল। বোর্দোবাহিনীর অবরোধে সেই সময়ে শহরে খাদ্য আর জ্বালানিরও প্রচণ্ড অনটন দেখা দেয়।

সরকারি মেয়রদের হঠিয়ে প্যারীতে এক কেন্দ্রীয় সমিতি গঠনের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহ মূর্ত হয়ে ওঠে। রাজধানী প্যারীর বেগতিক অবস্থা দেখে থিয়ের জাতীয় সংসদের অধিবেশন প্যারীর পরিবর্তে ভার্সেইতে আহ্বান করেন। পূর্বতন রাজারা থাকতেন ভার্সেইতে। রাজধানী প্যারী থেকে সরকারি সেনাবাহিনীও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সংসদের সদস্যদের নিয়ে থিয়ের নিজেও শহর ত্যাগ করলেন। প্যারীর প্রশাসনে শূন্যতা পূরণ করে নবগঠিত কেন্দ্রীয় সমিতি একচ্ছত্র শাসনক্ষমতার অধিকারী হল (২৬ মার্চ)।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান, গ্যামবেতার রক্ষণশীল, সাধারণতন্ত্রী অস্থায়ী সরকারের ব্যর্থতা এবং থিয়ের সরকারের প্রুশিয়ার কাছে দেশের মর্যাদা বিকিয়ে দেওয়ার ক্রমিক পর্যায়ে রাজধানী প্যারীর ভার্সেইবিরোধী অসন্তোষ এবং দেশাভিমানের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন নব্যজাকোব্যাঁ গোষ্ঠীর নেতা চার্লস দেলেসক্লুজ এবং লুই ব্লাঁকি, গুস্তাভ ফ্লোরে প্রমুখ বিপ্লবী বামপন্থী নেতৃবর্গের ছোট ছোট গুপ্তদল এবং প্রথম আন্তর্জাতিকের প্যারী শাখা। দল এবং গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আদর্শ কিংবা ঐতিহ্যগত মিল ছিল না। মূলত প্রধান তিনটি দলের অন্যতম জাকোব্যাঁপন্থীরা চাইত পূর্বশতকের ফরাসী বিপ্লবের ধারা অনুসরণ করে কমিউনের নেতৃত্বে বিপ্লব পরিচালনা। নৈরাজ্যবাদী প্রুধঁর অনুগামীদের কাম্য ছিল একটি ফেডারেশনের অধীনে বিভিন্ন কমিউনের সংযুক্তি। আর ব্লাঁকিপন্থী সমাজতন্ত্রীদের কর্মপন্থা ছিল সশস্ত্র সংগ্রাম। কমিউনে জাকোব্যাঁ ধারায় মিশ্রিত ব্লাঁকিপন্থী মতাদর্শের প্রাধান্য থাকলেও জাতীয় রক্ষীদলের শক্তি ও সংখ্যায় পরিপুষ্ট পূর্বোক্ত কেন্দ্রীয় সমিতি বৈপ্লবিক একনায়কতন্ত্রের দিকে পা না বাড়িয়ে পৌরসমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচনের (২৬ মার্চ) ডাক দেয়। পৌরসমিতি ১৭৮৯ সালের প্রথম প্যারী কমিউনের অনুকরণে ঐতিহাসিক 'কমিউন' নামটি পরিগ্রহ করে।

উল্লিখিত নির্বাচনে, বলা বাহুল্য, বিপ্লবীরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করে। তাড়িঘড়ি একটি সংবিধানও রচিত হল। কমিউনে বিপ্লবীদের আধিপত্য সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক মোর্চায় যুক্ত অন্যান্য মতাদর্শের লোকও তাতে স্থান পায়। আইনসভা, বিচারবিভাগ ও কার্যনির্বাহী ত্রিবিধ ধারা কমিউনের অধীনে কেন্দ্রীভূত থাকে। এদিকে কেন্দ্রীয় সমিতিও যথাপূর্ব তার আধিপত্য বজায় রেখে চলে। কার্যত কিছু লোক সমিতি এবং কমিউন—উভয়েরই সদস্যপদে থাকায় কেন্দ্রীয় সমিতি সরকারি প্রশাসনে খবরদারি চালিয়ে যায়। রক্ষী-বাহিনীর অধিনায়ক এবং জাকোব্যাঁপন্থী দেলেসক্লুজের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব এসে পড়ে। কমিউনের বীরত্বপূর্ণ, কিন্তু ব্যর্থ প্রতিরক্ষা এবং শেষ লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেন দেলেসক্লুজ। মরিয়া হয়ে কমিউনার্ডরা যে হিংসা ও উগ্রতার আশ্রয় নেয় এবং বন্দিদের প্রাণনাশ এবং বহু প্রাসাদের ক্ষতি আর ধ্বংসের উন্মাদনায় মেতে ওঠে, তার চরম প্রতিশোধ তোলে শক্তিশালী ভার্সেই ফৌজ (২১-২৮ মে)। বিপ্লবের মন্ত্রগুরু রবার্ট লুই ব্লাঁকিকে থিয়ের অনেক আগে কারারুদ্ধ করেছিলেন। কমিউনার্ডরা চেয়েছিল প্যারীর আর্চ বিশপ দারবুয়ার জীবনের বিনিময়ে ব্লাঁকির মুক্তি। থিয়ের রাজি না হওয়ায় আর্চ বিশপকে হত্যা করা হয়। ব্লাঁকিকে থিয়ের দীর্ঘকাল পরে মুক্তি দেন। ভার্সেই বাহিনীর প্রবল আক্রমণে প্যারীর পতন ঘটে। প্যারী অভিযানের আগে ভার্সেই বাহিনী লিয়ঁ, মার্শাই, তুলোস ও আঁ এতায়েন শহর চারটির কমিউনকে পর্যুদস্ত করে। বলা হয়ে থাকে যে, প্যারী কমিউন আগে থেকেই ভার্সেই আক্রমণ করলে ফল হয়তো ভিন্ন রকমের হোত। যাই হোক, ভার্সেই বাহিনীর নৃশংস গণহত্যায় শিশু-নারীসহ হাজার বিশেক প্যারীবাসীর জীবনান্ত হয়। আটত্রিশ হাজার কমিউ-নার্ডকে বন্দী, আর সাত হাজার ব্যক্তিকে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

আলোচ্য বইটিতে লেখক শ্রীঅমলেন্দু সেনগুপ্ত বিশেষ পরিশ্রমসহকারে দ্বিতীয় প্যারী

কমিউনের আনুপূর্বিক ঘটনাবলী সীমিত পরিসরে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তবে আখ্যান-ভাগ বেশি হয়ে যাওয়ায় মূল ইতিহাসের ধারা অনুধাবন করতে পাঠকের একটু অসুবিধা হয়। ছোট ছোট বিস্তর কাহিনী আর উদ্ধৃতির মধ্যে প্রয়োজনীয় বহু বিষয় যে অনুক্ত থেকে গেছে, তার কিছুটা উল্লেখ করেছেন মুখবন্ধে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ফ্রান্স আর প্রুশিয়ার যুদ্ধের আগে প্যারীতে অনুষ্ঠিত এক বিরাট শিল্পপ্রদর্শনী এবং পরবর্তী কালের কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা থাকলে ভাল হত। নাপোলেয়ঁ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্যে যে "আতিশয্য ও অসঙ্গতি" আছে তার আভাস মুখবন্ধে পাওয়া যায়। বস্তুত, সাধারণ দৃষ্টিতে নাপোলেয়ঁর ক্ষমতালোলুপ, সাম্রাজ্যবিস্তারী চরিত্রকেই বড় করে দেখা হয়। কিন্তু অন্তরালে নাপোলেয়ঁর প্রগতিমূলক ঐতিহাসিক ভূমিকা চাপা পড়ে যায়। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন যে, নাপোলেয়ঁর বিভিন্ন দেশ জয়ের মধ্যে দিয়ে ইউরোপ সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্তি পায়, এবং যাজকশক্তি খর্ব হয়। গণতান্ত্রিক তথা উদারনৈতিক চেতনা এবং জাতীয়তার আবেগ দ্রুত প্রসার লাভ করে। ব্লাঁকি সম্পর্কেও লেখকের ইতস্তত অসংলগ্ন উক্তি সংগত নয়। লেখক নিজেই ব্লাঁকির প্রতি লেনিনের সশ্রদ্ধ মনের কথা উল্লেখ করেছেন। ব্লাঁকির কাছে স্বয়ং মার্কসও চিন্তার ক্ষেত্রে ঋণী ছিলেন।

প্রসারিত দৃষ্টিতে বস্তুনিষ্ঠ তথা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মূল্যায়নের পরিচয় বইটিতে খুব তেমন পাওয়া যায় না। বদ্ধমূল বিশেষ কোনো মতাদর্শের কাঠামোয় সবকিছুকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন লেখক। যেমন কমিউন সম্পর্কে কার্ল মার্কসের আনুপূর্বিক ভূমিকার বিষয়ে লেখক যান নি। স্থানে স্থানে লেখক অবশ্য বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসের সন্দিহান চিত্তের কথা উল্লেখ করেছেন। লেখক বলেছেন যে, মার্কস কমিউনের সমর্থনে বন্ধুদের শত শত চিঠি লেখেন। কিন্তু সেটা কখন এবং কী পর্যায়ে করেন। বস্তুত, মার্কস ১৮ মার্চ তারিখ অবধি, প্যারী অভ্যুত্থানের বিরোধী ছিলেন। আন্তর্জাতিকের এক সাধারণ অধিবেশনে (৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭০) তিনি ফরাসী শ্রমিকদের প্রুশিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী সাধারণতন্ত্রকে মেনে নিতে উপদেশ দেন এবং ১৭৯২ সালের নজিরকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে বলেন। পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যথোচিত প্রস্তুতি তথা অনুকূল চেতনাসৃষ্টির পূর্বে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বিপদ আর ব্যর্থতা সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। মার্কস-এঙ্গেলস চেয়েছিলেন প্রুশিয়ার বিজয় এবং জার্মানির বিভিন্ন ক্ষুদে রাজ্যের সংযুক্তিকরণ, পরিণামে যাতে রাশিয়ার শক্তি খর্ব হয়ে যায়। সমসাময়িক উদার-পন্থীদেরও ছিল অনুরূপ মনোভাব। এ ছাড়া, ফ্রান্সে প্রুধঁপন্থীদের প্রভাববৃদ্ধিকেও তিনি সুনজরে দেখেন নি। কিন্তু প্যারী কমিউনের অপ্রত্যাশিত বৈপ্লবিক পরিস্থিতি মার্কসকে চমৎকৃত করে। যখন তিনি কমিউনের সমর্থনে পূর্বের নীতি পরিত্যাগ করেন তখন প্যারীতে কবরের শান্তি দেখা দিয়েছে।

আসলে কিন্তু মার্কসের প্রাক-বিপ্লব কালের অনুমান নির্ভুল ছিল। কমিউনের ব্যর্থতায় জনমানসে বিপ্লবের বিভীষিকা এবং প্রতিপক্ষের দমননীতির ফলে ইউরোপে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের সম্ভাবনা প্রায় এক পুরুষ যে পেছিয়ে যায়, সেটা ইতিহাসে প্রমাণিত। মার্কস কেন তাঁর আগেকার নির্ভুল অভিমত পরিবর্তন করেন, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। পরবর্তী কালে কমিউনকে মার্কস এবং এঙ্গেলস আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের পৃষ্ঠপটে বিশ্লেষণ করেন। প্যারী কমিউন সম্পর্কে লেনিনও তাঁর মতামত পরিবর্তন করেন। কমিউনে শ্রমিকদের প্রাধান্য বা প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ব্যাখ্যা তিনি গোড়ার দিকে (১৯০৫) মানতে পারেন নি। তাঁর চোখে কমিউন ছিল নিম্নবুর্জোয়া গণতন্ত্রী সরকারে অপরিণত শ্রমিক-প্রতিনিধিদের যোগদানমাত্র। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বুর্জোয়া

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূর্তি হিসাবে তিনি কমিউনের মূল্যায়ন করেন। পরে লেনিনের চিন্তায় কমিউন সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, বিশেষ করে রুশ বিপ্লবের প্রারম্ভে। কমিউনে প্রলেতারিয়েতের প্রভাবের (হেগিমনি) উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। নিম্নবুর্জোয়া-শ্রেণী কমিউনে যোগ দিয়েছিল বটে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীই শেষাবধি কমিউনকে আঁকড়ে থাকে। কমিউনের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক পর্যায় থেকে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে উত্তরণের সম্ভাবনা তিনি খুঁজে পান।

প্যারী কমিউন ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের সূত্রানুসারী শেষ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব অথবা প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ কিনা, সেবিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। কমিউনের পশ্চাতে ফ্রান্সের সোয়া দুশো বছরের প্রাদেশিক দ্বন্দ্বকে অনেকে প্রাধান্য দিতে চান। ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশের রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার প্রশ্নে প্যারীর চিরকালের মাতব্বরি এবং সেই ঐতিহাসিক ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে কমিউনের মাধ্যমে প্যারীর শেষ প্রচেষ্টায়। কমিউনের কার্য-কারণ, বিষয় তথা চরিত্রের মূল্যায়ন নিয়ে আজও ঐতিহাসিক এবং গবেষক মহলে পরস্পরবিরোধী বিচারবিশ্লেষণ চলছে।

আলোচ্য বইটিতে লেখক বিভিন্ন ঘটনাপ্রসঙ্গে গঁকুর বা গঁকুরদের দিনলিপির কথা উল্লেখ করেছেন। পরিচয়লিপিতে গঁকুর কে বা কারা তা বলা না থাকায় পাঠকের বোঝার পক্ষে অসুবিধা হয়। ঔপন্যাসিক গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম এদমঁ তাঁর জর্নলে কমিউনের প্রাত্যহিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁদের একজন কমিউনের আগেই মারা যান। ভাষার উচ্ছ্বাস এবং আতিশয্য ছাড়াও সমগ্র বইটি থেকে একটি অ্যামেচারী প্রয়াস যেন ফুটে উঠেছে। বিষয়বস্তুর কথা আগেই কিছু বলা হয়েছে। অন্যান্য ত্রুটির মধ্যে নানাবিধ উদ্ধৃতির সমর্থনে একটি উল্লেখপঞ্জীর অভাব সিরিয়াস পাঠকের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। পরিশেষে যে গ্রন্থতালিকা যুক্ত হয়েছে সেটির সংকলনে আধুনিক মান ও পদ্ধতি অনুসরণ করা কিন্তু কঠিন ছিল না। আকৃতিগত দিক থেকে উন্নত মানের গ্রন্থপ্রকাশনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল সূচাবু একটি নির্ঘণ্ট (ইনডেক্স) যা বইটিতে নেই। সবকিছু সত্ত্বেও লেখককে সাধুবাদ জানাই এইজন্যে যে এজাতীয় বিষয়ে বাংলায় খুব তেমন লেখা হয় না। বইটিকে তাই স্বাগত জানাচ্ছি।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

আমার কালের কবি ও কবিতা। মণীন্দ্র রায়। কথামালা, কলকাতা-৯। মূল্য আট টাকা।

প্রায় চার দশক ধরে কবিতা লিখছেন মণীন্দ্র রায়। শুধু কবি নন, আমাদের সাহিত্য-সংসারের একজন অক্লান্ত কর্মীও তিনি। কখনো কবিতার নিষ্ঠাবান ছাত্র, কখনো প্রগতি-সাহিত্য আন্দো-লনের পদাতিক, কখনো কবিতা-পত্রিকা বা সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘকাল তাঁকে অসংখ্য কবি-লেখকের কমবেশি সান্নিধ্যে আসতে হয়েছে। ফলে, 'আমার কালের কবি ও কবিতা' নাম দিয়ে চল্লিশের এই বিশিষ্ট কবি যখন একটা গোটা বই-ই লিখে ফেলেন, বাংলা কবিতার অনুরাগীদের কাছে এ একটা খবর হয়ে দাঁড়ায়।

মণীন্দ্র রায়ের লেখায় মজলিশি আড্ডার খুশবু আছে ; আছে, আমরা যাকে বলি প্রসাদ-গুণ। এখানে বারবার স্থানবদল হয় কবি আর কবিতার, শিল্পের শরীরে রক্ত-মাংসের ছিটে এসে লাগে। বইটির নামকরণেই এ-কথা মালুম যে এটি নিছক কবিতার ধারাবাহিক আলোচনা বা কাব্য-

তত্ত্বের পণ্ডিত-শোভন ভাষ্য নয়। খানিকটা ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে মণীন্দ্র রায় তিরিশ থেকে শুরু করে পঞ্চাশের দশকের বেশ কয়েকজন কবির ব্যক্তিগত দিকগুলিকেও এখানে তুলে ধরেছেন। ইংরেজির ভাষান্তর ক'রে যাকে বলা যায় 'নিরাপদ' লেখা, তা লিখতে চান নি তিনি। যেভাবে আমাদের ভাষার চার দশকের কবিতা আর কবিদের তিনি বুঝেছেন, সাধ্যমত অকপটভাবে সেই অভিজ্ঞতাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। খুব একটা রেখে-ঢেকে কথা বলেন নি, অনেক সময় ঝুঁকিও নিয়েছেন।

কবি-লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটিতে বিপত্তি ঘটে যেতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কবিরে খুঁজো না তার জীবনচরিতে।' কিন্তু বাঙালী পাঠকেরা তাঁর এই সাবধানবাণীতে খুব একটা কান দিয়েছেন বলে মনে হয় না। অভিনয়-জগতের মতো সাহিত্যজগতের বাসিন্দাদের-ও দিনযাপনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে তাঁদের অদম্য আগ্রহ। তার ওপর কোনো কোনো লেখকের জীবনচর্চায় যদি কিছুটা নাটকীয়তা, বা সোজা ভাষায়, গোলযোগ থাকে তা হলে তো আর কথাই নেই। গত শতকের মাইকেল মধুসূদন থেকে শুরু করে হাল আমলের শক্তি চট্টোপাধ্যায়—এমন অনেকেই এ-হেন কৌতূহলের ফাঁদ এড়িয়ে যেতে পারেন নি। 'কবিদের কৃমিমাংস খুঁটি' যে-সব দুর্ধর্ষ গবেষক সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভয়েরই সেবা করে যাচ্ছেন, তাঁদের কৃপায় খোদ রবীন্দ্রনাথের-ও স্টুল বা ইউরিন রিপোর্ট, এমনকি তাঁর একান্ত নিজস্ব জমা-খরচের হিসেবও খোলা খাতার মতো বে-আব্রু হয়ে গেছে।

আমাদের সৌভাগ্য, মণীন্দ্র রায় কবিদের অন্তরঙ্গ ছবি আঁকার সময় এই খেলো বাণিজ্যিকতাকে প্রশ্রয় দেন নি। কবিদের জীবন নিয়ে যে-প্রসঙ্গই তিনি টেনে আনুন না কেন, তাকে কবিতার সঙ্গে অন্বিত করার ইচ্ছেটাই তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে, এ-ধরনের লেখা সাবজেকটিভ হতে বাধ্য। বহু ক্ষেত্রেই পাঠকের সঙ্গে লেখকের মতান্তর হতে পারে। কিন্তু, এই অনিবার্য ফাঁকগুলিকে মণীন্দ্র রায় ভরিয়ে দিয়েছেন দুর্লভ রসবোধ দিয়ে। নিজের কথাগুলিকে বেশ দাপটের সঙ্গেই বলেছেন তিনি, অথচ দুর্বিনয়কে কখনো প্রশ্রয় দেন নি। লেখাটিতে কোথাও কোনো কবি বা তাঁর কবিতাকে পরিকল্পিতভাবে ছোট করার চেষ্টা নেই। স্রেফ মন্তব্য করেই কর্তব্য সারেন নি, মন্তব্যগুলি বিশ্লেষণের দায়ও গ্রহণ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, বইটির ঘরোয়া মেজাজ কখনো তিক্ততার বিষে ঘুলিয়ে ওঠে নি। আমাদের চারপাশে রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও ব্যক্তি-জীবনে যে প্রবল অসহিষ্ণুতার উলটো-পালটা হাওয়া এখন বহমান, সেখানে এই রচনাটি প্রসন্ন নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য একমুঠো সতেজ বাতাস এনে দিয়েছে।

মণীন্দ্র রায় নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। একদল বন্ধুর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি কবি-প্রণাম করেছেন, কবিতার সেই মৌলী পাহাড়ের ছায়া পেয়েছেন। নজরুল ইসলাম-কে যখন বিদেশে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, তখন স্টেশনে একরাশ ফুল হাতে তাঁকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন সেদিনের লাজুক, একান্ত তরুণ, এই আজকের লেখক। মণীন্দ্র রায় ভাগ্যবান, কারণ, ছাত্রজীবনে অধ্যাপক হিসেবে পেয়েছিলেন বাংলা কবিতার দুই প্রধান পুরুষ বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসুকে। এঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কালক্রমে রীতিমত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বরাবরের স্নেহধন্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের আত্মীয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘকালের বন্ধু ও সাংস্কৃতিক সহযোদ্ধা। আবার একইসঙ্গে পঞ্চাশের দশকের দামাল, বেপরোয়া কবিদের অন্দরমহলে প্রবেশের ছাড়পত্র পেতেও স্বভাবগুণে কোনো অসুবিধে হয় নি তাঁর। আর, এ-সব কিছুরই আকর্ষণীয় রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে 'আমার কালের কবি ও কবিতা'-য়।

দু-একটি কথায় এক-একজন কবিকে তিনি জীবন্ত তুলে নিয়ে এসেছেন পাঠকদের সামনে। চ্যাপটা টার্কিশ টোব্যাকোর সিগারেট অফার ক'রে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিভাবে প্রথমেই ভেঙে দিতেন তাঁর অনুজ কবিদের আড়ষ্টতা, রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ কারণে 'অস্বাভাবিকভাবে সুরেলা নাটকীয়তার সঙ্গে আবৃত্তি' করতেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন নস্যি নিতেন তখন কেন আঙুলের ডগা-গুলিতে মাখিয়ে নিতেন অগুরু, বাড়িতে তিনটি মেয়ে, একডজন বেড়াল, দুটো কুকুরছানা থাকতেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর তাঁর স্ত্রী একটি ভালুকছানা সংগ্রহে কিভাবে হন্যে হয়ে আছেন—এসব নিয়ে আমুদে কথাবার্তা বইটিতে খোশ গল্পের মেজাজ এনে দিয়েছে।

মণীন্দ্র রায়ের সাফল্য এখানেই যে এ-জাতীয় চটুল রচনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন কবির কবিতা-সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যায়নকেও অনায়াসে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন। ফলে, সিরিয়স বা রহস্যপ্রিয়—কোনো ধরনের পাঠকেরই খুব একটা ক্ষোভ থাকে না শেষ-মেশ।

বাংলা কবিতার আধুনিকতার বিভিন্ন লক্ষণ ও পালাবদলের বাঁকগুলিকে লেখক ছুঁতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র কাব্যলোকে কিভাবে প্রবেশ করলেন তিরিশের কবিকুল, কোন রাজনৈতিক পটভূমি চল্লিশের কবিতায় গণচেতনা বহন করে নিয়ে এল, উত্তর-স্বাধীনতাপর্বে পঞ্চাশের লেখালিখিতে কেন জাগল ব্যক্তিগত উচ্চারণের প্রাধান্য—বাংলা কবিতার হাওয়া-বদলের এই ইতিহাসকে মণীন্দ্র রায় মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থিত করেছেন। আলোচ্য প্রত্যেক কবির কবিতার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রকেও তিনি নিজের প্রথায় তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিশেষত জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে তাঁর কিছু কিছু বক্তব্য অভিনব তো বটেই, সাহসীও।

মণীন্দ্র রায় একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। 'শুদ্ধ' শিল্পে তাঁর আস্থা নেই, কবিতায় 'নিখিল নাস্তি'-র সংগীতেও তিনি গলা মেলাতে অরাজি। অথচ, সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে কোনো সংকীর্ণতা বা অনুদারতা তাঁর দৃষ্টিকে অন্ধ করে নি। তিনি এমন কিছু কিছু কথা বলেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু বা অমিয় চক্রবর্তী প্রসঙ্গে—যা ঐসব কবিদের অনুরাগী পাঠকদের কাছে প্রিয় শোনাবে না। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় উচ্চারণ করেছেন, "মুশকিল দেখা দেয় প্রগতিশীল কবিদের নিয়ে। বিষ্ণু দে বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় মৃত্যু সম্বন্ধে নীরব। অথচ পৃথিবীর অন্যভাষায় যাঁরা প্রধান প্রগতিশীল কবি, যেমন লোরকা মায়াকভস্কি নেরুদা—সকলেই কোনো না কোনোভাবে মৃত্যুর প্রসঙ্গে এসেছেন। প্রগতি বা মৃত্যু-চেতনা অতএব পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়। বাঙালি প্রধান প্রগতিপন্থী কবিরা তা হলে মৃত্যুকে এড়িয়ে গেলেন কেন? মৃত্যুচেতনা ছাড়া জীবনবোধ সম্পূর্ণ হয়?"

লেখক বাংলা কবিতার প্রধান দুটি ঝোঁক হিসেবে একদিকে হৃদয়চর্চা অন্যদিকে বুদ্ধিচর্চার উল্লেখ করেছেন এবং এ-প্রসঙ্গে প্রথম আর দ্বিতীয়টির প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করেছেন যথাক্রমে চণ্ডীদাস আর ভারতচন্দ্রকে। এই দুই কবির প্রতিতুলনায় লেখক জীবনানন্দ দাশ আর বিষ্ণু দে-র প্রসঙ্গ তুলেছেন। এ-ধরনের আলোচনা অনেকের কাছেই সরলীকরণের দৃষ্টান্ত বলে মনে হতে পারে। বস্তুত, একজন কবি তখনই বড় হয়ে ওঠেন, যখন আবেগ আর মেধা সমমাত্রায় তাঁর কবিতায় মিশে যায়। তা ছাড়া, আধুনিক কবিতার গতিপথ রীতিমত জটিল এবং দ্ব্যর্থক। জীবনানন্দের কবিতায় অবিরাম আত্মহননের শব্দ শোনা যায়। 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির'-এর অন্ধকার থেকে যাঁর যাত্রা 'বেলা অবেলা কালবেলা'-র উজ্জ্বল প্রজ্ঞায়—চণ্ডীদাসীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় তাঁকে কোনক্রমেই বাঁধা যায় কি? আবার, বিপরীতে, বিষ্ণু দে

যে-কোনো সময় তাঁর কবিতার আপত-কঠিন ফ্রেম ভেঙে প্রচণ্ড রোমান্টিক স্বেচ্ছাচারে কিভাবে প্লাবিত ক'রে দেন পাঠকদের, বাক্ যাঁর কাছে কখনোই চটক বা চাতুর্য নয়, তাঁকে কি কোনো-ভাবেই তুলনা করা চলে কৃষ্ণনাগরিক ভারতচন্দ্রের সঙ্গে? বাংলা কবিতার বুদ্ধিবাদী ধারার 'বংশলতিকা' তৈরি করার বিষয়টি মজাদার হতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।

যে যত্ন আর নিষ্ঠা নিয়ে মণীন্দ্র রায় জীবনানন্দ দাশ থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত দিক ও কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন, পরবর্তী কবিদের এবং তাঁদের কবিতা সম্পর্কে সে-মনস্কতা বইটিতে অনুপস্থিত। লেখক তাঁর অনুজ কবিদের কবিতা সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন, সেগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। জানি না, তরুণ কবি আর পাঠকদের তিনি প্ররোচিত করতে চেয়েছেন কিনা।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

চতুরঙ্গ—নারায়ণ চৌধুরী। শৈব্যা পুস্তকালয়, কলকাতা-৭৩। মূল্য পনের টাকা।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরীর প্রবন্ধ-সংকলন 'চতুরঙ্গ' কয়েক মাস আগে (আশ্বিন ১৩৮৭) প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় তের-চৌদ্দ বছর ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যের নানা শাখাপ্রশাখা প্রসঙ্গে তিনি যেসমস্ত প্রবন্ধ রচনা করেছেন, এগুলি তারই একটি ঘনানিবন্ধ সুনির্বাচিত সুস্বাদু সংকলন। প্রবন্ধসাহিত্যে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হয় সঙ্গীত সমালোচনার মধ্য দিয়ে। সে আলোচনা কখনো টপ্‌পা-ঠুংরীর ধাঁচে, কখনো মজলিশী কলাবতী রাগিণীর মতো, কখনো-বা ধ্রুপদের কঠোর গম্ভীর শাসনে অকম্পিত। বস্তুত দীর্ঘদিন ধরে তাঁর যত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তা একজীবনের পক্ষে যথেষ্ট। সাহিত্যসমালোচনা, সঙ্গীত, সমাজতত্ত্ব, বাংলা গদ্যভাষা সমস্যা, গান্ধীদর্শন ও সর্বোদয়তত্ত্ব, সংস্কৃতির নানা শাখাপ্রশাখা ও লঘু-গুরু আলোচনায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর মতামত ও মন্তব্য সম্বন্ধে সকলে নিশ্চয় একমত হবেন না। সাহিত্যে মতের ঐক্য অনেক সময়ে চিত্তের অসাড়তা সৃষ্টি করে। যে-রচনা পড়ে পাঠক নীরব হয়ে থাকে, তা কখনোই রসোত্তীর্ণ নয় এবং তা লেখকের কাম্যও নয়। পাঠক লেখককে হয় প্রশংসা করুক, আর না হয় সমালোচনা করুক, যা হয়তো কখনো কখনো নিন্দার ধার ঘেঁষে যায়। তবু নীরবতার চেয়ে সরবতা অনেক বেশী স্পৃহণীয়। নারায়ণ চৌধুরী প্রবন্ধ আমাদের মনে যে বিতর্কপ্রবণতা খুঁচিয়ে তোলে, তাঁর অনেক কথা আমাদের মনে প্রবল প্রতিবাদ জাগিয়ে দেয়, তাতেই তাঁর রচনার সফলতা।

আলোচ্য নিবন্ধ-সংকলনের নাম দেওয়া হয়েছে 'চতুরঙ্গ'। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "চতুরঙ্গ বইয়ে বাংলা প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস ও ছোট গল্প—সাহিত্যের এই চার অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হল।" পুরাকালে রাজারা অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতিক বাহিনী—এই চতুরঙ্গ বল নিয়ে বিপক্ষকে আক্রমণ করতেন। তার পর দিন পালটালো, চতুরঙ্গ বল তখন রক্তাক্ত যুদ্ধপ্রাঙ্গণ ছেড়ে দাবা-বড়ের ছকে নেমে এল। যুদ্ধ তখন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় পরিণত হল। আমাদের লেখকও তেমনি এই প্রবন্ধ-সংকলনে যেসমস্ত বাদ-প্রতিবাদ, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের ব্যূহ সাজিয়েছেন, তাতে প্রাণহানির কোনো আশঙ্কা নেই, এটাই আশ্বাসের কথা। তবে 'চতুরঙ্গ' নামটি, যা তিনি 'লেখকের নিবেদনে' ব্যাখ্যা করেছেন, তা কতটা যুক্তিসহ তাতে কিছু সন্দেহ আছে। কারণ এর

ষোলটি প্রবন্ধের মধ্যে তেরটি-ই হচ্ছে গদ্যপ্রবন্ধ, উপন্যাস ও ছোটগল্পের আলোচনা, মাত্র শেষের তিনটিতে (বাংলা সাহিত্যে মানবিকতা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও কাজী নজরুল, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য) কাব্য-কবিতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা আছে। 'বাংলা সাহিত্যে মানবিকতা' প্রবন্ধে দীনবন্ধু মিত্রের মানবিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে নাটক সম্বন্ধে ক্ষীণ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। চতুরঙ্গের প্রধান দুটি শাখা এই সংকলনে প্রায় অনুপস্থিত। সে যাই হোক, প্রথম তেরটি প্রবন্ধের মধ্যে ছ'টি প্রবন্ধে (বাংলা গদ্যের ভূমিকা, বাংলা সাহিত্যে ভাষাবিচার, বাংলা ভাষার বিবর্তন : সাধুভাষার সপক্ষে, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ভূমিকা, বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্য, পূর্ব-বাংলার প্রবন্ধসাহিত্য) প্রবন্ধ-নিবন্ধ সাহিত্যের মূল চরিত্রটা কী, এবং বাংলা চিন্তামূলক প্রবন্ধের গোড়ায় গলদ কোথায় তা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। শুধু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি মিতবাক বলে এ আলোচনায় কিছু খঞ্জত্বদোষ ঘটেছে। সঙ্গত কারণেই তিনি ব্যক্তিগত রচনা, যা আজকাল বাজারে 'রম্যরচনা' নামে বিকোচ্ছে, তার প্রতি কিছু নির্মম। রম্যরচনার নামে গদ্যে ব্যক্তিগত প্রলাপ-বিলাপের আতিশয্য এই শাখাটির প্রতি তাঁকে অপ্রসন্ন করে তুলেছে। এটি বাঙালীর মনের দিক থেকে কুপথ্যে পরিণত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বুদ্ধদেব বসু ঠিকই বলেছিলেন, "যাঁরা কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস কিছুই লিখতে পারেন না, এবং সত্যিকার সাংবাদিক পর্যন্ত নন, যাঁদের না আছে তথ্যজ্ঞান, না উদ্ভাবনশক্তি বা কলানৈপুণ্য, সংগতি রক্ষা করে কোনো বিষয়ে একদণ্ড চিন্তা করতে বা পরম্পর দুটো পদ্য রচনা করতে যাঁরা স্বভাবগুণে অক্ষম, তাঁদের বিশৃঙ্খল প্রগল্‌ভতা ছাপার অক্ষরে উদ্ধত হয়ে উঠতে পারত না, যদি না রম্যরচনা শব্দটি সৃষ্টি হত" (কবিতা, ২৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)। এ মন্তব্য বিরস হলেও অযথার্থ নয়। কিন্তু চিন্তামূলক প্রবন্ধের পাশাপাশি সমান্তরাল রেখায় ব্যক্তিগত প্রবন্ধের যে ক্ষীণকায় ধারাটি বয়ে চলেছে, তাকে এভাবে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় এদিকটার প্রতি কিছু আনুকূল্য করলে তাঁর প্রবন্ধসংক্রান্ত চিন্তাধারা সর্ব-অবয়বযুক্ত সুবলয়িত হয়ে উঠতে পারত। সে যাই হোক, চৌধুরী মহাশয়ের মতে, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, যৌক্তিক পারম্পর্য ও নির্ভেজাল বাস্তব চেতনা লেখকের আবেগবেপথু উড়ু-উড়ু রোমান্টিক ও কেন্দ্রাতিচারী নভোলোকবাসী মনকে মর্ত্যের মাটিতে নামিয়ে আনে। তার জন্য প্রয়োজন গদ্যের পরিচ্ছন্ন তীক্ষ্ণ স্পষ্ট বাগ্‌-ভঙ্গিমা। দুঃখের বিষয়, রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-বীরবল পর্যন্ত, বাংলাভাষায় রচিত বিশাল নিবন্ধসাহিত্য যথার্থ প্রবন্ধসাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি—লেখকের ক্ষোভ এই জন্য। তাঁর মতে, এর জন্য দায়ী বাঙালীর দুর্মর কুসংস্কার, অর্থাৎ কাব্য-সংস্কার। ১০ম শতাব্দীর চর্যাগীতিকার সিদ্ধাচার্য ও ১২শ শতাব্দীর জয়দেবের মঞ্জুল শ্লোকাবলী থেকে শুরু করে ইদানীং লিট্‌ল ম্যাগাজিনে আবির্ভূত অসংখ্য বালখিল্য কবিদলের কথা বিবেচনা করলে নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের বিরস মন্তব্য 'রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন', সেইভাবে হজম করতেই হয়। তবে কিনা কাব্যবোধ ও ব্যক্তিক আবেগ-উচ্ছ্বাস বাঙালীর হাজার বছরের কুলধর্ম, যা বোধ হয় লেখকের মতে, খৃষ্টানী পুরাণের 'অরিজিনাল সিনে'র মতো অনিবার্য পাপাচারের মোক্ষম নিয়তি। তবে তিনি বাংলা প্রবন্ধের ভবিষ্যৎ ভেবে যতটা হতাশ হয়ে পড়েছেন, ততটা নিরাশ হবার প্রয়োজন নেই। কাব্যপ্রবণতা বাঙালীর মনোভঙ্গীকে আবেগের দহে ডুবিয়ে মারেনি, তাকে সদাস্নাত শুচিতাই দিয়েছে। ডি-কুইন্সি কথিত (হুইলার কাউনস্য) literature of knowledgeকে literature of poem-এর দ্বারা পরিশুদ্ধ করে না নিলে শুধু জ্ঞানভাণ্ডার জগদ্দল পাথরের মতো গুরুভার হয়ে ওঠে। একমাত্র মহাকাশ এবং কীটপতঙ্গ ছাড়া সে গুরুভার কেউ লাঘব করতে পারে না। রাম-

মোহন থেকে প্রমথ চৌধুরী, তারও পরে অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাংলার সীরিয়স প্রবন্ধের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, বেশ বাড়বাড়ন্ত হয়েছে, তা ইতিহাসের খাতিরে স্বীকার করতে হবে। একালের দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় সংস্করণে নিতান্ত অজ্ঞাতকুলশীল লেখকদের প্রবন্ধেও যেরকম জ্ঞানভূমিষ্ঠ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে চমৎকৃত হতে হয়। উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যের (হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী) তুলনায় গুণগত উৎকর্ষ, রচনার সৌকর্য ও বিষয়গত ব্যাপকতায় বাংলা প্রবন্ধের লজ্জায় মাথা হেঁট করার প্রয়োজন নেই। এ তো গেল বাংলা প্রবন্ধ ও বাঙালীর চিন্তামনস্কতা সম্বন্ধে তাঁর অভিমতের কথা। প্রবন্ধের ভাষা কেমন হওয়া উচিত, সে-বিষয়েও তিনি চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনটি প্রবন্ধে (বাংলা গদ্যের ভূমিকা, বাংলা সাহিত্যের ভাষাবিচার, বাংলা ভাষার বিবর্তন : সাধুভাষার সপক্ষে) তিনি প্রবন্ধের ভাষারীতি আলোচনা করেছেন, সেখানেও তাঁর নিপুণ বিশ্লেষণশক্তি চোখে পড়বে। তবে স্টাইলিস্টিক পন্থা অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যান্বয়, শব্দপ্রয়োগপদ্ধতি, অর্থযতি ও সুরযতির বিন্যাসকৌশল এবং স্তবকবন্ধের আলোচনা এতে অনুপস্থিত বলে তাঁর স্টাইলবিচারপদ্ধতি উনিশ-শতকী সংস্কার থেকে এখনো মুক্ত হতে পারেনি, তাও সংকোচের সঙ্গে নিবেদন করি।

সর্বোপরি মারাত্মক হয়েছে তাঁর 'বাংলা ভাষার বিবর্তন : সাধুভাষার সপক্ষে' প্রবন্ধটি। এটি খানিকটা তাঁর ব্যক্তিগত রুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে তাঁর অভিমত যাচাই করাও অনেকটা সুবিধা হয়েছে। তিনি যে-কোনো সীরিয়স গদ্য রচনায় সুধাভাষার পক্ষপাতী। চলতি রীতি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য প্রতিবাদের অপেক্ষা রাখে, "চলতি রীতির লেখা কেমন যেন অযত্নকৃত, এলো-মেলো অসংবদ্ধ। চিন্তার সংহতি তার মধ্যে তেমন পাই না" (এই গ্রন্থের ৩৪ পৃ দ্রষ্টব্য)। আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি প্রমথ চৌধুরীর চলতি ভষার মধ্যেও প্রবন্ধের উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পান নি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের গদ্যও তাঁর কাছে পাসমার্ক পায়নি, "রবীন্দ্রগদ্যের সুর বড় বেশী মোলায়েম নরম ধ্বনিযুক্ত। এটি সুমার্জিত দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচি-সুচিকণতার পরিচায়ক সন্দেহ নেই, তা সত্ত্বেও কতকটা স্ত্রীস্বভাববিশিষ্ট সে কথা অস্বীকার করা যায় না। শেষের দিকে চলতি গদ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ম্যানারিজম-ও কতকটা এসে গিয়েছিল" (প্রাগুক্ত, পৃ ১১)। তা হলে তাঁর মতে তালঠোকা পালোয়ানী প্যাঁচই কি আদর্শ প্রবন্ধের ভাষা বলে বিবেচিত হবে? তা সে যাই হোক, সাধুভাষার এত অনুরাগী (উনিশ শতকের ভাষায়—'গোঁড়া') হয়েও তিনি নিজে কেন সে বর্ম ত্যাগ করে চলতিরীতির দুর্বল সাঁকো ভর করেছেন, এ প্রশ্ন তাঁকে করা যেতে পারে। এ কি শুধু সুরস পিণ্ড খর্জুর খেয়ে রসনা অসাড় হয়ে যাওয়ার জন্য তিন্তিড়ীর দিকে আকর্ষণ?—না দিলীপকুমারের সামান্য পদাঘাতের (প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩) খোঁচাই তাঁকে সাধুভাষার নিরাপদ বন্দর থেকে চলতিভাষার ঝড়ের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে? মোট কথা তাঁর অভিমত, সিদ্ধান্ত ও আচরণের মধ্যে যে কিছু স্ববিরোধ আছে তা স্বীকার করতেই হবে। "যে হোক সে হোক ভাষা, কাব্য রস লয়ে"—ভারতচন্দ্রের এ উক্তি একালেও সমভাবে প্রযোজ্য। সাধুভাষা ও চলতি ভাষার উপর প্রবন্ধের প্রবন্ধত্ব নির্ভর করে না, নির্ভর করে লেখকের চরিত্র ও মানসিকতার উপর, এই সোজা কথাটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। সাধুভাষা ও চলতিভাষা সম্পর্কে তাঁর মতামত মেনে নেওয়া দুষ্কর। এই বিতর্ক অর্ধশতাব্দী পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে, এখন আর গঙ্গাকে গোমুখী-গহ্বরে ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। মাতৃজঠর যত নিরাপদই হোক, ভূমিষ্ঠ হবার পরে সেখানে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি চান আর না চান, চলতি ভাষাই অতঃপর বাঙালীর যে কোনো চিন্তাপ্রবাহকে সার্থকতার ঘাটে ঘাটে নিয়ে যাবে ;

তা ঐতিহাসিক সত্য, সুতরাং স্বীকার্য।

তাঁর দ্বিতীয় পর্বের প্রবন্ধগুলি (বাংলা কথাসাহিত্যের সমস্যা, উপন্যাসশিল্পের বিবর্তন, বাংলা উপন্যাসের ভাষাশিল্প, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা ছোটগল্প) নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি বাংলা উপন্যাসের কায়া ও কান্তি বিচারে পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যের নজির তুলেছেন। বাংলা উপন্যাসের ঐশ্বর্য কোথায়, দীনতাই বা কোথায়, তা তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য সে আলোচনাও কোথাও কোথাও অতিশয়োক্তি ও উন্মোক্তির ধার ঘেঁষে গেছে। তিনি যেসমস্ত বাংলা উপন্যাসে এপিক লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন, তাতে সে লক্ষণ কতটা আছে তাতে বিষম সন্দেহ রয়েছে। 'চেতনাপ্রবাহ' ও উপন্যাসে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর মত ও মন্তব্যও যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে না। সম্প্রতি সমাজবাস্তবতার নামে পর্নোগ্রাফি-তুল্য যেসমস্ত অসামাজিক অমেধ্য পঙ্কবিলাস বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে চলেছে তিনি তার হৃদয় লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ শরসন্ধান করেছেন। কিন্তু তারা যে সে চাঁদমারির লক্ষ্য হবে, এমন তো মনে হয় না। একালের বাংলা কথাসাহিত্যের সবটাই কি সামাজিক অপচার ও নৈতিক অবক্ষয়ের অশুভ মিলনে উৎপন্ন 'লাভ চাইল্ড্'? একালের উপন্যাস কেন রেল-ইঞ্জিনের বাঁশীর মতো কর্ণপটহবিদারী, কেন পূতিগন্ধময় নরকবর্ণনার দিকে এযুগের ঔপন্যাসিকদের অধিকতর আকর্ষণ, কেন এই সমস্ত উপন্যাসে নাস্তিক, অশান্ত, অর্থহীন ঘূর্ণি এমন ছন্নছাড়াভাবে ফুটে উঠছে, তার 'এপিসেন্টার' অন্যত্র খুঁজতে হবে। তিনি ধৈর্যের সঙ্গে খোলামন নিয়ে ভূমিকম্পের সেই কেন্দ্রটি বিশ্লেষণ করলে সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যের এলোমেলো টলোমলো চালচলনের ধরনটা বুঝতে পারতেন।

তাঁর যে গভীর চিন্তার পরিচয় উল্লিখিত প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে, নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্য : কবিতা বিশ্লেষণে তার অভাব দেখে বিষণ্ণ হলাম। এ-যে বামহস্তের দাক্ষিণ্যের দান। চিন্তার গভীরতা সুলভ উদ্ধৃতির বাহুল্যে বিপর্যস্ত হয়েছে, তা বেদনার সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। তিনি আমাদের যে মানসিক ভোজসভায় আহ্বান করেছেন, নানাবিধ রসনালোভন ভোজ্যের আয়োজনে রসনাকে রসায়িত করেছেন, শেষ প্রবন্ধ দুটিতে শেষপাতে মিষ্টান্নপ্রাপ্তির সে আশা পূর্ণ হল না। আমরা শূন্য পাত্রের সামনে হাত গুটিয়ে বসে রইলাম, মিষ্টান্ন এলো না। প্রবন্ধ দুটিতে যেসমস্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, তা ইতিপূর্বে কেউ-না-কেউ বলেছেন। তিনি নজরুল ও সুকান্তকে ভাবাবেগের দ্বারা বিচার না করে চিন্তা ও যুক্তির বকযন্ত্রে ফেলে বিশ্লেষণ করলে ভিন্ন ফল পেতেন বলে আমাদের ধারণা। তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে বলেই এই সমস্ত অপ্রীতিকর ব্যাপারের কথা বলতে হল। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন বিরলপ্রতিভা স্থিতধী নিবন্ধকার, তাঁর কাছে আমাদের আরো অনেক প্রত্যাশা। তাই তাঁকে অকারণে উত্তেজিত হতে দেখলে অথবা ব্যক্তিগত মেজাজের প্রবণতায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেখলে তাঁর গুণমুগ্ধদের কিছু বেদনাবোধ হবেই। সে যাই হোক, তাঁর এই সংকলনটিকে অবহেলাভরে অনাদরে শয্যাপার্শ্বে ফেলে রাখার উপায় নেই। তাঁর অভিমতের সবটা পছন্দ করি, আর নাই করি, তিনি যে আমাদের জড়ত্বপ্রাপ্ত মনটাকে বক্তব্যের খোঁচায় জাগিয়ে তুলেছেন, এতেই তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা বানান—মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। আশা প্রকাশনী, কলকাতা-৯। মূল্য এগারো টাকা।

রবীন্দ্রনাথের সাগ্রহ পরামর্শে ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলা বানানের নিয়ম' নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য 'বানান-সংস্কার-সমিতি' গঠন করেন।

সমিতিগঠনের পটভূমিটি জেনে রাখা ভালো।

বাঙলা ভাষায় সাহিত্যকর্ম যত দিন পর্যন্ত প্রধানত 'সাধু' ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে এসেছে, তত দিন পর্যন্ত বাঙলা শব্দের বানান নিয়ে তেমন গুরুতর সমস্যা ছিল না। সমস্যাটা বীভৎস-রূপে দেখা দিতে থাকে যখন থেকে বাঙালীর সাহিত্যকর্ম, 'সবুজপত্রে'র প্রভাবে, প্রধানত বা অনেকাংশে চলতি বাঙলাকে আশ্রয় করে। অর্থাৎ, যত দিন পর্যন্ত [করিল, চলিব] লেখা হয়েছে, তত দিন বানান নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। ঝনঝাট শুরু হল চলিত ক্রিয়াপদ [করল] লিখতে গিয়ে—করল, ক'রল, কর্‌লো, ক'র্‌লো, কোরল, কোর্‌লো : শব্দটি ছাপার হরফে হরেক রূপ নিয়ে দেখা দিতে থাকল। একই ভাবে, [চলব] ক্রিয়াপদটির একাধিক লিপিরূপে দেখা দিতে থাকল—চলব, চল্‌বো, চল্‌বো, চ'ল্‌বো ইত্যাদি ইত্যাদি। কর্‌-ধাতুর অসমাপিকা ক্রিয়াপদের তিনটি রূপ পাওয়া গেল—করে, ক'রে, কোরে।

বানানের নৈরাজ্য সেই সময়ে চূড়ান্ত হয়ে উঠল প্রধানত ক্রিয়াপদে।

তখন বাস্তব প্রয়োজনটা দাঁড়াল এই যে, চলিত বাঙলা বানানে স্বেচ্ছাচারী বহুরূপতা দূর করে একজাতীয় শব্দের বানানে একরূপতা বা সমরূপতা আনতে হবে ; কেবল ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রেই নয়—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, সকল পদের ক্ষেত্রেই একরূপতা আনতে হবে।

এই বাস্তব প্রয়োজনটি পূর্ণ করার জন্যই 'বানান-সংস্কার-সমিতি' গঠন করা হয়। বছর দেড়েক ধরে চিন্তাভাবনা করে সমিতি বাঙলা বানানের বাইশটি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেন।

শতকের তৃতীয় পাদের শেষার্ধে বানানের যে সংস্কার তথা নিয়মনির্ধারণ হয়েছিল, অষ্টম পাদের সূচনায় সেই কাজের পর্যালোচনা হতে পারে ; বিচার করা যেতে পারে—এই তেতাল্লিশ বছরে বানানের রাজ্যের নৈরাজ্য কতখানি প্রশমিত হয়েছে।

সম্পূর্ণত হয় নি। এই ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে সমিতিই দায়ী। দায়ী তাঁদের একাধিক **বিকল্পবিধান** ; প্রবল বিরোধিতার মুখে তাঁদের আপস করতে হয়, বলতে হয় : [অহংকার, অহঙ্কার] দুইই চলবে ; [পাখি, পাখী] দুইই চলবে ; [রানী, রাণী] দুইই চলবে। সমিতিকে হয়তো নিরুপায় হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আপস করতে হয়েছিল।

যে বিধানগুলি ছিল বিকল্পবিহীন, বলা যায়, সেগুলির কয়েকটি অনেকাংশে গৃহীত আর সুপ্রচলিত হয়ে গেছে। যেমন, (১) রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ববর্জন ; (২) তদ্ভব শব্দে [য] [ণ] বর্জন—[কাজ, জোড়া], [কান, সোনা] ; (৩) [কালো, ভালো, মতো] ; (৪) ক্রিয়া-পদে অনাবশ্যক ঊর্ধ্বকমা আর হস্‌-চিহ্নের প্রয়োগ বেশ কমে গেছে ; (৫) বিদেশী শব্দে [স্ট] বর্ণের ব্যাপক ব্যবহার ; লাইনো-বর্ণবিন্যাসে [ন্ট, ন্ড] সম্ভব হওয়ায়, [লন্ডন, ইন্টারন্যাশনাল] ইত্যাদি শব্দে [ন] ব্যবহার করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগ, মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রকাশনবিভাগ, দৈনিক-পত্রগুলির বার্তা, টাইপসেটিং আর রীডিং -বিভাগ, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকমণ্ডলী আর প্রকাশন-সংস্থাগুলি বানান সম্পর্কে যদি যথোচিতভাবে আরও একটু সচেতন আর সাবধান হতেন, তাহলে এতদিনে বিকল্পবিহীন বানানগুলি সম্বন্ধে অন্তত সমস্যামুক্ত হওয়া যেত। দুঃখের কথা, তাঁদের দায়িত্ব তাঁরা পালন করছেন না। একেবারে সম্প্রতি এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার উৎকট পরিচয় পাওয়া

গেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক 'কিশলয়'-এ—এই বইয়ে [করো, লেখো, শেখো]-র পাশাপাশি আছে [এস, দেখ] ; আছে [কাল] চুল ; আছে [সরবৎ]।

ফলে, অবস্থা এখন এই : পুরনো সমস্যাগুলির অনেক কটিই টিকে রয়েছে, নতুন সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে। কিছু আত্মম্ভরি লেখকও অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছেন—তাঁরা মনে করেন, তাঁদের রচনার যেমন নিজস্ব স্টাইল আছে, তেমনি বানানেরও নিজস্ব 'ঘরানা' থাকা দরকার। তাঁরা [দিল, নিল, গেল] লিখবেন, কিন্তু [এল] লিখবেন না, সেখানে [ও-কার] যোগ করবেন।

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁর ৬৮ পৃষ্ঠার দীর্ঘ রচনায় এই গুরুতর সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সময়োচিত কাজ করেছেন। এবং, যে প্রস্তাব তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি উপস্থাপন করেছেন—আবার একটি বানান-সংস্কার-সমিতি গঠন করা হোক, এবং বানানের বিকল্প-বিহীন কয়েকটি বিধান সেই সমিতি দিন—এই প্রস্তাবের যুক্তিযুক্ততা অস্বীকার করা যায় না। বানান নিয়ে যে কদভ্যাসপ্রসূত এবং অজ্ঞতাপ্রসূত স্বেচ্ছাচারিতা চলছে, দ্বিতীয় একটি সংস্কার-সমিতি ছাড়া তার নিরসন কিভাবে সম্ভব?

২

বানান সম্বন্ধে মণীন্দ্রকুমারের কয়েকটি তত্ত্বগত নীতি আছে। সেইসব নীতির উপর দাঁড়িয়ে তিনি সংস্কার-সমিতির কয়েকটি সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বা ঔচিত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সংক্ষেপে, তাঁর কয়েকটি বক্তব্য এই :

এক। সমিতির তো সংস্কৃত শব্দে হাত দেওয়ার কথা ছিল না। নিজেদের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে তাঁরা অকারণে (ক) রেফ-এর পর দ্বিত্ববর্জনের বিধান দিতে গেলেন কেন—[সর্ব্ব, কর্ম্ম, কর্ত্তা] বানানে কী এমন ক্ষতি হচ্ছিল? (খ) পদের অন্তস্থিত ম্‌-স্থানে অনুস্বারের বিধানও কি না দিলে চলত না—[অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর] বানান কি বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করছিল?

মেনে নিলাম, করছিল না। সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ অন্যায় হয়েছিল। কিন্তু, অ-সংস্কৃত শব্দের বানান-সংস্কার তো সমিতির অধিকারে ছিল? সেই ক্ষেত্রে, [কর্জ, শর্ত, ফর্দ, কার্বন] বানানের বিধান দিলে তো অধিকারভঙ্গ করা হয় না। তাহলে কি এই বিধান দেওয়া সংগত হত যে, সংস্কৃত শব্দে রেফের পর দ্বিত্ব রক্ষিত হবে, আর, অ-সংস্কৃত শব্দে তা বর্জিত হবে? অর্থাৎ, [কর্ত্তা, সর্ব্ব, কিন্তু শর্ত, কার্বন]—এইরকম বিধান দিলে ভালো হত?

এই দ্বিত্ববর্জনের প্রসঙ্গে, সুনীতিকুমারের মত উল্লেখ করে, মণীন্দ্রকুমার [কার্য, আচার্য] ইত্যাদি বানান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, এগুলি ভুল বানান। কেন ভুল? যুক্তি এই, বাঙলাভাষী কোনো কোনো অঞ্চলে 'কার্য' উচ্চারণে 'কাইর্জ' হয়—দ্বিতীয় 'য' বর্জন করলে সেই অঞ্চলের মানুষ তাঁদের অভীষ্ট উচ্চারণ করতে পারবেন না।

আমাদের অনেকের যা অভিজ্ঞতা, তার থেকে কিন্তু এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করা যায় না। 'কার্য' লেখা হোক, আর 'কার্যা'ই লেখা হোক—দুই ক্ষেত্রেই, যাঁরা 'কাইর্জ' বলেন তাঁরা তাই-ই বলবেন, যাঁরা 'কারজো' বলেন, তাঁরাও তাই-ই বলবেন। সমিতি সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে ধ্বনি-সম্মতির নীতি তো গ্রহণ করেন নি।

এই প্রসঙ্গে, মণীন্দ্রকুমারের একটি মন্তব্য বড়ো অবাক করে দেয়। তাঁর মতে, সমিতি [অহংকার, সংগীত] ইত্যাদি বানান অনুমোদন করার ফলেই, [আতংক, শংকা, শংখ, সংগে] ইত্যাদি বানান দেখা দিয়েছে। সত্যিই কি তাই? কেউ যদি বলেন, না, [সংগ্রাম, সংঘাত, সংশয়,

সংহতি] ইত্যাদি থেকে ঐ-জাতীয় ভুল বানান দেখা দেয়, তাহলে আপত্তি করা যাবে?

আসলে, নিয়ম শিখে আমরা শুদ্ধ বানান লিখি না। বানান শেখার সময় শৈশব ; তখন যাঁরা শিক্ষা দেন, তাঁরা যদি হাতে আর চোখে বানানের শুদ্ধ রূপটি স্থায়িভাবে ধরিয়ে দেন, তাহলেই সঠিক অভ্যাসটি সারা জীবনের মতো রপ্ত হয়ে যায়। বেশির-ভাগ ক্ষেত্রে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাদাতারা তাঁদের কর্তব্য উচিতভাবে পালন করেন না বলেই, শুদ্ধ বানানের স্থির অভ্যাসটি গড়ে উঠতে পারে না।

অ-সংস্কৃত (তদ্ভব বা অর্ধ-তৎসম, দেশজ এবং বিদেশী) শব্দের ক্ষেত্রে, সমিতির কয়েকটি সংস্কারকে মণীন্দ্রকুমার সমীচীন বলে অনুমোদন করেছেন, কয়েকটিকে অসংগত বলে সমালোচনা করেছেন।

লেখকের অনুমোদিত সংস্কারগুলির মধ্যে আছে : [পাখি, বাড়ি, শিষ, পুব, চুন] ইত্যাদি বানান। এই সংস্কারটির অন্তঃশায়ী "মূল নিয়মটিকে" লেখক "পূর্ণ সমর্থন" জানিয়েছেন। বিদেশী [সীল, ঈস্ট, স্পুল] ইত্যাদি শব্দে ঈ-উ-যোগের নিয়মটিও, লেখকের মতে "খুবই ভাল"।

"সংস্কারের পূর্বে ক্রিয়াপদের বানানে" যে "উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল দুঃসহ", সেখানে, লেখকের বিচারে, "সংস্কারের পরে মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা এসেছে বটে, কিন্তু ঈপ্সিত স্থিরতা আসে নি।" তার একটি কারণ লেখক যথার্থভাবেই নির্দেশ করেছেন : "বিকল্প-বিধান"। লেখকের ধারণা, সমিতি যদি তাঁদের প্রাথমিক সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকতেন, (চাপে পড়ে?) বিকল্পের বিধান না দিতেন "ক্রিয়াপদের বানানে শৃঙ্খলা আসতে পারত।" খুবই যুক্তিযুক্ত বিচার। এই ক্ষেত্রে সমিতির প্রাথমিক প্রস্তাবটি ছিল এই : "চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের বানানে অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্বকমা (ইলেক) বা হস্-চিহ্ন অনাবশ্যক, কিন্তু ও-কার ধ্বনি বুঝাইবার জন্য কয়েকটি রূপে ঊর্ধ্বকমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে।"

যেসব সংস্কার লেখক অনুমোদন করতে পারেন নি, তার দুটি হল [জ-য] আর [ণ-ন] সংক্রান্ত। [কাজ, জাউ, জুত, জোড়া, জোত] ইত্যাদি বানান লেখক অনুমোদন করেন না, [কায, যাউ, যুত, যোড়া, যোত] ইত্যাদি বানান লেখকের অভিপ্রেত। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি দুটি প্রথমত, [জ, য] বাঙালীর উচ্চারণে এক ; দ্বিতীয়ত, য-ব্যবহারে শব্দগুলির বিবর্তন বানানে প্রকট হয়।

প্রায় অনুরূপ কারণেই, [বরণ, পরাণ, কাণা, কোণা, পুণ্যি, মাণিক] ইত্যাদি বানান লেখক পছন্দ করেন : "মূর্ধন্য-ন থাকলে শব্দের পরিচয় বিঘ্নিত হত না।"

বানানের উপর শব্দের ইতিহাস প্রকাশ করার দায় চাপানোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। বানানের ক্ষেত্রে ধ্বনিসম্মতির নীতিকে তিনি যে একেবারেই আমল দিতে চান না—প্রশ্ন এই নিয়েও উঠতে পারে।

এইরকম আরও আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে মতৈক্য হবে না।

অনৈক্যটা আসলে দৃষ্টিভঙ্গির। মণীন্দ্রকুমারের বিচারে, বানান শব্দের গঠনকে প্রকাশ করবে, শব্দের বিবর্তনের ইতিহাসকে প্রকট করবে।

বানানকে সর্বাংশে ধ্বনিসম্মত করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়—এই সত্য বুঝেই, সংস্কার-সমিতির অনেকেরই বিচার ছিল : সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে, ওই ভাষার ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য না করে, এমন ধ্বনিসম্মত সংস্কারসাধন যার রূপ কতকটা সরল, যা চোখের বহুদিনের অভ্যাসকে তেমন পীড়া দেবে না, এবং, সবচেয়ে বড়ো কথা, ঐতিহ্যের সঙ্গে যা বিচ্ছেদ ঘটাবে না। অ-সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রেও, এই দৃষ্টিভঙ্গিই ক্রিয়াশীল ছিল। সংস্কার-সমিতি যদি শতাব্দীর পঞ্চম পাদে

আর-একবার আলোচনায় বসতেন, এবং উদ্ভূত সমস্যাগুলিকে পুনরায় বিচার করে, বিকল্প-বিধানগুলিকে অন্তত প্রত্যাহার করে নিতেন, তাহলে স্বেচ্ছাচার হয়তো এমন নিরঙ্কুশ হয়ে উঠত না।

বানানের রাজ্যে নৈরাজ্য যে আছে, উৎকট আকারেই আছে এবং বাড়ছে, এবং তার আশু প্রশমন যে বিশেষ প্রয়োজন—এই কথাগুলি যথেষ্ট জোর দিয়ে বলে লেখক মহৎ উপকার করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ সম্প্রতি যে 'বাংলা বানানের নিয়ম সমিতি' গঠন করেছেন, আশা করা যায়, তাঁরা মণীন্দ্রকুমারের বক্তব্য আর মন্তব্যগুলি যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।

অশোক ঘোষ

টপ্পা সংগ্রহ—শিখা রায়চৌধুরী। জিজ্ঞাসা, কলকাতা-২৯। মূল্য পনেরো টাকা।

'টপ্পাসংগ্রহ' স্বরলিপির বই। শ্রীমতী শিখা রায়চৌধুরী ছাপ্পান্নটি টপ্পার স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন। এই গানগুলি তিনি শিখেছেন শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ মহাশয়ের কাছে। এই সংগ্রহে শোরি, হমদম, আদমশাহী, সদারঙ্গ—এঁদের রচনা সংকলিত হয়েছে।

গ্রন্থটি ছোট ; কিন্তু গুণগত বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এর আগে কোনো কোনো স্বরলিপি-গ্রন্থে কিছু কিছু টপ্পার স্বরলিপি দেখা গেছে বটে, কিন্তু বাংলার প্রযুক্ত সংগীতের বিষয়ে যেসব বই পাওয়া যায়, তার মধ্যে এত অধিকসংখ্যক টপ্পার স্বরলিপি আমার নজরে পড়েনি। লেখিকা অতিশয় যত্ন-এবং নৈপুণ্য-সহকারে একটি দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। এই গ্রন্থটি এতদ্দেশে সংগীতের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অভাব পূরণ করবে। লেখিকা তাঁর স্বরলিপিগুলি তালে না সাজিয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন ; তিনি বলছেন, "এই গানগুলিকে তালবদ্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস করিনি। কেননা এসব টপ্পা তালবদ্ধ করে দিলে টপ্পার গায়কী বজায় রাখা একটু শক্ত হয়ে পড়ে।" আমিও এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করি। সম্প্রতি আমার এক সংগীতজ্ঞ বন্ধু প্রকাশের জন্য কিছু নিধুবাবুর টপ্পার স্বরলিপি চেয়েছিলেন। আমি এইগুলি তালে স্বরলিপি করবার সময় প্রত্যক্ষভাবেই উপলব্ধি করি যে সত্যিই এই প্রয়াসে গায়কী বেশ খানিকটা মাঠে মারা যায়। অবশ্য এসব গান যাঁরা তোলেন তাঁরা সংগীতে যথেষ্ট পারদর্শিতা অবলম্বন করেই সচেষ্ট হন এবং তাঁদের স্বকীয়তাদ্বারা স্বরলিপি থেকে তোলা গানগুলির পূর্ণতা সাধন করেন ; কিন্তু অনেকে আবার তাতে সমর্থ হন না ; পারদর্শিতা সত্ত্বেও তাঁরা একটা বাঁধাধরা নির্দেশ পেতে চান। তথাপি, ছাড়াভাবে স্বরলিপি করাই বোধহয় শ্রেয়, কারণ চেষ্টা করলে তালে মিলিয়ে নেওয়া সাধ্যাতীত নয় ; কিন্তু গায়কী নষ্ট হলে টপ্পার অনেকখানি আবেদন ব্যর্থ হয়ে যায় ; তার চেয়ে তাল ছাড়া গাওয়াটাও বোধ হয় ভালো, কেননা তা মনকে তৃপ্তি দিতে পারে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে অনেকে তবলায় ঠেকা পরিহার করেন।

গ্রন্থারম্ভে নারায়ণ চৌধুরী একটি সুন্দর ভূমিকা সংযোগ করে দিয়েছেন। তিনি বাংলায় প্রচলিত টপ্পার ভিন্নতর প্রণালীর উল্লেখ করে প্রসঙ্গটিকে মূল্যবান করেছেন। লেখিকা যে স্বরলিপি দিয়েছেন তাতে দেখা যাবে, পশ্চিমী টপ্পার কম্পনগুলি খুব দ্রুততাযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, এইসব টপ্পার এইটিই বৈশিষ্ট্য। বাংলার টপ্পায় কম্পনভাব এত দ্রুত নয়, তার দানা আন্দোলনযুক্ত এবং তার ফলে বাংলা গানের আবেদনে একটি বাঙালী নমনীয় অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় ঈষৎ দ্রুততানের রীতি অনুসরণ করতেন। লালচাঁদ বড়ালের রীতিও

তদনুরূপ ছিল। বিশেষ করে লালচাঁদের গিটকিরি ছিল অসাধারণ। আজ পর্যন্ত এত তৈরি তানের নিদর্শন আর কারুর কাছ থেকে পাইনি। কিন্তু কালীপদ পাঠক মহাশয় ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি আন্দোলনযুক্ত জমজমার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ছিলেন পুরোপুরি আর্টিস্ট, শিল্পী। বাংলা টপ্পার পদাংশ ভেঙে কিভাবে বিস্তার করতে হয় এবং এই প্রয়াসে টপ্পা কিভাবে সহায়ক হয়, সেটি তাঁর মুখে না শুনলে বোঝা যেত না। আমার অসামান্য সৌভাগ্য হয়েছিল এই আচার্যের কাছে দিনের পর দিন শিক্ষা গ্রহণ করবার। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গানের ভাণ্ডার তিনি আমার কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। নারায়ণবাবু এই দুজনের নাম করেছেন বলেই আমি কিছুটা স্মৃতিচারণের উচ্ছ্বাসকে রোধ করতে পারলুম না। কিন্তু আরও অনেকেই টপ্পায় পারদর্শী ছিলেন। নগেন ভট্টাচার্য মহাশয় পশ্চিমী টপ্পার সঙ্গে বহু বাংলা টপ্পার ঐক্য এবং অনৈক্য দেখাতেন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর বৌবাজারের বাড়িতে। আমি তাঁর এক ছাত্রের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতুম, এবং যখনই যেতুম তখনই তিনি বহু চমকপ্রদ কাহিনী শোনাতেন। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের বাল্য, কৈশোর আর তারুণ্যে এমন বাঙালী ধ্রুপদী বা খেয়ালী কমই ছিলেন যাঁরা কিছু না কিছু টপ্পা না জানতেন। তা ছাড়া, রমজান মিঞা কলকাতাতেই তাঁর সংগীতজীবন অতিবাহিত করেছিলেন বলা চলে। তাঁরও অনেক শিষ্য ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ মহাশয় সংগীতসমাজে সুপরিচিত। অনেকে তাঁকে ধ্রুপদী বা ধামারী বলে জানেন, কিন্তু তাঁর টপ্পার ভাণ্ডারও যে বহুসম্পদযুক্ত তা হয়তো অনেকের জানা নেই। তাঁর শিষ্যার কাছ থেকে এই গানগুলি পেয়ে বাংলার সংগীতসমাজ গভীরভাবে উপকৃত হলেন। জানা গেল, কৃষ্ণদাসবাবু এই টপ্পাগুলিই পেয়েছিলেন স্বনামধন্য পণ্ডিত কেশব ঢেকনৈজীর কাছ থেকে।

লেখিকা গ্রন্থের নিবেদনে শোরি মিঞা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদান করেছেন। সাধারণভাবে টপ্পারচয়িতাদের জীবনকাহিনী বড় একটা পাওয়া যায় না। অধুনালুপ্ত "সঙ্গীতবিজ্ঞান-প্রবেশিকা" নামক মাসিকপত্রে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা বেরিয়েছিল ; হিন্দী পত্রপত্রিকাতেও আজকাল কিছু নিবন্ধাদি বেরুচ্ছে ; কিন্তু টপ্পা আজও কম গায়ক-গায়িকা শেখেন এবং গেয়ে থাকেন,—তাই এ বিষয়ে আলোচনা বহুলাংশে কম।

টপ্পা শব্দটা ফারসী না হওয়াই সম্ভব, কেননা "ট" অক্ষরটি পারসিকেরা ব্যবহার করেন না বা তাঁদের বর্ণমালাতেও ওটি নেই। "তপ্পা" বলে একটা শব্দ আছে বটে, কিন্তু তাতে উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বত বোঝায়। তুফাতুল হিন্দ বা রাগদর্পণ যে "ডপা" শব্দটি প্রদান করেছেন, সেটি অমূলক নাও হতে পারে, কেননা "ডপট্" (ডপট্না) শব্দে 'গ্যালপ' বা অশ্বারোহণের গতি বোঝায়। এটি বর্তমানে হিন্দী শব্দ। উর্দু বা হিন্দীতে মূল শব্দটি "টপা" (টপানা) ; প্রচলিত কথার মাধ্যমে এটিকে টপ্পা বলা হয়। এর অর্থ লম্ফপ্রদান (কজ টু বাউন্ড, লীপ ওভার)। টপ্পা যে উষ্ট্রচালকদের গান ছিল তার পিছনে একটা যুক্তি আছে, এবং এর সঙ্গে আসল সম্বন্ধ হচ্ছে বর্তমানে আমরা যেটিকে "জমজমা" বলি সেই শব্দটির। সেযুগে উটের পিঠে চড়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে (অধিকাংশই ইরানদেশীয়) ব্যবসায়ীরা এদেশে আসতেন। তাঁরা সাহারার মরু অঞ্চল অতিক্রম করে গান গাইতে গাইতে আসতেন। উঠের পিঠে দোলা লাগার ফলে তাঁদের গলায় নাকি একটা কম্পনযুক্ত তানের ঝোঁক প্রকাশ পেত। ভারতে পৌঁছোবার পর সাধারণত পাঞ্জাবের লাহোরে উঠ বদল হত। এই সূত্রেই নাকি এই ধরনের গান পাঞ্জাবেই প্রসার লাভ করে। "জমজমা" আরবী শব্দ ; কিন্তু ফারসীতে এই শব্দে গানই বোঝায়। জমজমা-পরদাজ বা জমজমা-সন্জ্ ;—এই শব্দে গায়ক বুঝিয়ে থাকে। মৃদু সুরে মৃদুভাবে সুললিত কবিতার সংগীতরূপায়নকেই এই শব্দে বিশেষভাবে বোঝানো হয়। সেইদিক দিয়ে চিন্তা করলে টপ্পা মূলত পারসিক রীতি, সেটা

স্বীকার করতে হয়। টপ্পা থেকে ঠুংরি গানের বিকাশ হয়েছে কিনা বলা শক্ত, না হওয়াই সম্ভব ; কেননা উভয় রীতি একই কালে প্রচলিত ছিল এবং একটির সঙ্গে আর-একটির সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়নি। এটা জানা যায় যে, এদেশের বারোয়া সুরের সঙ্গে একটি পারসিক মেলডির মিশ্রণে এই রীতির উদ্ভব হয়েছিল।

লেখিকা টপ্পাগুলিতে প্রযুক্ত বহু শব্দের অর্থ ডকটর হীরালাল চোপরার মতো অথরিটির কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন ; শুধু তাই নয় ; অনেক ক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যায় গানগুলি সহজ-বোধ্য হয়েছে। এই সংযোজনও তাঁর গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছে। একটি কঠিন এবং পরিশ্রমসাধ্য কাজ সম্পাদনের জন্য লেখিকা অভিনন্দনের যোগ্য।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

সমুদ্রপ্রতিমা—রূপান্তর : বেলা চক্রবর্তী। সুবর্ণরেখা, কলকাতা-৯। মূল্য দশ টাকা।

চেখভের ছটি একাঙ্ক—রূপান্তর : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ভুবনলক্ষ্মী প্রকাশনী, কলকাতা ৬। মূল্য বারো টাকা।

মালবাজারের মা মালতী—রূপান্তর : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। রূপা, কলকাতা-৭৩। মূল্য পনেরো টাকা।

সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্য আর যাত্রাপালার অঙ্গনেই বাংলার নাট্যচর্চা এককালে অব্যাহত ছিল। আর থিয়েটারের আমদানি হল এদেশে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের পর। ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রেরণায় রঙ্গ-মঞ্চে নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত। এই নতুন মাধ্যমটিকে কাজে লাগাবার জন্যে তাগিদ দেখা দিল নতুন নাটক রচনার। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ও সেই তাগিদকে আরো নিবিড় করে তুলল। ধর্মক্ষেত্র থেকে আহৃত উপাদানে নাটক রচিত হত। ইতিহাস আর পুরাণের বিষয় নিয়েও প্রচুর নাটক লেখা হতে লাগল। আর সেই সঙ্গে বিদেশি সাহিত্য থেকে উপাদান নিয়ে বা প্রায় অনুবাদ করে বাঙালীর পোশাকে মুড়ে দেওয়া হল নাটককে। গোড়ার দিকে অনুবাদ ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গীকরণের মধ্য দিয়ে বহু বিদেশি নাটক বাংলার মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এমনভাবে নাটকগুলো রূপান্তরিত হয়েছিল যে, চট করে ধরা যেত না যে, সেগুলো আসলে বিদেশি জিনিস। তবে এখনকার মানদণ্ডে তখন-কার ভাষান্তর আড়ষ্ট আর অপটু বলে বোধ হবে। এবং বঙ্গীকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে মূলের যে বিয়োজন এবং নতুন যে সংযোজন করা হয়েছিল, সেখানেও ধরা পড়বে বহু খামতি। তবু বাংলার মঞ্চে নতুন গড়নের নাটক এবং অভিনব ভাবনার আলো-বাতাস বহন করে এনেছিল সেই নাটকগুলো। আজও সেই ধারাটি অব্যাহত চলেছে।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশীয় লেবেডেফ প্রথম রঙ্গ-মঞ্চে যে-নাটক পরিবেষণ করেছিলেন, তা অনুবাদক। কলিয়েরের নাটক L'Amour Medicin অবলম্বনে Love Is the Best Doctor এবং রিচার্ড জোড়রেলের The Disguise। পরবর্তী কালে মলিয়েরের ঐ নাটক অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র রচনা করেছিলেন 'খ্যায়সা কা ত্যায়সা'। রাসিনের Ipluigenie নিয়ে সরোজিনী ও Alexandre নিয়ে পুরুবিক্রম লিখেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্স্ওয়ার্দির The Skin Game নিয়ে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী লিখেছিলেন নন্দরানীর সংসার। সরাসরি অনুবাদ ছিল গিরিশচন্দ্রের ম্যাকবেথ (১৮৯৯) আর হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের রোমিও জুলিয়েট (১৮৯৭)।

এই শতকে পৌঁছে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল

কবিতা, গল্প আর উপন্যাসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেই প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়ল নাটকের ওপর।

বহুরূপী নাট্যসম্প্রদায়ের উদ্যোগে রূপান্তরিত নাটকের সফল এবং জনপ্রিয় প্রযোজনা বাংলার থিয়েটারে রূপান্তরের বান ডেকে আনল। রূপান্তর, অনুপ্রাণনা আর অনুপ্রেরণা নিয়ে বহু বিদেশি নাটক বাঙালী সেজে হাজির হল মঞ্চে। ইবসেন, চেকভ, ইয়োনেস্কো, বেকেট, মিলার, প্রিস্টলি, সার্ত্র, পিরানদেলও, আনুই, তলস্তয়, গোগোল, ব্রেশ্‌ট্‌ প্রমুখ বহু বিদেশি আর আধুনিক নাট্যকার বাংলার থিয়েটারে বেশ বড় একটা স্থান দখল করে নিলেন। অবশ্য তার জন্যে সব কৃতিত্ব গ্রুপ থিয়েটারের প্রাপ্য। তাঁরাই বাংলা থিয়েটারের জানলাগুলো খুলে দিয়েছিলেন এই-সমস্ত নাটকের বাতাস এনে।

ইবসেন বাংলার মঞ্চে বহুবার হাজির হয়েছেন। বিশেষ করে বহুরূপীর 'পুতুলখেলা' এবং 'দশচক্রে' মাধ্যমে। ইবসেনের 'গোস্টস' নাটকটিও সমাদৃত হয়েছিল। নরওয়ের নাটকার ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) নাটকের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছিলেন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থা এবং দাম্পত্য সম্পর্কের ওপর তিনি কঠোর বাস্তবতার আঘাত হেনেছিলেন খোলাখুলিভাবে। এই যে সমাজের ভিতরকার নির্বুদ্ধিতা আর অসাম্য, দাম্পত্য জীবনে পতির আড়ালে পত্নীর স্বাধীন সত্তার বিলোপ, তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর বিদ্রোহের আলো জ্বেলে দিলেন ইবসেন, খনন করলেন প্রতিরোধের পথ। বাংলা থিয়েটারে বঙ্গীকরণের মধ্য দিয়ে সেই প্রতিবাদই ধ্বনিত হল। আলোচ্য নাটকটি ইবসেনের The Lady from the Sea অবলম্বনে রচিত। সমুদ্র এ-নাটকে সত্যের প্রতীক। নাবিক যতীন্দ্রর সঙ্গে রজনীর বিয়ে হয়েছিল সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে গান্ধর্ব প্রথায়। দীর্ঘ অনুপস্থিতি এবং সময়ের দীর্ঘ বিরতিতে যতীন্দ্রর প্রতি রজনীর টান এসেছিল কমে, কিন্তু ভয়ের মতো বিঁধে ছিল বিবাহের সেই সংস্কার। তবু রজনী বিয়ে করেছিল বিপত্নীক ডঃ সান্যালকে। তাঁর সাবালিকা দুটি মেয়েকে নিয়ে সংসার বেঁধেছিল রজনী। কিন্তু কিছুতেই মেলাতে পারছিল না ওদের সঙ্গে। অকস্মাৎ যতীন্দ্রের আবির্ভাব এবং রজনীর প্রতি দাবি ঘনিয়ে তুলল সংকট। চাপিয়ে-দেওয়া সিদ্ধান্ত নয়, নিজের স্বাধীন ইচ্ছাতেই সিদ্ধান্ত নেবে রজনী—নারী তথা পত্নীর এমন একটি সম্মান রজনীর মধ্যে ঘটিয়ে দিল বিপ্লব। ডোরা বেরিয়ে গিয়েছিল দরজা খুলে, কিন্তু এলিডা (রজনী) দরজা এঁটে খুলে দিল জানালা। নারী-পুরুষের সমান-অধিকারের অঙ্গীকার পূর্ণতা দিল তার মানবী-সত্তাকে। রূপান্তরের ক্ষেত্রে বেলা চক্রবর্তী ইবসেনীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। পরিবেশ রচনায় তাঁর ভৌগোলিক নির্বাচনও সংগত। চরিত্রগুলো স্পষ্ট ঋজুরেখায় স্থাপত্যের অবয়ব নিয়ে উপস্থিত। সংলাপ কোথাও আড়ষ্ট নয় এবং নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে নাটকটির সম্ভাবনা প্রচুর। বাংলা সাহিত্যে রূপান্তরের ক্ষেত্রে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন।

ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার হিসাবে চেখভের (১৮৬০-১৯০৪) বিশিষ্ট মর্যাদা আছে রুশ সাহিত্যে। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত চিররুগ্ণ চেখভ ব্যাকুল হয়ে থাকতেন মহৎ কিছু রচনার অভীপ্সায়। তাঁর সেই অন্বেষণের মানসিক ক্লান্তির অবকাশে ছোট ছোট কিছু নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তিনি সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন সৃষ্টিশীলতার অক্ষুণ্ণতায়। তিনি বেছে নিতেন হালকা কিছু ঘটনা আর নিজস্ব চারিত্রে বিশিষ্ট মানুষের কিছু বিরল মুহূর্ত। তাঁকে টানত জীবনের অদ্ভুত আর অসীম বৈচিত্র্য। নিজের জীবনের বিষাদ তিনি সঞ্চার করতে চাননি তাঁর নাটকে। কোনো বিয়োগ-ব্যথায় ভারাক্রান্ত নয় তাঁর নাটিকা। চরিত্রের একগুঁয়েমি চপলতায় তিনি উড়িয়ে দেন নির্মল হাসির

কাশফুল। তাঁর নাটিকায় চরিত্রগুলোকে একদিকে যেমন বেয়াড়া ধরনের মনে হয়, তেমনই ইচ্ছে করে ভালোবাসতে। বাংলা থিয়েটারে চেখভকে সত্যভাবে উপস্থিত করেন নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠী 'মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী' নাটকের মধ্যে। একাঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে বাঙালী দর্শকের কাছে চেখভকে জনপ্রিয় করে তোলার সমস্ত কৃতিত্ব সম্ভবত একা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। তাঁর রূপান্তর, নির্দেশনা এবং চরিত্রাভিনয় সেই প্রযোজনাগুলোকে এক দুর্লভ সাফল্যে মণ্ডিত করেছিল। আলোচ্য গ্রন্থে ছ-টি একাঙ্কের মধ্যে পাঁচটি বহু-অভিনীত এবং একটি এই সংকলনের জন্যে সদ্য-রূপান্তরিত ও সংযোজিত। 'নানা রঙের দিন' এক বয়স্ক অভিনেতার আত্মসমীক্ষা। নাটকটি আদৌ হালকা নয়। সত্যপ্রকাশের মহিমায় সমবেদনাবাহী। তবে নাটিকার শেষে বাঙালী অভিনেতা রজনী চাটুজ্যে শেক্সপিয়রের মূল ওথেলো আউড়ে গেল, এখানে খটকা লাগে। সমভাবাপন্ন কোনো বাংলা নাটকের চরিত্রের সংলাপ যুক্ত হলে আরো জীবন্ত হত চরিত্রটা। 'প্রস্তাব' নাটকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে মজার পরিস্থিতি রচনায় চেখভের সূক্ষ্ম রসবোধ রূপান্তরেও গাঢ়তা পেয়েছে। 'শরতের মেঘ' নাটকেও ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই বিয়ের প্রস্তাবই এক নিপুণ ব্যঙ্গে হাসি ফোটায় ঠোঁটের কোণে। ঠোঁট কিছুটা বেঁকিয়ে। 'শুভবিবাহ' নাটকে সামাজিক পরিস্থিতির তরল মুহূর্তের মধ্যেও দু-একটা গোপন খোঁচার আমেজ আছে। তত তীব্র না হলেও। এক ডেলি প্যাসেনজারের করুণ কাহিনী নাটকের অসহায় বোঝাবহনের তীব্র শ্লেষাত্মক হাসির অন্তরালে করুণার প্রস্রবণ না বইলেও সহমর্মিতার আবেদন ফুটে ওঠে। শেষ নাটক 'তামাকু সেবনের অপকারিতা'। একটিমাত্র চরিত্র। তামাকু সেবনের অপকারিতা সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে সাংসারিক ঘোরপাঁচ নিয়ে বক্তার সভয় প্রতিবেদন নিঃসন্দেহে অভিনব। তবে এ-নাটকের সাফল্য শক্তিমান অভিনেতার ওপর নির্ভরশীল। নিজে অভিনেতা-নির্দেশক হওয়ায় উত্তুঙ্গ মুহূর্ত রচনায় অজিতেশ সহজেই সিদ্ধকাম। তাঁর সাবলীল রূপান্তরে অনুবাদের গন্ধ লাগেনি।

জার্মানিতেই শুধু নয়, সারা বিশ্বে ব্রেশ্‌ট্‌ (১৮৯৮-১৯৫৬) নাট্যকার-প্রযোজক হিসেবে এক প্রবাদ-পুরুষ। প্রযোজনার ভাবনার মধ্যেই তিনি বইয়ে দিয়েছেন অভিনব স্রোত। আধুনিক নাট্যশৈলীর প্রবক্তা হিসেবে একদিকে রাশিয়ার স্তানিস্লাভস্কি, অন্যদিকে জার্মানির ব্রেশ্‌ট্‌—দুজনের দানই স্মরণীয় এবং মূল্যবান। ব্রেশটের প্রয়াসে বিস্তার লাভ করেছে মঞ্চের সম্ভাবনা। ব্রেশ্‌ট্‌ তাঁর থিয়েটারের নামকরণ করেছিলেন 'এপিক থিয়েটার'। এই থিয়েটারের ধরন কিছু ভিন্ন। দর্শক নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাবেন না এই থিয়েটারে, একাত্ম হবেন না চরিত্রের সঙ্গে, অভিভূত হবেন না অভিনেতার ভাবাবেগে। তাঁকে সচেতনভাবে মনে রাখতে হবে যে, তিনি থিয়েটার দেখছেন। দর্শকই হয়ে উঠবেন দৃষ্ট ঘটনার সমালোচক। দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিছু ভাবনা-চিন্তাও করবেন এবং নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন প্রয়োজনমতো। এই অ্যালিয়েনেশন বা অনন্বয় সৃষ্টির জন্যে এই থিয়েটারে থাকবে গান, নাচ, ছবি, স্লাইড, পোস্টার, মঞ্চোশ, প্রকট রূপসজ্জা, রং, আলো, অন্ধকার, কবিতা, গল্প, শব্দ ইত্যাদি। অভিনেতাদেরও কিছু কৃত্য আছে। তাঁরা এমনভাব সংলাপ বলবেন যাতে দর্শক মনে করেন যে, এটা অন্য লোকের কথা, তিনি অভিনয় করে দেখাচ্ছেন। অভিনেতাকে এমনভাবে অভিনয় করতে হবে যাতে তিনি বোঝাতে পারেন যে, নাটকের ঘটনাগুলো আগেই ঘটে গেছে, এখন তিনি অভিনয়ের মাধ্যমে সেটা দেখাচ্ছেন মঞ্চের ওপর। প্রবেশ-প্রস্থানের ক্ষেত্রেও অভিনেতার বাস্তবসম্মত বা পারম্পর্যযুক্ত হওয়া প্রয়োজন নেই। সর্বোপরি, দর্শকদের নিরপেক্ষ চিন্তাশক্তির ওপর সমাজচেতনার আলো ফেলতে হবে এমনভাবে

যাতে তাঁরা জাগ্রত বিবেকে সক্রিয় হবার মতো কিছু নিরাসক্ত মুহূর্ত খুঁজে পান। ব্রেশ্‌টের এই অভিনব থিয়েটারের প্রেক্ষাপটে রয়েছে তৎকালীন জার্মানির পরিস্থিতি। আলোচ্য নাটকটি জোয়ান অফ আর্কের কাহিনী নিয়ে নতুন ব্যাখ্যায় রচিত ব্রেশ্‌টের ডি হাইলিশে ইয়োহান্সা ডের্ স্‌লাখ্‌ট্‌হকে নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত। শ্রমজীবী মানুষের চৈতন্য-জাগরণের নাটক। মালতী যখন শ্রমিকদের আত্মিক মোক্ষের পথে নিয়ে যাবার সাধনায় উপলব্ধি করল যে, শ্রমিকরা মোক্ষ নয়, চায় প্রাণধারণের দিনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্তি, তখন সে বুঝতে পারল "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়," "পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"। কিন্তু যে অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক কারণে জোয়ানকে, ইয়োহান্সাকে বানিয়ে তোলা হয়েছিল দেবী, ঠিক সেই কারণেই মালতীর প্রসন্ন প্রভাবকে আচ্ছন্ন করার জন্যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রামদাসের চক্রান্তে মালতীর ওপর দেবীত্ব আরোপ করা হল তার দেহান্তে। ব্রেশ্‌টের সমস্ত রীতি-পদ্ধতিই এই নাটকে সযত্নে রক্ষিত। অজিতবাবু সিদ্ধহস্ত নাট্যকার। এর আগে তিনি বহু নাটক সফলভাবে রূপান্তরিত করেছেন। এই নাটকেও সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তবে গানের ক্ষেত্রে তাঁর বাণীবন্ধ যতই সুরের অপেক্ষা রাখুক, ছন্দ বা মিলে সেগুলো কিন্তু সুষমার ঝংকার তুলতে পারেনি। এই রূপান্তরের দুর্বলতা সেখানে।

নাটকের প্রাণ মূলত মঞ্চের প্রযোজনায়। অভিনয়ের জাদু এবং প্রযোজনার স্পন্দন না লাগলে নাটকে প্রাণসঞ্চার হয় না। তবু নাটক পড়ার মধ্যেও এক ধরনের অভিজ্ঞতা আছে। এই রূপান্তরিত নাটকগুলোর মধ্যে একটা সহজ সত্য প্রকাশ পেয়েছে যে, এই আশির দশকেও বাঙালী জীবনে এই নাটকগুলোর বক্তব্য কী নিদারুণভাবে বাস্তব। ইবসেন, চেখভ আর ব্রেশ্‌টের কষ্টি-পাথরে আমাদের সোনা যাচাই করার সাহসের মধ্যে প্রগতির ইঙ্গিত লক্ষণীয়। কেননা ব্রেশ্‌টের সেই ব্যাকুল ডাক আমাদের অন্তরেও প্রতিধ্বনি তোলে— "change the world, it needs it !"

তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জ্বালামুখে কবিতার—উত্তম দাশ। কবি ও কবিতা, কলিকাতা-৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

নিজের অনুভবকে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করতে পারার ক্ষমতা যদি সার্থক কবিকর্মের নিদর্শন হয়, তবে উত্তম দাশের কবিতা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

এই সংযতবাক, মৃদুভাষী কবি সহজ দাক্ষিণ্যে পাঠককে প্রবেশ করতে দেন নিজের অনুভূতির গভীরে। আমাদের সবার মধ্যে যে 'একজন একলা আছে।' যে 'লোডশেডিং-এ মোমের আলোয় কবিতা লেখে।' বা লিখতে চায়, উধাও-হয়ে-যাওয়া আত্মাটির জন্য তার গোপন চোখের জল তিনি মুছিয়ে দেন পরম মমতায়। তাকে হাত ধরে নিয়ে যান সেই বিদেশযাত্রায় যেখানে 'মাঝে মাঝে আমি বেড়াতে যাই। দুঃখ হলে যাই সুখ হলে যাই।'

তাঁর কবিতা অভিজ্ঞতার অতিকথনবর্জিত হৃদ্য উচ্চারণে পাঠকহৃদয়কে উষ্ণতায় ভরে দেয়। 'চাঁদের কথা', 'শব্দেরও গন্ধ থাকে', 'রানীবাঁধ', 'কিছু কিছু প্রাণী আছে' প্রভৃতি কবিতায় হতাশা, যন্ত্রণা, তিক্ততা, ব্যঙ্গ—সবই সংযত ভাষণে সুমিত বলেই পাঠকের আবেগকে সহজে স্পর্শ করে।

উত্তম দাশের রচনার সবচেয়ে বড় গুণ সম্ভবত বাকভঙ্গির আয়াসহীন স্বচ্ছতা। জটিলতম বিষয়কেও তিনি সহজ পরিবেশননৈপুণ্যে অসামান্য স্বাদুতায় ভরে দেন। 'উত্তরাধিকার' বা 'দেখে নিতে চাই' ইত্যাদি কবিতা তার সাক্ষ্য। 'শিল্পের প্রোথিত দরজা'য় তাঁর দৃঢ় অথচ মৃদু উচ্চারণ প্রায় প্রার্থনামন্ত্রের মতো। শব্দকে অনেক ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেন গাণিতিক সংকেতের মতো।

'ফটোগ্রাফ' কবিতায় এই রীতি সার্থকভাবে ব্যবহৃত। 'চাপন হাসি', 'ল্যাস পেপার', 'পেয়ে যাবেন' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছের ব্যবহার চমৎকার তাৎক্ষণিক ছবি তুলে ধরে। কখনো কখনো অবশ্য এ অভ্যাস দুর্বলতার কারণ হয়েছে। 'নরম গোপন থাকে' কবিতার শেষ স্তবকে 'গোপন থাকে' শব্দ দুটির পুনরাবৃত্তিতে প্রথম দুই স্তবকে ঘনায়িত অনুভবের গভীরতা বিক্ষিপ্ত।

ছন্দের পরীক্ষায় উত্তম দাশের উৎসাহ লক্ষণীয়। মাঝে মাঝে তিনি কবি অমিয় চক্রবর্তীকে মনে করিয়ে দেন। 'নকসা' কবিতায় জীবনের জ্যামিতিক পরিমিতি পংক্তিসজ্জার সাহায্যে চমৎকার রূপায়িত। তবে 'বন্যা' কবিতায় নামের সঙ্গে শব্দসৃষ্টি ও ছন্দোবিন্যাস ততটা খাপ খায় নি বলে মনে হয়। বিশেষত বাংলার মানুষের মনে বন্যা বলতে যে কুলপ্লাবী জলকল্লোল বা দিগন্তব্যাপী স্তব্ধতার চিত্র ভেসে ওঠে, তার পাশে এই ছোট ছোট পংক্তিতে গাঁথা জাপানী ছবি ঈষৎ কৃত্রিম ঠেকে। 'ভার্স লাইবার' ব্যবহারে কবি দক্ষ। 'নয়া পল্টনের সবুজ' কবিতায় ক্রমশ-ছোটো-হয়ে-আসা পংক্তিবিন্যাস স্মৃতির বিলীয়মান ধূসরতাকে যেন দৃশ্যমান করে তোলে।

সুমিতা মিত্র

পরবাসী ঘরে ঘরে—চিত্ত ঘোষ। সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা ৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

কবি চিত্ত ঘোষের 'পরবাসী ঘরে ঘরে' কবিতার বইটি বেশ কয়েকবার নির্জন মনে পড়া গেল। কবিতাগুলো পড়তে গিয়ে মনের মধ্যে ফেলে-আসা মাতৃভূমি এবং গ্রামবাংলার স্নিগ্ধ ছবি মনের মণিকোঠায় গভীরভাবে নাড়া দেয়। আমি বিহ্বলভাবে চুপচাপ বইটি নিজের কোলে রেখে উদাস হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু সামনে কর্কশ পলেস্তরা-খসা দেওয়াল। শীতল নদী সবুজ ধানখেত নেই, নেই ঘুঘু-সইএর গান। এই মিছিলের শহরে বারে বারেই আমরা হোঁচট খাই।

আমরা কাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছি। সুকুমার ভাবনাচিন্তা আমাদের মনের মধ্যে নেই। তবু চিত্ত ঘোষের কবিতার বইটি পড়ে বাংলাদেশের কিছু মৌখিক শব্দ উচ্চারণ করা গেল যা কিনা অন্তরের মণিমুক্তো। যেমন,

'আবার এসেছে রমনার মাঠে পলাশ রঙের দিন
চিত্রকরের তুলিতে রঙিন শহর
নীলক্ষেত জুড়ে পাতায় পাতায় স্বপ্নের আশ্বিন
সাদা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত শীতল রাত্রির প্রান্তর।

এই কয়টি লাইন এই সংকলনের প্রথম কবিতা থেকে নেওয়া। এখানে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, কবির প্রিয় শহর ঢাকা। নস্টালজিক ভাবনা কবিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যার জন্য প্রিয়ভূমি ছেড়ে এসেও ভুলতে পারেন নি। জন্মভূমির কথা বারে বারেই মনে পড়ে।

নস্টালজিক ব্যাপারটা কবিতায় কতটা গ্রহণীয়, তা বিচার করবেন অভিজ্ঞ পাঠক। কবি এখানে এসেও মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন নিজের জন্মভূমি। কবি স্পষ্টই বলেছেন—

এ পরবাসে—এইখানে
জন্মভূমি থেকে এত দূরে
খুঁজে পাবে নাকি সেই মায়াবৃক্ষ
বৃক্ষের হৃদয়।
এই পরভূমি ছেড়ে

আমি যাবো
জন্মভূমির দিকে যাবো।

শুধু স্মৃতি বেদনাই নয় বৃহত্তর জীবনের কথাও কবি বলেছেন কবিতায়। যেমন 'লেনিন'কে নিবেদিত।

জন্ম এবং পুনর্জন্ম, জন্ম
বৃষ্টি বাতাস চিন্তা চারণভূমি
কালের আকাশ কালের শস্য
কালের কৃষক তুমি।

মহান নেতাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালেন। কিংবা কার্ল মার্কস কবিতায়—তুমি চিরায়ত বিভা বিশ্বরূপ তুমিই দেখালে। পাঠকদের অন্য জগতে নিয়ে যায়। আর একটি কবিতা উল্লেখ না করে পারছি না। কবিতাটির নাম 'প্রতিবিম্ব'।

করতলে কার মুখ?
সে মুখমণ্ডল
আচ্ছন্ন, আবৃত করে
তার
প্রতিবিম্ব নেই।

দ্বিতীয় পর্বে নিজেকে নির্দিষ্ট করে আনেন। তাঁর জীবনবোধ বিশ্বাস ইত্যাদিতে পাঠকের নির্দিষ্ট বিশ্বাসে কবিকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। যখন বলেন,

তবু পথ সন্ধানের দিকে হাঁটা একসঙ্গে সকলে নিসর্গে অমল আস্থা,
আর আস্থা সঙ্গী বহুজনে চেতনার বোধে অগ্নি,
অস্থিরতা প্রত্যেক সোপানে।

এইভাবেই কবি অনেকদূর পায়ে হেঁটেছেন যখন কবি বলেন,

সে সময় সঙ্গমের চূড়ায় আরোহী কেউ অন্ধকারে
জানে না যে কোনোখানে ক্রোধের অরণ্য রয়ে গেছে
জানে না যে প্রতিহিংসাপরায়ণ রত্নাকর
সমুদ্র উত্তাল হয়ে আছে।
জানে না যে পাথরে পাথরে
মরীয়া আগুন জেগে আছে

এখানে কবি কী বলতে চেয়েছেন সহজেই বোঝা যায়, আমরা চিনতে পারি নান্দনিক শব্দে ইতিবাচক প্রশ্নে, তাকে সাদরে গ্রহণ করি। এই কাব্যসংকলনের সর্বশেষ কবিতা 'জলের মধ্যে' কবি যেন নিজের কথাই বলতে চেয়েছেন

থাকার মধ্যে না থাকাটা
এক রকমের পাথর
সেটাই যেন আগাগোড়া
আচ্ছাদনের চাদর।

সব কবিতাগুলোর মধ্যে স্বপ্নময় অনুভূতি পাথরের মতো বুকের মধ্যে গেঁথে থাকবে দীর্ঘদিন।

জীবন সরকার

কোল ইণ্ডিয়া

Coal India Limited

Helping India fight the energy battle